# ডবল ডেকার

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ডি. এম্. লাইব্রেরী
৪২, কর্নোয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম্. লাইব্রেরী
কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
দাম : দুই টাকা

১৩৩৪

প্রিণ্টার :
শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেক্‌জান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

বন্ধুবরেষু

অচিন্ত্যকুমারের লেখা:

নবনীতা

ঊর্ণনাভ

অন্তরঙ্গ

আকস্মিক

অমাবস্যা

আমরা

প্রিয়া ও পৃথিবী

# ডবল ডেকার

# মা ফলেষু

১

'জানিস আমি বিয়ে করছি। যাবি তো বরযাত্রী?' প্রতুল ঘরের মধ্যে আচমকা ঢুকে পড়লো।

খোলা ক্ষুরে মুরারি দাড়ি কামাচ্ছিলো। সন্ত্রস্ত হ'য়ে ফলাটা মুড়ে রেখে কতকটা অবাক হ'য়ে সে বললে, 'বলিস কি রে?'

'হ্যাঁ, কাঁহাতক আর এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবো!' প্রতুল মুরারির তক্তপোষে ছড়িয়ে বসে' পড়লো। পকেট থেকে সিল্কের একটা রুমাল—সেটাকে অনায়াসে টেব্‌ল্‌-ক্লথ ভাবা যেতে পারে—বার করে' ঘাড়ের ঘাম মুছতে-মুছতে স্নিগ্ধহাস্যে বললে, 'এবার রাস্তা থেকে ঘরে আসবো ভাবছি, দোকান থেকে দেবালয়ে। বিয়ে কর্, তুইও বিয়ে কর্, মুরারি।'

মুরারি সম্পূর্ণ করে' তাকালো একবার বন্ধুর দিকে। এমনিতেই প্রতুল সব সময়ে বাবু, তার মুখের দাড়ি কখনো বাসি হয় না, ঘাড়ের চুল তার এ-জন্মে কেউ কখনো আঙুল দিয়ে ধরতে পারে নি, যে-জামার সে ভাঁজ ভেঙেছে—ছাড়তে গেলেই সটান চলে' গেছে সেটা ধোপাবাড়ি, কোঁচার ঝুলে রাস্তা সে ঝাঁট দিয়ে চলেছে, কিন্তু পাড়ে যদি লেগেছে এতটুকু মাটি এক গ্যালন দুধে এক বিন্দু চোনার অপরাধে সেটা অমনি হয়েছে কক্ষচ্যুত। কিন্তু, তবু, এত সব সত্ত্বেও, আজ যেন তাকে

আরো বেশি, প্রখর, আরো বেশি প্রদীপ্ত মনে হচ্ছিলো। মুরারি তাই টিপ্পনি কেটে বললে, 'আহ্লাদে একেবারে আটখানা দেখছি যে।'

'এখনো একমাত্র বিয়ের নামেই আমরা রোমাঞ্চিত হ'তে পারি। ঝানু যে ডাক্তার, কোথায় কী যার জানতে বাকি নেই, সেও এই বিয়ের নামেই কবি হ'য়ে ওঠে। নে, রাখ্ তোর দাড়ি-কামানো, সিগরেট খা।' বলে' প্রতুল তার পকেট থেকে মার্কোভিচের টিন বার করে' গোটা দু'তিন সিগরেট মুরারির দিকে ছুঁড়ে মারলো।

একটাকে শূন্য থেকে লুফে নিয়ে টেবল থেকে দেয়াশলাই কুড়িয়ে ফেনা-মুখে সেটাকে ধরাতে-ধরাতে মুরারি বললে, 'ভীষণ ফুর্তি! পাচ্ছিস বুঝি কিছু মোটা রকম?'

'এক ফোঁটাও নয়।'

'কিছুই না?' মুরারি বিশ্বাস করলো না।

'বিশ্বাস কর্, কিছুই না। পেলে বলতে আমার বাধা কী! চিরকাল দাম দিয়ে এসেছি, এবারো দেবো। তবে সে-দামে আর এ-দামে ঢের তফাৎ আছে ভাই।' প্রতুল গলায় একটু গাম্ভীর্য আনলো।

'কোথাকার মেয়ে?'

'বিক্রমপুর—অমিয়দেরই গ্রামে।'

'দেখেছিস তাকে?'

'সেই সেবার অমিয় আমাকে তাদের বাড়ি ধরে' নিয়ে গেলো না! একদিন সন্ধেবেলা মেয়েটিকে পুকুর-ঘাট থেকে কলসিতে করে' জল নিয়ে যেতে দেখলাম।'

'এ যে উপন্যাস, ফিল্‌ম্-সট্!' মুরারি সকৌতুক কৌতূহলের সঙ্গে বললে, 'দেখতে কেমন?'

'তা দেখি নি।' প্রতুল উদাসীনের মতো বললে।

এ তার অনেক হেঁয়ালির মধ্যে আরেকটা। মুরারি ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললে, 'তবে দেখলি কী?'

'দেখলাম সে আমার অনেক জন্মের চেনা, তাকে আমার চাই, তাকে না হ'লে আমার চলবে না—দেখলাম সেই একমাত্র সত্যকে।'

'মেয়েটির বাপ কী করে?'

'তার খোঁজ নিই নি। জিনিসই দামি, দোকানদার নয়।'

মুরারি খাপ থেকে ফের ক্ষুর খুললো, গালের উপর দিয়ে তেরছা করে' টানতে-টানতে বললে, 'কার কী সর্বনাশ করছিস কে জানে!'

প্রতুলের বুকের ভিতরটা আঁৎকে উঠলো কি না কে বলবে! ঈষৎ বেসুরো গলায় সে বললে, 'সর্বনাশ করছি মানে?'

'বিয়েটা তো আর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়া নয়, দস্তুরমতো তাতে দায়িত্ব আছে।'

'একশো বার আছে। তুই কি মনে করিস আমি আমার স্ত্রীকে খাওয়াতে-পরাতে পারবো না?'

'তা হয়তো পারবি।'

'একটা তাকে বাড়ি করে' দিতে পারবো না? একটা মোটর গাড়ি?'

'হয়তো তা-ও।'

'তবে?'

'তাকে তুই সুখী করতে পারবি না।'

'সুখী! সুখী কে সংসারে?' প্রতুল গলা ছেড়ে অনর্গল হেসে উঠলো। দার্শনিক নির্লিপ্ততায় বললে, 'একনিষ্ঠা বৈদেহীও সুখী ছিলেন না।' বলে' সে জায়গা ছেড়ে মুরারির টেবলের কাছে উঠে এলো:

'হ্লের কথা পরে হবে। তুই এখন আমার সঙ্গে যাচ্ছিস কিন বরযাত্রী!'

'তোর সঙ্গে কোথায় না গেছি!' মুরারি বাঁকা কটাক্ষ করলো।

খবরটা ইতিমধ্যে মেসের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। যারা তার চেনা সবাই প্রতুলকে ছেঁকে ধরলো: 'আমাদেরো নিচ্ছেন সঙ্গে করে' ?'

'নিশ্চয়ই। বিষয়টা যখন আর কিছু লুকিয়ে হচ্ছে না, আর ইতর আপনারা যখন শুধু মিষ্টান্ন পেলেই খুসি। নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো। যে যেতে চান।' প্রতুল ঘর থেকে বেরোবার উদ্যোগ করলো, যাবার আগে মুরারিকে বললে, 'সব সময়েই রেডি থাকবি, বিয়ের দিন ঠিক হ'লেই এসে খবর দেবো।'

রহস্যে আবৃত এই প্রতুল। তার সঙ্গে মুরারির প্রথম আলাপ দু' বছর আগে, রেস-কোর্সে। সেদিন তারা দু'জনে একই ডার্ক-হর্সের উপর বাজি ধরেছিলো, যেটা সমস্ত ঘোড়াকে পিছনে ফেলে সটান তাদের পকেটে পড়লো ঢুকে। অভ্রভেদী আনন্দের মধ্য দিয়ে মুহূর্তে তারা অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠলো, যে-অন্তরঙ্গতা অমিতব্যয়িতার প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। ট্যাক্সি ছুটিয়ে তারা চলে' এলো ইম্পিরিয়্যালে: যে-পয়সা আকাশ ফুঁড়ে আসে সে-পয়সা পকেট ফুঁড়েই বেরিয়ে যাওয়া উচিত— তার আসা ও যাওয়ার মাঝে সমান চমক থাকা দরকার; সেখান থেকে চলে' গেলো তারা ধূসর উত্তরাঞ্চলে। সেখানে মুরারি দেখলো কী উত্তুঙ্গ রাজপদে প্রতুলের প্রতিষ্ঠা, আর তার প্রভাব কী অপ্রতিহত! বলতে গেলে সেখানেই সে বিস্তীর্ণ রাজ্যবিস্তার করে' বসেছে। কিন্তু তাও বা সুনিশ্চিত বলা যায় কি করে'! দেখা গেলো হঠাৎ সে সমস্ত সংস্রব ছেড়ে নিজেই একটা বাড়ি-ভাড়া করে' বসেছে। কোথাও আর

বেরোয় না, সমস্ত সংসারের পরে উদাসীন, নিজের গত জীবনের উপর অসীম তিক্ত-বিরক্ত। সেখানেও বা তাকে ধরে' রাখবে কে! ক'দিন পরে দেখা গেলো হপেন্‌স্‌-এর দোকানের স্যুট পরে ক্যামাক ষ্ট্রিটে সে এক স্যুইট্‌ নিয়ে বসেছে। এক সপ্তাহ পরে গিয়ে দেখ, তার কলার-পিনটিও সেখানে পড়ে' নেই, চ'লে' গেছে সে লাক্ষ্ণৌয়, সপ্তাহান্তরে লাহোরে, সেখানে থেকে বা লাণ্ডিকোটালে। আবার চুপচাপ বসে' আছো, দেখবে সে কলকাতায়, তোমার চোখের সুমুখে। আজ রয়েছে একটা রঙিন হোটেলে, কাল রয়েছে একটা বিবর্ণ পল্লীতে। তার কোথাও ঠিকানা নেই, সে কেবল শাখাই মেলেছে শিকড় গজায় নি। তার বাড়ি কোথায় জিগগেস করো: আজ বলবে পাটিয়া, কাল বলবে নেত্রকোনা, পশু' বললে বাগেরহাট। সবরকম প্রাদেশিকতারই সে তুখোড়, ধরা দেবে না। যদি জিগগেস করো: তোর এত পয়সা কিসে, সে আজ বলবে, রেঙ্গুনে তার ব্যবসা আছে চালের, কাল বলবে, আগ্রায় তার চামড়ার, পশু' বলবে, নাগপুরে তার তুলোর। যে করে'ই হোক তার পয়সা আছে, আর সে-পয়সা তার বাক্সে নয়, ব্যাঙ্কে নয়, লগ্নিতে নয়, একেবারে তার বুক-পকেটে। একমাত্র জিনিস যা পরকে দিতে আমরা কার্পণ্য করি না তা দেয়াশলাইয়ের কাঠি: তেমনি ওর টাকা; যদি উড়িয়ে দিতে চাও, চাইলেই তা পাবে। টাকা আমরা অনেক দেখি, কিন্তু এমন বিবেকহীন নির্দয় অমিতব্যয়িতা কখনো দেখি নি। যেন ঘর থেকে হাওয়া বার করে' দিতে পারলেই আসবে আরো অনেক হাওয়া, দরজা-জানলা এঁটে আটকে রাখলেই দম বন্ধ হ'য়ে মারা যাবো। তেমনি হাত থেকে টাকাটা বার করে' দিতে পারলেই যেন পকেট আবার ভরে' উঠবে। আলাদিনের এ প্রলয়-প্রদীপ জ্বলছে কোথায়! রেসে মানুষ দ্বিতীয় দিন জেতে না, শেয়ার-মার্কেটে মানুষ হুমড়ি খেয়েও পড়ে মুখো-

মাঝে, আর ব্যবসা করতে বসলে কার না একটা অন্তত হিসেবের খাতা থাকে। দেশে জমিদারি আছে বলতে পারো, কিন্তু জমিদারকেও রাজস্ব দিতে হয়, মালি-মোকদ্দমা চালাতে হয়, প্রজারক্ষা করতে হয়। কোন জমিদারির এত উদ্বৃত্তি আছে যা মাত্র নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাবে! শুধু একটি জিজ্ঞাসাই তার কাছ থেকে সমান উত্তর পেয়েছে: সংসারে তার কেউ নেই, কিছু নেই, না সুদূরতম আত্মীয়, না সূচ্যগ্রতম মেদিনী। বসুধাই তার কুটুম্ব, বসুধাই তার বাসভূমি। এ হেন প্রতুলকে ধাঁধা বলবে না তো কী! কোথায় সে আছে, কী সে করে, কিসে সে চালায়, আদ্যোপান্ত সবই একটা ঘন কুয়াসা দিয়ে ঢাকা। দু' বছরেও মুরারি তাকে ধরতে-ছুঁতে পায় নি।

হয়তো দরকারও ছিলো না, কিন্তু এ-হেন প্রতুল অপূর্ব অক্লেশে বিয়ে করবার জন্যে মেতে উঠলো—এটা যেন কেমন ভাবা যাচ্ছে না, কিম্বা ভাবতে ভালো লাগছে না। আর সব রকম সাধুকাজ সে করেছে ভাবা যেতে পারে, এমন কি সন্নেসি হওয়া পর্যন্ত, কিন্তু নেহাৎই একটি অপাপবিদ্ধা কুমারীকে সে বিয়ে করছে ভাবতে কেমন মনটা বেঁকে বসে। সেটা ভয়, না ঘৃণা, না দুঃখ, না এমনিতেই একটা বিস্ময় বোঝা দায়। ব্যাপারটা সত্যি কী জানবার জন্যে মুরারি একদিন অমিয়র মেসের দিকে পা বাড়ালো।

রাত হয়েছে। টহল দিয়ে ফিরে মেসের একতলায় তক্তপোষের উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে লণ্ঠনের আলোতে অমিয় একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় কাননবালার একটা ছবি দেখছিলো, আলোটা হঠাৎ আড়াল হ'য়ে যেতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো: 'এ কি, মুরারিবাবু যে, কী মনে করে'?'

ঘরে আর লোক ছিলো না, পার্শ্বস্থায়ী ভদ্রলোকটি ট্যুইশানি করতে

গেছেন, এখনো ফেরেন নি। মুরারি লোহার একটা বাঁকানো চেয়ারে বসে' পড়ে' আলটপকা জিগগেস করলে : 'হ্যাঁ হে, প্রতুল নাকি বিয়ে করছে ?'

'হ্যাঁ, আপনি শুনলেন কোথেকে ?'

'আমাকে সেদিন বলছিলো ঘটা করে'। প্রথম পলক-পাতেই নাকি প্রেম, জন্মজন্মান্তরের আলাপ।'

'প্রেম না হাতি !' লজ্জিত হাস্যে অমিয় বললে।

'তবে কী ব্যাপারখানা ?'

'বলতে গেলে বলতে হয়, স্রেফ মহানুভবতা।'

এতটা মুরারি প্রত্যাশা করে নি। শূন্য থেকে বললে, 'তার মানে ?'

'মানে, গরিবের উপর দয়া, আদর্শবাদ, যুবক বাঙলার কাছে জীবন্ত উদাহরণ, যা বলতে চান।'

এ-ও আরেক প্রলাপভাষী। মুরারি অসহিষ্ণু হ'য়ে বললে, 'মেয়েটি কে ? চেন ?'

'চিনি না ? আমাদেরই গ্রামের মেয়ে, এক ঢিল দূরে ওদের বাসা, রেখাকে আমি চিনি না ? ঘটকালি করলে কে জিগগেস করি ?'

'মেয়েটি দেখতে কেমন ?'

'স্বাস্থ্যবতী ছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন না।'

'খারাপ দেখতে ?'

'প্রতুল-দা বিয়ে করছেন, এখন আর তাকে খারাপ বলি কি করে' ? নইলে কোনোদিন আমার থিয়েটার-পার্টিতে এসে জয়েন করলে তাকে একটা ঝির পার্টও দিতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

'এত কুৎসিত ! মোটে বিয়ে হচ্ছিলো না বুঝি ?'

'আজ এই বিশ বৎসর। আপনিই বলুন, কুড়ি বছরের মেয়ের বড়ো

জোর স্বাস্থ্য থাকতে পারে, কিন্তু রূপ কোথায়? গানই বলুন, য়্যাক্টিংই বলুন, আর রূপই বলুন, সব চর্চার জিনিস। চর্চা করেন নি কি মর্চে ধরতে সুরু করেছে।'

'লেখাপড়া শেখে নি?'

'এই, অষ্ট রম্ভা।' অমিয় কাঁচকলা দেখালো। বললে, 'বলে গ্রামে মেয়েদের একটা মাইনর-ইস্কুলই নেই। আমার ভয় হয় রেখাকে প্রতুল-দার সব সময়ে কাছে-কাছে রাখতে হবে।'

'কেন?'

'কেন নয়? দূরে থাকলে প্রতুলদাকে ও চিঠি লিখবে কি করে'?'

'এত দূর!' মুরারি হাসলো। বললে, 'টাকাও তো প্রতুল কিছু পাচ্ছে না।'

'টাকা পাবে না দিল্লির মসনদ পাবে! বিয়ে করবার আগে প্রতুল-দাকে ওদের বাড়ির চাল ছেয়ে দিয়ে আসতে হ'বে, নইলে এই আষাঢ়ে আর বিয়ে হ'তে পারবে না।'

মুরারি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। বললে, 'এমন মেয়েকে প্রতুল পছন্দ করলো কি করে'?'

'বললুম না জীবে দয়া, স্রেফ জীবে দয়া। সেবার আমার দেশে গিয়ে প্রতুলদা রেখাকে একদিন দেখলেন রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে। জিগ্‌গেস করলেন, 'কে ওই মেয়েটি?' দিলুম ওর পরিচয়, বললুম ওদের অবস্থার কথা। ওর বাপ কি-রকম হন্যে হ'য়ে ওর বিয়ের জন্যে বুড়ো থেকে বালকের কাছে গিয়ে হাতজোড় করছেন। একে কালো, তায় লেখাপড়ার জৌলুস নেই, নেই সহুরে চুণকাম, তাই কেউ মুখ তুলছে না! বুড়ো ভদ্রলোকের কেবল আত্মহত্যা করতে বাকি। কিন্তু মরলেও ব

শান্তি কই? স্বর্গেই যান বা নরকেই যান, আজকালকার পল্লীগ্রামের অবস্থার কথা তো খবরের কাগজ খুললেই পড়তে পারবেন!'

'তারপর?' মুরারি তাকে সুতো ধরিয়ে দিলো।

'তারপর, নৌকোয় যখন উঠবেন, প্রতুলদা আমাকে বললেন, রেখাকে তিনি বিয়ে করবেন। কথাটা যেন বাড়ি ফিরেই পাড়ি ওদের কাছে।'

'পাড়লে কথাটা?'

'বাড়ি ফিরেই। তক্ষুনিই।'

'ওরা কী বললে?'

'বললে? শুধু বললে? চেঁচিয়ে উঠলো। লাফিয়ে উঠলো। গান গেয়ে উঠলো।'

মুরারি অল্প একটু হাসলো। বললে, 'কি-রকম পাত্র সে-সম্বন্ধে কোনো খোঁজ নেয়া দরকার মনে করলো না?'

'কি রকম পাত্র!' এমন একটা প্রশ্নও হ'তে পারে ভাবতে অমিয়র চক্ষু গোলাকার হ'য়ে উঠলো। অসহিষ্ণু হ'য়ে বললে, 'আর, কি-রকম পাত্রী তার খবর রাখেন?'

'তা তো ঠিকই। তবে কিনা—'

'প্রতুলদাকে যদি অপাত্র বলেন তবে রসগোল্লাকেও অখাদ্য বলতে হয়। ক্রিকেটে যেমন ব্র্যাডম্যান, বিয়ের বাজারে তেমনি প্রতুলদা। কিসে তিনি ছোট? চেহারায় কার্তিক না হ'লেও গণেশ নন, আর ময়মনসিং-সর্ষেবাড়িতে তাঁর প্রকাণ্ড পাটের ব্যবসা, পয়সায় তিনি গড়াগড়ি যাচ্ছেন। রাখুন মশাই, অমন কাঁচা পয়সা হাতে এলে এখানে-সেখানে বেরিয়ে যায়ই এক-আধটু—সেটা পয়সার স্বভাব, মানুষের চরিত্রের দোষ নয়।'

'কিন্তু ওরা যদি সে-কথা শোনে?'

'কারা ?'

'মেয়েপক্ষ ?'

'ঢোঁক' গিলে হজম করে' ফেলবে। ভাববে, দুর্নীতিটা গরিব লোকের বেলায় যতটা কলঙ্ক, বড়োলোকের বেলায় ততটাই অলঙ্কার। সেটাকে কেউ পাপ বলবে না, বলবে একটা খেয়াল।'

'তা বলেছ ঠিক। কিন্তু তোমার কি মনে হয়', মুরারি গম্ভীর হ'বার চেষ্টা করলো : 'বিয়ে করে' প্রতুল ঘর বাঁধতে পারবে—আজ যে মাইশোর আর কাল যে মুশৌরি করছে ? বিয়েটা তার পক্ষে একটা বাধা হ'বে না ?'

'আমার তো মনে হয় আকাশ থেকে এখন নীড়ে আসবার জন্যেই উনি ব্যস্ত। আর যাই বলুন, লঙ্কাকাণ্ডে সীতা-উদ্ধার পর্যন্তই আমরা আছি, উত্তরকাণ্ডের কথা বাল্মীকি ভাববেন, মানে গ্রন্থকর্তা, অর্থাৎ মেয়ের বাপ।'

'ভদ্রলোক বুঝি খুবই গরিব ! করেন না কিছু ?'

'করতেন, কিন্তু ছেলের দুর্দান্ত স্বদেশিয়ানায় সেটা খুইয়েছেন।'

'নেই কেউ ?'

'এক ভাই আছে, সিলেটে না সিলচরে কি কাজ করে, ঝুলি ঝেড়ে মাসান্তে কিছু পাঠায়। জমি-জমা বাকি খাজনার ডিক্রিতে নিলেম হ'য়ে গেছে, জমিদারের হাতে-পায়ে ধরে' ভিটে আঁকড়ে পড়ে' আছেন এখনো।'

'ভদ্রলোকের নাম কী ?'

'ভবানন্দ মুখুজ্জে।'

'বলো কী হে, অমিয় ?' মুরারি পায়ের নখ পর্যন্ত শিউরে উঠলো : 'আর প্রতুলরা যে দাস !'

অমিয় উঠলো হেসে। বললে, 'আপনি তা হ'লে ওঁকে চেনেন না। ওঁর আসল নাম হচ্ছে জগদীশ ব্যানার্জি—কার্তিকপুরের গদাধর বাঁড়ুয্যের ছেলে।'

'এ কী হেঁয়ালি বলছ?' মুরারি থ হ'য়ে গেলো।

'ধাঁধার উত্তরও এই বলে' দিচ্ছি আপনাকে।' অমিয় গ্যাঁট হ'য়ে বসলো, বললে, 'ছেলেবেলা থেকেই উনি বখা, বুঝতেই পারেন ভোরবেলা দেখেই দিন বোঝা যায়, বাপের শাসন-ফাসন না মেনে মা-মরা ছেলে একদিন নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন। বহু বছর আগেকার কথা। চলে' গেলেন রেঙ্গুন না কয়েম্বেটোর, ধুলো মুঠ করে' নিয়ে গেলেন—খুলে দেখলেন সোনা হয়ে গিয়েছে। ফিরে এলেন কোলকাতায়, সেখান থেকে স্থলপথে আর জলপথে অনায়াসে তাঁদের বাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে আর গেলেন না, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে, যারা তাঁকে কুলাঙ্গার বলেছে, তাঁকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে যারা তাঁর বাপের সহায়ক ছিলো, দুর্বল বার্ধক্যেও যারা তাঁর বাপকে কোনোদিন তাঁর জন্যে কাঁদতে দেয় নি। আর কেনই বা যাবে! গদাধরবাবু তো আর বেঁচে নেই।'

'তুমি এত সব জানলে কি করে'?'

'আমি কেন, বিক্রমপুর-পরগনার সবাই জানে যে গদাধর বাঁড়ুয্যের ছেলে ভাগ্য-জয় করে' ফিরেছে।'

'কিন্তু তুমি তো আর জগদীশকে দেখ নি।'

'দেখি নি, কিন্তু গদাধরবাবু যখন নোয়াখালিতে সাবরেজিষ্ট্রার ছিলেন, আমি জানতুম ওঁদের পরিবারকে। শুনেছিলুম, তাঁর বড় ছেলে নিরুদ্দেশ, কেউ বলে সন্নেসি, কেউ বলে ডাকাত, কেউ বা সরাসরি বলে, শিঙে ফুঁকেছে। আমার সঙ্গে প্রথম যখন ওঁর আলাপ, চার বছর

আগের কথা বলছি, প্রথমেই বললেন, উনি নোয়াখালির গদাধর বাঁড়ুয্যের ছেলে, জগদীশ।'

'তার আগে, তোমার বাবা এককালে নোয়াখালির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, এ-কথা বলেছিলে তাকে ?' ডিটেকটিভ পুলিশের মতো মুরারি সূক্ষ্ম একটু হাসলো।

'তা বলে' থাকতে পারি বটে, আমার মনে নেই।' অমিয় বিরক্ত হ'য়ে জিগগেস করলে : 'তা আপনার সন্দেহ হচ্ছে নাকি ?'

'তা একটু-একটু হচ্ছে বৈ কি।' এতক্ষণে মুরারি একটা সিগরেট ধরাবার সময় পেলো। বললে, 'নইলে জগদীশ কেন প্রতুল হ'তে যাবে, মায় জাত-গোত্র বদ্‌লে ?'

'এইটুকু আপনার বুদ্ধি হ'লো না ? আপনি যখন ও-সব জায়গায় যান, আর যখন ওরা আপনার নাম জিগগেস করে, তখন কি সত্যি-সত্যি মুরারি ব্রহ্মই বলেন, না, মণীন্দ্র সমাদ্দার বলে' আসেন ? আর যে-নাম একবার চ'লে গেছে বাজারে, কালক্রমে তারো একটু গুডউইল দাঁড়িয়ে যায়। যায় না ?'

'সেটা তুমি ঠিক বলেছ, কিন্তু প্রতুল এখন কোথায় বলতে পারো ?'

'কোয়েটায়। কাল চিঠি পেয়েছি।'

'কোয়েটায় ?'

'হ্যাঁ, সেখান থেকে করাচি হ'য়ে এক হপ্তার মধ্যেই কোলকাতায় ফিরবেন।'

'তার বিয়ে কবে ?'

'সামনে মাসেই। আপনারা জানতে পারবেন বৈ কি।'

'আচ্ছা, তা হ'লে উঠি।'

'কিন্তু এতক্ষণ বাদে একটা কথা আপনাকে জিগগেস করবো।'

অমিয় নিভৃত হবার চেষ্টা করে' বললে, 'প্রতুলদার বিয়েতে আপনার সায় নেই কেন বলতে পারেন ?'

'তুমি এত বোঝ আর এটা বুঝলে না ?' মুরারি হাসলো : 'জাহাজের কাপ্তানই যদি আত্মহত্যা করে, তবে জাহাজের কী দশা হয় ?'

'বানচাল, ছত্রখান হ'য়ে যায়।'

'আমরা তাই হ'তে বসেছি।' মুরারি ততোধিক হাসলো : 'আমাদের কাপ্তেনই যদি চলে' যায় তো আমরা কোথায় ! তখন ওর জামায় কি আর পকেট থাকবে ? তোমার সেই রেখা এসে সব সেলাই করে' দেবে না ?' মুরারি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

এ-দিকটা অমিয় ভেবে দেখে নি। বাপ তার খরচ-পত্র বন্ধ করেছে অনেক দিন, যে-দিন থেকে সে এক থিয়েটার-পার্টি খুলে বসেছে। সে-পার্টি বাঁচিয়ে রেখেছে শুধু প্রতুলের পয়সা, এমন-কি আনকোরা সব নটী ও অভিনেত্রী পর্যন্ত জুটিয়ে দিয়েছে সে। প্রতুলদা যদি সত্যিই এবার নীড়ে ফিরে আসেন আর তাঁর জামার পকেটগুলো যদি একে-একে সেলাই হ'য়ে যায় তবে তার পার্টি তো একেবারে গণেশ উলটোবে।

মনে-মনে সে অস্থির হ'য়ে উঠলো। বললে, 'সে আর কত দিন, বড়ো জোর মাসখানেক'। বুড়ি যে একবার ছুঁয়ে এসেছে মুরারিবাবু, সে আর কখনো মরে না। এ ভরসা আমার আছে।'

'তা বলেছ ঠিক। দিন-ক্ষণ ঠিক হ'লে আমাকে জানিয়ো। আমি যাবো বরযাত্রী।'

'নিশ্চয়। আর কারু নয়, প্রতুলদার বিয়ে !'

কি ভেবে দু'জনে হেসে উঠলো।

করাচি থেকে ফিরে প্রতুল অমিয়র মেসে এসেই উঠলো। ট্যাক্সি-ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে প্রথম কথাই এই বললে, 'ওদের আজকেই টেলি করে' দাও অমিয়, সাতদিনের মধ্যেই বিয়ের দিন ঠিক করা চাই।'

'সাত দিনের মধ্যে!' অমিয় ভেবড়ে গেলো: 'এত শিগগির!'

'কোন জিনিসটা আমি গড়িমসি করে' করেছি শুনি? বেশি দেরি করতে গেলে মত বদ্‌লে যেতে পারে। এ বাবা মানুষের মন, রেসের ঘোড়ার চেয়েও অনিশ্চিত।'

'কিন্তু সাতদিনের মধ্যে কি ওরা তৈরি হ'তে পারবে?'

'এই নাও টাকা,' পকেট থেকে প্রতুল একটা একশো টাকার নোট বার করলো: 'টি-এম-ও করে' দাও। আর লিখে দাও, আয়োজন খুব সঙ্ক্ষেপ করতে। শাঁখা আর সিঁদুর, শাঁখের আওয়াজ আর শালগ্রাম-শিলা। আমাদের দেশে আইন করে' আয়-মাফিক বিয়ের খরচ বেঁধে দেয়া উচিত।'

'ওদের একটা নেমন্তন্ন-পত্র তো ছাপতে হ'বে। জ্ঞাতি-কুটুম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে, প্রথম মেয়ের বিয়ে, না জানালে কি ভালো দেখায়?'

'রেখে দাও তোমার জ্ঞাতি-কুটুম! বলে, তপ্ত ভাতে নুন জোটে না পান্ত ভাতে ঘি।' প্রতুল মুখ বেঁকালো: 'গ্রামের দু' পাঁচ জন মাতব্বর ধরে' খাইয়ে দেবে। দুটো গ্যাস, একটা সামিয়ানা, আর একখানা পাট-কাপড়। বিয়ে হ'য়ে যাক, জ্ঞাতিগুষ্টি ডাকিয়ে আমি একদিন না-হয় ফিরপোতে ডিনার খাইয়ে দেবো। হ্যাঁ. প্রিপেড টেলি

করবে।- এক্ষুনি উত্তর চাই, সাতদিনে তারা রেডি হ'তে রাজি আছে কিনা।'

'কিন্তু,' অমিয় আমতা-আমতা করে' বললে, 'কিন্তু সাতদিনে বিয়ের দিন আছে কিনা কে জানে।'

'আমি জানি, দিন নেই।' প্রতুল ক্রুদ্ধ গলায় বললে, 'দক্ষিণা পেলেই পাঁজির ব্যাখ্যা করে' জ্যোতিষীরা দিন বার করে' দেয়। আর এ-ক্ষেত্রে কন্যা অরক্ষণীয়া, মনে রেখো। দিন বেঠিক হ'লেই বিয়েটা বে-আইনি হয় না। তুমি ওদের লিখে দাও তো, গরজ কার বোঝা যাবে।'

পরের দিনই টেলিগ্রামের উত্তর এসে হাজির।

মেয়ের বাপ লিখেছে, আসচে সাতাশে তারিখেই তারা প্রস্তুত, যদিও অজ-পাড়াগাঁয়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে সব জোগাড়যন্ত্র করে' ওঠা মুস্কিল। বরযাত্রী ক'জন আসবে দয়া করে' তার সংখ্যাটা যেন জানান।

'লিখে দাও পনেরো জন।' আয়নার সামনে প্রতুল চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বললে।

'এত ? ওরা নাজেহাল হ'য়ে যাবে যে।'

'তবে, কেটে সাত করে' দাও। তুমি আছ, মুরারি আছে, ওর মেসের দু' একজন ভদ্রলোক যাবে বলেছে, প্রফুল্ল, তার ভাই প্রমোদ; নিপু আর হরিকুমারকেও বলতে হবে—এ তো আর-কিছু নয় যে দল ভারি হ'লে দুশ্চিন্তা হবে, এ বাবা, রিলিজিয়স য়্যাক্ট, বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'না, সেভেন ইজ এ ডিসেণ্ট নাম্বার!'

'হ্যাঁ, আর লিখে দেবে, লিস্‌ট্ পসিব্‌ল্ ফাস্‌। একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড করে' না বসে।'

'কোত্থেকে করবে?'

'আর এ-ও লিখে দিতে পারো, মেয়ের বিয়েতে উপযুক্ত গয়না বা শাড়ি-ব্লাউজ দিতে না পেরে ওরা যেন না দুঃখ করে। সব আমি দেবো।'

'তা তারা জানে।' অমিয় হাসলো।

'আর শোনো, চাকরকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলো, আমি এখুনি একবার শ্রীরামপুর যাবো। আর তোমাকে এই টাকা দিয়ে যাচ্ছি; পঁচিশে তারিখ, ইংরিজি কতই জুন হয় দেখে নিয়ো, ঢাকা মেলে আমার আর তোমার দু'খানা টিকিট কেটে বার্থ রিজার্ভ করে' রাখবে। আর কে যায় না যায় দেখে পরের টিকিট পরে করা যাবে।'

'আপনি কি এর মধ্যে আর ফিরে আসছেন না নাকি?' অমিয়র গলায় কেমন অস্বস্তি।

'না, সেখান থেকে আমাকে একবার ধানবাদ যেতে হ'তে পারে। তা তোমার ভয় নেই, পঁচিশে তারিখ, ইংরিজি কতই জুন হয় দেখে নিয়ো, রাত ঠিক দশটার সময় শেয়ালদা ষ্টেশনে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে আমাকে দেখতে পাবে। কাজ, কাজ, বিয়ে যে করবো তাতে পর্য্যন্ত কাজের কমতি নেই। জিনিসপত্র কেনাকাটা আছে, সামান্য টুথব্রাশ থেকে রেখার জন্যে জড়োয়া একটা নেকলেস পর্যন্ত, বন্ধু-বান্ধবদের দোরে-দোরে গিয়ে নেমন্তন্ন করতে হবে, পত্রদ্বারা যখন ত্রুটি করা যাবে না, তারপর বাড়ি একখানা ঠিক করে' রাখতে হবে, চাকর-বাকর, ফার্নিচার, কম-সে-কম টু-সিটার একখানা গাড়ি—কাজের কি আর শেষ আছে ভাই? তুমি কিছু ভেবো না, সব ভুলতে পারি, [illegible] ভুলতে পারবো না—এই নাও টাকা, আজই গিয়ে বার্থ দু'খানা রিজার্ভ করে' এসো।' বলে' পকেট থেকে প্রতুল গুনে-গুনে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার করে' দিলো।

'খেয়ে যাবেন না?' হতবুদ্ধির মতো অমিয় বললে।

'না, ষ্টেশনের রিফ্রেসমেণ্ট-রুমেই সেটা সেরে নেবো। কই রে, গাড়ি কই ?'

প্রতুল বেরিয়ে গেলো।

পঁচিশে তারিখে, ইংরিজি নয়ুই জুন, টিকিট কেটে, বার্থ রিজার্ভ করে', কামরাতে মাল-পত্র চাপিয়ে, সাড়ে নটা থেকে অমিয় ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে পাইচারি করছে। সেকেণ্ডক্লাশ-ওয়ালারা এত আগে কেউ আসে না, ডাকা মেলেও না ; কিন্তু দশটা ছেড়ে সাড়ে-দশটা প্রায় বাজে, প্রতুলের দেখা নেই। নিশান নিয়ে গার্ড পর্যন্ত তার গাড়িতে এসে উঠলো, ফার্স্ট্ বেল পড়ো-পড়ো, কোথায় প্রতুল ? এ একা সে চলেছে কোথায়—অসহায় উদ্বেগে অমিয় একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠলো। মাল-পত্র সে নামিয়ে নেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় প্রতুল এসে হাজির।

'কই হে, বুক্-ঠুক্ হয়ে গেছে সব ? কম্প্লিট ?'

'এ কি, কী হয়েছে আপনার ?' অমিয় প্রতুলের মাথার দিকে ইঙ্গিত করলো।

দেখা যাচ্ছিলো প্রতুল তার মাথাটা নির্মূল ন্যাড়া করেছে, যদিও তার উপরে সিল্কের একটা পাকানো পাগড়ি, পাঞ্জাবিদের ধরনে বাঁধা, যদিও ল্যাজ নেই।

'ও আর বোলো না হে। গিয়েছিলাম ফ্যাসান করে' এক বিলিতি দোকানে চুল ছাঁটতে। চুল যেন কাটছে না শালারা, কোদলাচ্ছে। হাল চালিয়ে এবড়ো-খেবড়ো একটা মাঠ বানিয়ে ফেললে। শালাদের শাপান্ত করতে-করতে শেষকালে ফুটপাতের ধারে একটা খোট্টাই ক্ষুরের তলায় গিয়ে মাথা গলিয়ে দিলাম ; বললাম, বেশ গোল করে' নাড়ুরির মতো কামিয়ে দাও তো, গোপাল

'আমি বা ভাবলাম, আর কোনো হঠাৎ বিপদ হ'লো বুঝি! কিন্তু সেই সঙ্গে গোঁফ জোড়াও কামালেন কেন?'

'নইলে যে ব্যালেন্স থাকে না। কই হে, এই আমাদের গাড়ি নাকি? উপরে-নিচে আর কেউ আছে নাকি এ-গাড়িতে?' প্রতুল সঙ্গের কুলিটাকে দাঁড় করালো।

এ-পাশে ও-পাশে ঘন-ঘন তাকাতে-তাকাতে অমিয় বললে, 'আর কেউ এলো না?'

'বোলো না আর অদৃষ্টের কথা, শুভ কাজে সঙ্গী মেলে না।' প্রতুল গাড়িতে উঠে কুলি খাটাতে-খাটাতে বললে, 'মুরারির মেসে গিয়ে দেখি, প্রবল গ্রীষ্মে লেপমুড়ি দিয়ে হি-হি করে' কাঁপছে, মুরারি যাবে না দেখে ওদের ওখানকার আর-কাউকে রাজি করানো গেলো না। কাল মেডিকেল কলেজে প্রফুল্লর শালির য়্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশান হবে, সে যেতে পারবে না, ওর ভাই প্রমোদ ল্যাম্বেগোতে ভুগছে, ওঠায় কার সাধ্যি। নিপুর কাছে গেলাম, ষ্টুপিডটা দাঁত বার করে' বললে, পশু তার ছেলের অন্নপ্রাশন। চললাম বেলগাছিয়ায় হরিকুমারের বাড়ি, দেখি গলির মোড়ে কঞ্জুসটা ভেণ্ডারের থেকে এক সিকি আফিং কিনছে; টানলাম তার জামা ধরে', বললাম, 'চল্, বিয়ের বরযাত্রী যাবি'; ও ওর চোখ দুটো ছোট করতে-করতে দুটো সূক্ষ্ম শুভ্র রেখায় পরিণত করে' বললে, 'আবার বিয়ে! মাপ করো দাদা, ও-নাম মুখেও উচ্চারণ করো না।' নেমকহারাম-স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার! উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, হুইস্‌ল্ দিয়েছে।'

গাড়িতে উঠতে-উঠতে অমিয় বললে, একটু-বা বিরস গলায়: 'কেবল আপনি আর আমি।'

'তাই যথেষ্ট, আমি বর আর তুমি নিতবর।' প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির

সঙ্গে নিজের কব্জির ঘড়িটা মিলিয়ে নিতে-নিতে প্রতুল বললে, 'আশ্চর্য, আমার ঘড়িও কিনা শ্লো যায়।'

গাড়ি ছেড়ে দিলো।

অমিয় বললে, 'ওরা কিন্তু এত কম লোক দেখে বড্ড হতাশ হ'য়ে যাবে।'

'আরে বন্ধু, তুমি কী চাও? দশ সহস্র অক্ষৌহিণী সেনা চাও, না স্বয়ং জনার্দনকে চাও? ঘড়িটা যেমন শ্লো যাচ্ছিলো, যদি নিক অফ টাইমে না এসে পড়তে পারতাম, তবে ভদ্রলোকরা কি অধিকতরো আরাম পেতেন নাকি?'

'কিন্তু সঙ্গে একটা চাকর পর্যন্ত নিয়ে এলেন না?'

'কেন, তোমাদের গাঁয়ে সকলেই একেকটা জেলার হাকিম নাকি, একটা চাকর পাওয়া যাবে না, জুতোজোড়াটা যে এগিয়ে দেয়, কাপড়-খানা কুঁচিয়ে রাখে?'

'অধিবাসে তত্ত্ব কী পাঠাবেন?'

'তুমি যে দেখছি একেবারেই য়্যাডভেঞ্চেরাস নও! কেন, তোমাদের ওখানে ময়রা কি মুদির দোকান নেই? এক হাঁড়ি চিনি, এক হাঁড়ি মিছরি, এক হাঁড়ি বাতাসা, এক হাঁড়ি গুড়, এক হাঁড়ি নকুলদানা, এক হাঁড়ি বাসি জিলিপি—একুশ না হোক এগারো হাঁড়ি সাজিয়ে দিতে পারবো না? তত্ত্ব দেখতে চাও তো দেখ আমার এই ট্রাঙ্কে।' নিজেই দু' হাতে করে' ভারি মজবুত ট্রাঙ্কটা প্রতুল মেঝে থেকে বার্থের উপর তুলে আনলো।

নতুন, সন্ত-কেনা ট্রাঙ্ক, মনে হয় গায়ের রঙ এখনো শুকোয় নি। পকেট থেকে চাবি বার করে' ডালাটা খুলে ফেলে প্রতুল বললে, 'দেখ।'

কত রকমের সাড়ি—বেনারসি, মান্দ্রাজি, ভাগলপুরি, কাবেরি ; স্কার্ট-পাড়, জংলি, একরঙা। পাড়ের কী ছটা। আর এই ব্লাউজের স্তূপ। কাঁধ-কাটা, ফুল-হাতা, ভি-গলা, কোনোটা বা মোগলি আমলের গলা-তোলা। আর এই সায়া-সেমিজ। আর এই সব আরো আধুনিক-তরো দেহ-শাসন-বস্ত্র। শুকনো সাড়িতেই সে বাক্স বোঝাই করে' আনে নি। এই-দেখ তলায় পড়ে' রয়েছে এই নেকলেসের কেসটা, লীলারামের দোকান থেকে কেনা, রিয়েল পার্ল; আর এই তোমার ঝুমকো না ঝাড়লণ্ঠন, যা বলতে চাও ; আর এটা একটা আংটি না তো মনে হচ্ছে আকাশের তারার টুকরো! আর এই দেখ রিস্ট্-ওয়াচ, মাইক্রস্কোপ লাগিয়ে সেকেণ্ডের কাঁটা দেখতে হয়। তারপর এই বড়ো বাণ্ডিলটা খোলো : আয়না আর চিরুনি, তেল আর তোয়ালে, ফিতে আর কাঁটা, স্নো আর পাউডার, ক্রিম আর ওয়্যাক্স্, আলতা আর সুর্মা, লিপস্টিক আর কিউটেক্স, সাবান আর স্পঞ্জ, প্যাড আর খাম, স্কুইব আর পার্কার, কুরসি আর কাঠি, নিটিং-কেস আর পিক্টোগ্রাফ ! কত ! কত ! অধিবাসের তত্ত্বের জন্যে ভাবনা !

বিস্ময়ে অমিয় একেবারে সাদা হ'য়ে গেলো। বললে, 'এত ?'

'হ্যাঁ। আর-কাউকে নয়, বউকে দিচ্ছি। কেউ কিছু বলতে পারবে না বাবা।' গর্বিত মুখে প্রতুল একটু হাসলো ; 'তবু এ তো শুধু অবতরণিকা।'

'না, এত সব আপনি এক অধিবাসের তত্ত্বেই দিয়ে দিতে পারবেন না।' অমিয় আপত্তি করলো।

'তা তুমি যখন বরকর্তা, তুমি যা বলো সেই অনুসারেই তত্ত্বকামও তুমিই করাবে, আর বিয়ের সভাতে আমাকে নি তোমারই অনুমতি নিয়ে।'

'আমারো হয়েছে পোড়ো বাড়ি, স্থানেস্থিতিতে ঠাকুমাটা ছিলো, তাও পটল তুললে। মা তো বাবার সঙ্গেই, সিউড়িতে। আমি কি কিছু জানি কী করতে হয় বা না-হয়!'

'রেখে দাও, বরের আবার ভাবনা। টাকা ফেললে ওরাই সব ঠিক-ঠাক করে' দেবে। নাও, সিগরেট খাও', প্রতুল মার্কোভিচের টিন বার করলো: 'গলাটা শুকিয়ে গেল।'

অমিয় তার দিকে চেয়ে কি রকম করে' যেন হাসলো।

'কি আর করা! নেহাৎ বিয়ে করতে যাচ্ছি বিভুঁয়ে, মুখে তো আর গন্ধ করতে পারি না।'

সিগরেট ধরিয়ে অমিয় বললে, 'কিন্তু সঙ্গে একটা বেডিং আনেন নি কেন?'

'এক রাত্রির তো মামলা, তোমারটাতেই ভাগাভাগি করে' চালিয়ে নিতে পারবো। তারপর ওরাই তো শয্যা দেবে, যদিও জানি সে-শয্যা তোলবার জন্যে শালা-শালির হাতে আমার জরিমানা আছে।' প্রতুল বিরাট একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলো; বললে, 'আর নয়, আলো নিভিয়ে এবার শুয়ে পড়া যাক। হ্যাঁ, পাখাটা চলুক। ক্যাচ দু'টো ফেলে দাও দরজার। প্রত্যূষে সেই গোয়ালন্দ।'

গন্তব্য গ্রামে এসে তারা পৌঁছুলো, বেলা তখন প্রায় দেড়টার কাছাকাছি। ষ্টিমার-ঘাটে দু'-দুখানা গয়নার নৌকো ছিল, একখানা শূন্য ফিরলো। গ্রামের ঘাটে অনেক লোকের ভিড় জমেছে, ভদ্রলোক থেকে চাষা-মজুর, কোঁচা থেকে গামছা পর্যন্ত। দুটো কলাগাছ পোঁতা, কলসীর উপরে ডাব বসানো, লাল-নীল কাগজের শিকল ঝুলছে। [illegible] কাঁসিও জুটেছে দুটো।

নৌকো থেকে নামলো শুধু অমিয় আর প্রতুল, মাথায় সিল্কের পাগড়ি বাঁধা, আর মাঝির মাথায় মাল-পত্র।

রাজেন বিশ্বাস, গ্রামের ডাক্তার, ক্যাম্বেলের, কন্যার দিক থেকে এ-বিয়ের তদারক করছিলো। ঢাক-ঢোল, লতা-পাতা যেটুকু জাঁক-জমক দেখা যাচ্ছে সব তার উদ্যোগে। এমন কি বিয়ের রাত্রের জন্যে গোটা কয় হাউই আর সাপবাজি পর্যন্ত সে সংগ্রহ করেছে।

অমিয় তার অচেনা নয়, তাকেই সে সম্বোধন করে' বললে, 'কি হে, আর কই ?'

অমিয় ডাক্তারকে প্রণাম করলো, বয়েস তার চল্লিশের ওপারে। বললে, 'শেষ পর্যন্ত কেউ আসতে পারলো না। কারু মেনিনজাইটিস, কারু পিতৃশ্রাদ্ধ, কেউ বা য়্যায়ারে বিলেতে চলেছে।'

'এ কেমন কথা! তুমিই কি বরকর্তা নাকি ?'

'আমি উভচর।' অমিয় হাসলো।

লাগোয়া জমিদারের কাছারি-বাড়িতে বরের জায়গা হয়েছে। নিচু তক্তপোষে পুরু করে' ফরাস-পাতা, তাকিয়াও আছে দু'-একটা, এনামেলের ট্রেতে করে' পান-সিগরেট সাজানো, উপরে ইলেকট্রিক ফ্যান না হ'লেও মাদুরের টানা পাখা ঝুলছে, প্রতুল ভাবলো, উপক্রমণিকাটা মন্দ মিলছে না। ঘরে ঢুকতেই কে কোত্থেকে ক'টা পটকা ফোটালো, গর্জনের চেয়ে ধোঁয়াই যার বেশি, কিন্তু আওয়াজটা সব চেয়ে বেসুরো লাগলো রাজেনের কানে। ব্যাপারটা যেন তার কাছে বিয়ের মতো বলে'ই মনে হচ্ছে না।

অমিয় বললে, 'একটা চাকর চাই। আরেকটা পুরুত। কী লাগবে না লাগবে কিছুই আমাদের জানা নেই। একটা মুকুট পর্যন্ত আমা কেনা হয় নি।'

ভরসা দিয়ে বললে, 'পাঁচ মিনিটে আমি সব জোগাড় করে' দিচ্ছি তোমাদের ভাবতে হবে না। আগে খানিক বিশ্রাম করো। ওরে, বাবুদের ডাব কেটে দে।'

পাথরের বাটিতে করে', প্রতুল ভাবলে। এখন সুশীতল পানীয়ই চাই। ছন্দ মিলছে না।

রাজেন বললে, 'তোমরা কি পুকুরে স্নান করবে, না, বালতি করে' জল তুলে দেবে? গরম জল ঠাণ্ডা করা আছে।'

প্রতুল বললে, 'পুকুরে।'

স্নান করবার প্রাক্কালে অমিয়কে রাজেন ভবানন্দবাবুর কাছে টেনে নিয়ে গেলো। বললে, 'এ কেমনতরো বিয়ে? সঙ্গে আত্মীয় নেই, জ্ঞাতি-কুটুম নেই, বন্ধু-বান্ধব নেই—এ কি দুষ্যন্তের বিয়ে নাকি?'

'কোথায় পাবেন উনি আত্মীয়-স্বজন?' অমিয় একটু-বা বিরক্ত হ'য়েই বললে, 'যারা ওঁকে পরিত্যাগ করেছে সদলে তাদেরকেও উনি অস্বীকার করতে চান। আর গুচ্ছের আত্মীয়-কুটুম্ব এলেই আপনারা সামলাতে পারতেন নাকি?'

'তা তো ঠিকই।' ভবানন্দবাবু সায় দিলেন: 'আমাদের সামর্থ্য কোথায় যে ওঁদের অভ্যর্থনা করবো।'

'আর এলে কোন আত্মীয় কোথা দিয়ে কী গোলমাল বাধাতো তার ...? পণ নেই, দানসামগ্রী নেই, নমো-নমো করে' কাজ সেরে দেয়া—এ তারা বরদাস্ত করতো নাকি?' অমিয় প্রায় রাগ করে' উঠলো।

'তা যা বলেছ, একশোবার!' ভবানন্দবাবু ঘাড় হেলালেন।

'কিন্তু ব্যাপারটা যেন কেমন লুকিয়ে হচ্ছে বলে' মনে হচ্ছে না?' ...ন বিশ্বাস তবু আপত্তি করলো।

'তা একটু লুকিয়েই হচ্ছে বৈ কি।' অমিয় ঝাঁজালো গলায় বললে, 'জগদীশ যে কোলকাতায় ফিরেছে এ-খবরই তো তার আত্মীয়স্বজনরা কেউ জানে না। জানে না, কারণ, ইচ্ছে করে'ই তাদেরকে তিনি কিছু জানান নি। কারণ, তা হ'লে দিগ্বিদিক থেকে শত হস্ত এসে প্রসারিত হবে ওঁর পকেটের গহ্বরে, যে-সব হাত একদিন তাঁকে মারতে পর্যন্ত উদ্যত হয়েছিলো। সংসারে যার আত্মীয় নেই, কিম্বা যে আত্মীয়তা অস্বীকার করে, তার কখনো বিয়ে হ'তে পারবে না?'

'যাই বলুন, ব্যাপারটা আমার বিশেষ ভালো লাগছে না।' রাজেনের মুখ তেমনি মেঘলা করে'ই রইলো।

'তা হ'লে এই বিয়ে আপনারা বন্ধ করে' দিতে বলেন নাকি?' অমিয় রুখে উঠলো।

'কী সর্বনাশ!' দুই হাত তুলে ভবানন্দবাবু হাঁ-হাঁ করে' উঠলেন।

'আর এই পাত্র!' অমিয় গদ্গদ গলায় বললে: 'লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। টাকা, টাকা, এ-যুগে টাকাই হচ্ছে ক্রাইটিরিয়ান, সভ্যতার, সংস্কারের, এমন-কি মর‍্যালিটির। সেই টাকা ওঁর কাছে হাতের ময়লা। আর সেই সঙ্গে দয়া করে' আপনাদের মেয়েটির কথাও ভেবে দেখবেন।'

'সহস্রবার!' ভবানন্দবাবু নিশ্চিন্ত সায় দিলেন।

'আমার তো মনে হয় রেখার পূর্বজন্মের তপস্যা ছিলো, তপস্যা।' অমিয় বলে' চললো: 'নইলে এ-জন্মে এমন বরলাভ ঘটতো না। আজকালকার ছেলে, টাকা যখন আছে তখন সবই আছে, ইচ্ছে করলে কা'কে না বিয়ে করতে পারতেন, ম্যাট্রিক থেকে বি-এ বি-টি পর্যন্ত—দিশি, বিলিতি, ইঙ্গ-বঙ্গী, কা'কে নয়? কী শুভক্ষণে রেখাকে কেমন তাঁর চোখে লেগে গেছে, তাই তিনি না উদ্যাচা

পাণিপ্রার্থনা করে' বসেছেন! নইলে তাঁর কী দায় পড়েছিলো সিমলের মেয়ে না বিয়ে করে' এই গেঁয়ো মেয়ে বিয়ে করা? আমার তো মনে হয় মহাভারতের পরে এমন উদারতার দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায় নি।'

'এক বর্ণও তুমি মিথ্যা বলো নি।' ভবানন্দবাবু কৃতজ্ঞতায় গলে' গিয়ে বললেন, 'দুর্লভ মহানুভবতা। সবই ঈশ্বরের করুণা, তাঁর বিধান।' পরে তিনি রাজেনের কাঁধে হাত রাখলেন: 'মিছে তুমি মুষড়ে যাচ্ছ! শিব নিয়ে আমাদের কথা, তার প্রমথদের নিয়ে নয়। কী হ'বে আমার কুটুম্ব নিয়ে, যদি জামাইর মতো জামাই পাই!'

'ও মাথা মুড়েছে কেন বলতে পারো?' রাজেনের কোথায় আটকাচ্ছে বোঝা গেলো এতক্ষণে।

'এই কথা?' অমিয় উঠলো অনর্গল হেসে। বিলিতি হেয়ার-কাটিং সেলুনে প্রতুলের দুর্গতির সে বর্ণবহুল কাহিনী বললে।

রাজেনের ঠিক মনঃপূত হ'লো কিনা বোঝা গেলো না। ভবানন্দবাবুর দিকে ফিরে সে হঠাৎ জিগগেস করলে: 'পাশের গাঁয়ে গদাধরবাবুর এক বিধবা বোন থাকতেন না?'

ভবানন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আছেন এখনো।'

'তাঁকে আনতে ডুলি পাঠান। আর ঢাকায় গদাধরবাবুর বড়ো মেয়ে আছে, তাকেও একটা টেলি করে' দিন। কালই এসে পৌঁছে যেতে পারবে।'

'তার স্বামীর নাম তো জানি না।'

'আমি জানি।' রাজেন জোর-গলায় বললে, 'সনৎ চক্রবর্তী, লক্ষ্মীবাজারে থাকে। একই বছর আমরা ক্যাম্বেল থেকে বেরুই।'

'কী বলো অমিয়?' ভবানন্দবাবু অমিয়র অনুমোদন প্রার্থনা করলেন।

'নিশ্চয়ই। কন্যাপক্ষ থেকে যাকে খুসি আপনারা নিমন্ত্রণ করতে

পারেন, আমাদের কী বলবার আছে!' অমিয় কথার ভিতরে একটা রাগ পুষে রেখে বললে, 'কিন্তু এ-সব যদি হীন সন্দেহ করে' আমার বন্ধুকে অপমান করবার মতলোব হয়, তবে কাজ নেই এ-বিয়েতে, এ-বিয়ে না হ'লে জগদীশদা আর সন্নেসি হ'য়ে যাবেন না।'

অমিয় চলে' যায় আর-কি।

'দরকার নেই, দরকার নেই ও-সবে।' ভবানন্দবাবু দশ হাতে ত্রস্তব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন: 'ও-সব তোমার অন্যায় বাড়াবাড়ি, রাজেন। ডুলি-ফুলি আমি পাঠাতে পারবো না, নেমন্তন্ন-চিঠি পর্যন্ত আমি ছাপাতে পারি নি, ও-সব অনাবশ্যক টেলি-ফেলি করা আমার পোষাবে না। শুভেলাভে বিয়েটা হ'য়ে গেলেই আমি পার পাই। একেক সময় মাথাটা কেমন তোমার বিগড়ে যায়, রাজেন। আমাদের অমিয়ই তো আছে, তবে কিসের কী!' ক্ষিপ্রহাতে অমিয়কে তিনি ধরে' ফেললেন।

কাচারি-বাড়িতে ফিরে এসে অমিয় দেখে, সুটকেস থেকে স্নানের আনুষঙ্গিক একটাল জিনিস-পত্র খুলে প্রতুল ম্লান মুখে বাঁ-হাত দিয়ে ডান-হাতের নাড়ি টিপছে।

'কি হ'লো?'

'গ্রামটায় বুঝি খুব ম্যালেরিয়া?' চোখে একটা ছলছলে ভাব এনে প্রতুল বললে, 'কেমন জ্বর-জ্বর করছে ভাই।'

'জ্বর?' বলে' অমিয় তার কপালে গলায় বুকে ঘন-ঘন হাত রাখতে লাগলো; বললে, 'কই, গা তো পাথরের মতো ঠাণ্ডা।'

'না, শরীরটা ভালো নেই, স্নান করবো না, শুধু মাথা ধোবো। অল্পেতেই সাবধান হওয়া ভালো।' বলে' প্রতুল অমিয়কে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললে, 'আসল কথা কী জানো? পৈতে আনতেই ভুলে গেছি।'

'কেন, আপনার ছিলো না ?'

'ছিলো বৈ কি, আগে ছিলো। কখনো মাজায়, কখনো গলায়, কখনো ব্র্যাকেটে। কিন্তু যখন দেখলাম নাপিত পর্যন্ত পৈতে নিচ্ছে, ঘেন্না ধরে' গেলো, ওটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিলাম। মনে-মনে বললাম', প্রতুল একটা থিয়েটারি ভঙ্গি করলো : 'মনে-মনে বললাম, আমি মানুষ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি বীর্যবান।'

'কিন্তু এই আধুনিক পোজটা এরা এপ্রিসিয়েট করতে পারবে কি না সন্দেহ হচ্ছে।' অমিয় চিন্তিত মুখে বললে।

'সেই ভয়েই তো গেঞ্জিটা গা থেকে খুলতে পারলাম না। মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে, আশ্চর্য, আমারো ভুল হয়!' প্রতুল ন্যাড়া মাথাটাই ক'বার চুলকে নিলো : 'কিন্তু এর একটা তোমার ব্যবস্থা করতে হয়, অমিয়। তোমার গ্রাম, ফাঁক-ফন্দি তুমিই ভালো জানো।'

'তা আমি জোগাড় করে' দিচ্ছি।'

জ্বর-জ্বর ভাব শুনে বরের জন্যে ফুলকো লুচির বন্দোবস্ত হচ্ছিলো, কিন্তু শ্রান্ত প্রতুল কালকের আসন্ন উপবাস ও আজকের তার ক্ষুধার্ত উদরের পরিধির কথা স্মরণ করে' বললে, 'না চাট্টি গরম ভাতই খাবো। আজকালকার ডাক্তারি মতে গরম ভাতটা আর জ্বরের কুপথ্য বলে' ভাবা হচ্ছে না।' বলে' সে ফার্মাকোলজির নতুন একটা থিওরি আওড়ে দিলো। রাজেন বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে' বললে, 'জিগগেস করুন না ওঁকে।'

রাজেন বিশ্বাস হাঁ-না কিছু বললে না, মুখে তার আরেক পর্দা গাম্ভীর্য উঠলো ঘনিয়ে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শালা-শালিদের নিয়ে প্রতুল গল্প করতে বসেছে, এক্ষেত্রে সমস্ত গ্রামবাসী ও বাসিনীকেই সে সেই চোখে

দেখছে ; খুলে দেখাচ্ছে তার ইলেকট্রিক টর্চ, চকিত আলোর ঝাপটায় কৌতূহলী মুখ-চোখ সব ঝলসে দিচ্ছে—খুলে দেখাচ্ছে তার ক্যামেরা, সেকেণ্ডে-সেকেণ্ডে স্ন্যাপ নিচ্ছে—খুলে দেখাচ্ছে তার বাইনাকিউলার, দূরের মানুষকে মুহূর্তে টেনে আনছে একেবারে মুঠোর কাছে। এমনি যখন সে মশগুল, অমিয় তার পাশে বসে' বললে, 'আপনার পিসিমা আসছেন, আজই, সন্ধের আগে।'

'পিসিমা ?' প্রতুল একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

'হ্যাঁ, এই পাশের গ্রামেই নাকি থাকেন। ডুলি গেছে তাঁকে আনতে।'

'ও, হ্যাঁ !' প্রতুল মনে করবার অস্পষ্ট চেষ্টা করলো : 'হ্যাঁ, আছেন বটে পিসিমা। এই পাশের গ্রামেই থাকতেন বলে' শুনেছি। তা, তিনি আসছেন কেন ?'

'আপনাকে সনাক্ত করতে।'

প্রতুল অজস্র হেসে উঠলো। বললে, 'আমাকে পারবেন তিনি চিনতে ? কত ছোটটি দেখেছেন। দেখেছেন কিনা সন্দেহ। বাবার সংসারে থাকতেন না, থাকতেন এই গ্রামে পড়ে'। তিনি তো বিধবা ?'

'তাই তো শুনলাম। নিঃসন্তান।'

'কচি বয়সে বিধবা হয়েছিলেন যে, বিয়ের বছর দুই পরেই। তা মাকে এখন চিনতে পারলে হয়।'

'আর আপনার দিদিও আসছেন, কালকের ষ্টিমারে।'

'কে বড়দি ? ঢাকা থেকে ?'

'হ্যাঁ, রাজেন বিশ্বাস টেলি করে' দিয়েছে। ওঁর ডাক্তার-স্বামী নাকি তার বন্ধু।'

'হ্যাঁ, ডাক্তার, ফিমেল-ডিজিজে খুব পসার জামাইবাবুর। তা মন্দ

নয়, এলে দেখা হ'বে। আঠারো বছর আজ নিরুদ্দেশ, এই আমার আজ চৌতিরিশ। এসে এক লহমায় সব চিনতে পারবে কিনা কে জানে।' প্রতুল একটু বিষণ্ণ গলায় বললে, 'ওঁদের সব এমন করে' ডেকে না পাঠালেই এঁরা ভালো করতেন।'

'তা আমি বারণ করে' দিয়েছিলাম। ভবানন্দবাবু শুনতেন, কিন্তু রাজেন বিশ্বেসের গোঁ আর ষাঁড়ের গোঁ এক জাতের।'

'বুঝলে না, আমারই আত্মীয়-স্বজন, আমি ডাকলাম না, মেয়ের বাড়ির নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এলো, ব্যাপারটা ভালো দেখায় না। এতে কি তাদের ঠিক সম্মান করা হবে?'

'আমি বারণ করে' দিয়েছিলাম, কিন্তু রাজেন বিশ্বেসটা হচ্ছে ডাকসাট ডাকাত। এইটুকু ফোড়া হ'লে কাটবে সে এতখানি। জ্বর ছাড়লেও সাত দিনে সে ভাত দেবে না। আমি যাচ্ছি এখুনি', অমিয় উঠে পড়লো: 'এর একটা হেস্তনেস্ত করে' আসতে হবে।'

'থাক, এ নিয়ে আর গোলমাল করে' লাভ নেই।'. প্রতুল তাকে বাধা দিয়ে বসিয়ে রাখলো, বললে, 'পাশার দান যখন পড়ে' গেছে, চাল দিতেই হ'বে, ঘুঁটি পাকুক আর কাঁচুক। মন্দ কি, আসুক না সবাই। তুমি ওদেরকে শুধু বলে' দাও—বড়দি তার ছেলেপিলে নিয়ে এলে মেয়ের বাড়িতে কিছুতেই আমি থাকতে দেবো না। আমাকে এর জন্যে আলাদা বাড়ি দিতে হবে, সমস্ত রকম সুখ আর সুবিধে, এতটুকু ত্রুটি কোথাও সইবো না বলে' রাখছি। দিদি আমার, ওদের কে?'

'এখুনি বলছি গিয়ে।' অমিয় উঠে পড়লো: 'টের পাবেন এবার যাদুরা।'

'আর শোনো', প্রতুল জিনিস-পত্রগুলো বাক্সে তুলে রাখতে লাগলো: 'সন্ধের আগেই মেয়েকে আশীর্বাদ করবো বলে' এসো।'

৩

রাজেন বিশ্বাস বাড়ি দিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু বিয়ের আগে স্বয়ং বরের কনে-আশীর্বাদের প্রস্তাবে সে সম্মত হচ্ছে না। বলছে, এমন নিয়ম অন্তত আমাদের এ-অঞ্চলে প্রচলিত নেই।

অমিয় বললে, 'আপনাদের এ-অঞ্চলটাই শুধু সভ্যতার আলো পায় নি। মশা, সাপ, কচুরিপানা আর হাতুড়ে ডাক্তারে ভরতি।'

এ-ব্যাপারে ভবানন্দবাবুর পুরো সমর্থন আছে, তাঁর বাড়ির মেয়েদের আঠারো আনা। আশীর্বাদের ব্যাপারটার থেকে আশীর্বাদের জিনিসটার প্রতি এদের বেশি কৌতূহল।

ভবানন্দবাবুর প্ররোচনায় বৃদ্ধ কেদার দাস বললেন, 'তোমার সবতাতে বাড়বাড়ি, রাজেন। সেকাল আর নেই ভাই, এই গাঁয়েও নেই। নইলে এত বড়ো-মেয়ে নিয়ে ভবানন্দ নির্বিবাদে টিঁকে আছে, একঘরে হচ্ছে না? আজকালকার ছেলেরা বিয়ের আগে কোর্টসিপ করে, চিঠি লেখে, ফটো পাঠায়, আর এ তো নিরিমিষ আশীর্বাদ করা। মানে, একটা কিছু প্রেজেন্ট করা। বলে নি যে, মেয়ের সঙ্গে নিরালায় আজ একটু কথা কয়ে' দেখব, এই ঢের।'

'আর সেটার মধ্যেও লেজিটিমেসি ছিল।' অমিয় ফোড়ন দিল।

'না, না, করতে চায়, করবে বই কি আশীর্বাদ।' ভবানন্দবাবু ফতোয়া দিলেন: 'আর, স্বামী দেবতা, সেই তো আশীর্বাদ করবে। তুমি যাও, অমিয়, জগদীশকে নিয়ে এসো। চলো, আমিও যাচ্ছি।'

মেয়েরা সমস্বরে কলধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। রাজেন রইলো চুপ করে', গুম হ'য়ে। অর্থাৎ সেখানে সে আর রইলো না।

রেখাকে কোণের ঘরে বসিয়ে সাজাচ্ছিলো. ঝাঁকে-ঝাঁকে মেয়েলি

কণ্ঠের উলু শুনে সে বুঝলো, জগদীশ তাকে দেখতে আসছে। বুকের মধ্যিটা অসহ্য আনন্দে কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে জমাট বেঁধে গেল, মনে হলো তার শরীর এত মূর্ছনা যেন সইতে পারবে না।

কতদিন পরে সে আসছে, যেন জন্ম-জন্ম পরে। তার জন্যে কতকাল সে প্রতীক্ষা করে' বসে' ছিলো, দিনের নিরালায় আর রাতের অঘুমে। কাউকে তোমরা বলো না, রোজ সকালে ঘুম ভেঙে ঈশ্বরের কাছে সে প্রার্থনা করেছে, আর কিছু নয়, তার যেন বিয়ে হয়। আজ তার অধিবাস কাল তার সেই বিয়ে। আশ্চর্য, তারো জীবনে সে এলো, পথ চিনে কোথা দিয়ে কী করে' যে এলো তা কে বলবে! এ কি কখনো ভাবা যায় দিনের আলোয়, এ কি কখনো ধরা যায় হাত বাড়িয়ে? শুধু সে তার গরিব বাপ-মাকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে না—নিজেও সে মুক্তিতে বিস্ফারিত হ'য়ে পড়বে, সমস্তটা আকাশের মতো! মুহূর্তে তার সমস্ত দারিদ্র্য যাবে ঝরে', গৃহ থেকে, দেহ থেকে। সে সেজে উঠবে, বেজে উঠবে, ভরে' উঠবে। ভাবতেও ভয় করে। খুব একটা সুখের সময়, ভালোবাসার সময়, মানুষের বুঝি এমনি ভয় হয়।

মাকে প্রণাম করবার সময় তাঁর পা দুটো সে অনেকক্ষণ আঁকড়ে রইলো।

মা বললেন, 'ভয় কিসের?'

সূর্যকে আর যে-ই ভয় করুক, সূর্যমুখী করে না। রেখা মনে-মনে একটু হাসলো।

মাথায় পাগড়িটা ভালো করে' এঁটে প্রতুল চাদর-ঢাকা সতরঞ্চির উপর বসেছে, কুন্ঠিত মুখে রেখা এসে দাঁড়ালো।

অমিয় বললে, 'বোসো।'

দু'টি পা মুড়ে মনোরম কোমলতার ভঙ্গিতে রেখা বসলো।

প্রতুল তাকে দেখলো এবার মুখোমুখি। কালো বটে দেখতে, কিন্তু এ-কালো যেন শান্তি, এ-কালো যেন শীতলতা। তেমন করে' দেখতে জানলে সব কিছুরই যেন নতুনতরো অর্থ ফুটে ওঠে। প্রথমাগমের দিন থেকে ধরলে যৌবন তার দেহে তখন রাশীকৃত হ'য়ে ওঠবার কথা, কিন্তু শ্রমে ও সেবায় সমস্তটি শরীর তার মার্জিত, মেদবিরল। সহুরে মেয়েদের বেলায় যেটা রুক্ষতা বলতে পারো, সেটা এখানে বিষণ্ণতা, যে-বিষণ্ণতা গ্রামের সমস্ত সবুজে, সমস্ত নীলিমায়। সুন্দরী বলতে পারো না, বলতে পারো পরিচ্ছন্ন। সতেজ একটি সজীবতা তার শরীরে সহজ একটি দীপ্তি বিস্তার করেছে। মাটির সঙ্গে সংযুক্ত সবৃন্ত একটি সদ্যস্ফুট ফুল, তোমার ফুলদানির ফুল নয়। প্রথমে দেখলেই মনে হয় মেয়েটি অত্যন্ত সুস্থ, আর সে-স্বাস্থ্য শুধু একটা শারীরিক অর্থে নয়। যদি বলি তার এই লজ্জাটুকু পর্য্যন্ত সুস্থ, তা হ'লেই কিছুটা হয়তো বুঝতে পারবে।

এমন কি, প্রতুল যে প্রতুল তারো একবার মনে হলো এ-মেয়ে তার যোগ্য নয়। কথাটা ঘৃণার নয়, বিষাদের। তার এত অভিজ্ঞতা, এত অজস্রতা, এত ঐশ্বর্য—কিছুই যেন কুলিয়ে উঠবে না।

কিন্তু ঐ তার ফিলজফি, পাশার দান যখন পড়ে' গেছে তখন চাল দিতেই হ'বে, ঘুঁটি পাকুক কিম্বা কাঁচুক। চাদরের তলা থেকে মখমলের একটা কেস বা'র করে' রেখার হাতের কাছে সে এগিয়ে দিলো।

'খুলেই দেখান না কী আছে।' কে-একটি প্রগলভা মেয়ে ভিড়ের মধ্য থেকে বলে' উঠলো।

মোড়ক খুলে অমিয় দেখালো, মুক্তোর নেকলেস।

'কী চমৎকার!' বহু কণ্ঠ ঝলসে গেল সেই মুক্তোর দ্যুতিতে।

সেই প্রগলভা মেয়েটিই বুঝি বললে, 'ওটা অমনি করে' হাতে দিলে চলবে না, গলায় পরিয়ে দিতে হবে।'

'তা' দিচ্ছি পরিয়ে।'

প্রতুল এতে পেছপা নয়, হাঁটু মুড়ে সে এগিয়ে এলো, আর কে জানে, রেখাও হয়তো গলাটা দিলো সামান্য বাড়িয়ে। কিন্তু ঘাড়ের উপর তার স্তূপীকৃত খোঁপাটা হঠাৎ ভেঙে পড়াতে দু'পারের হুকদু'টোর সংস্থিতি ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। চুলের মধ্যে খানিকক্ষণ অযথা হাঁপিয়ে উঠে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে প্রতুল বললে, 'ও তুমিই পরো। আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

অল্প একটু হেসে কাঁধের ওপারে হাত দু'টি উত্তোলিত করে' রেখা চোখের এক পলকে নেকলেসটা পরে' ফেললো।

সঙ্গে-সঙ্গে শত রসনায় হাসি, অনেকটা যেন প্রতুলের পরাজয়ে। নিচু মুখে রেখাও হাসছে, কিন্তু সে-হাসির অর্থ: তুমি এত সহজে হার মানলে কেন?

এমনি একটা ভাববিনিময়ের সময়, ভর সন্ধে বেলা, উঠোনের ও-কোণ থেকে তীক্ষ্ণ গলায় একটা আর্তনাদ উঠলো: 'ওরে জগু এসেছিস, আমার জগু এতদিনে ফিরে এলি বাবা!'

প্রতুল তড়াক করে' লাফিয়ে উঠলো: 'পিসিমা।'

প্রায় ষাট-সত্তর বছরের এক বুড়ি কাঁদতে-কাঁদতে টলতে-টলতে বারান্দায় উঠে এলেন, মুখে তাঁর সেই এক আর্তনাদ: 'ওরে কোথায় তুই?'

প্রতুল তাঁকে দু'হাতে সাপটে ধরলো।

'ওরে হতভাগা, এতদিন বাদে আমাদের মনে পড়লো?' পিসিমা, জরায় কুঞ্চিত, খর্ব পিসিমা, প্রতুলের প্রশস্ত বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে হাপুস চোখে কেঁদে উঠলেন: 'গদা তোকে ডেকে-ডেকে হায়-হায় করে' চলে' গেলো, তুই একটিবারো ফিরে তাকালি না। কোথায় ছিলি এতদিন?'

'বনে-বাদাড়ে, পাহাড়ে-পর্বতে।' প্রতুল তাঁকে নিচু হ'য়ে প্রণাম করলো : 'অমন অস্থির হয়ো না, এখানটাতে বোসো। এই তো ফিরে এসেছি, এবার ভয় কী।' প্রতুল বুড়িকে সতরঞ্চির উপর বসিয়ে দিলো।

পিসিমা তার বুকে-পিঠে সস্নেহ হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন, 'কতো বড়োটি হ'য়ে উঠেছিস, কী জোয়ান। সেই সে-দিনের জগু!'

'সময়ের দোষ, পিসিমা।'

'হ্যাঁ রে, তুই নাকি খুব বড়োলোক হয়েছিস, কী সব তিসির ন পিপুলের ব্যবসা করে' ?'

'তোমাদের আশীর্বাদে, পিসিমা। শিগগিরই আরো বড়োলোক হ'তে যাচ্ছি।' বলে' প্রতুল পার্শ্বাসীনা রেখার দিকে সসঙ্কেত দৃষ্টিক্ষেপ করলে। বললে, 'কেমন আছো তুমি?'

'আর আছি!' পিসিমা বললেন, 'চোখেই ভালো দেখতে পাচ্ছি না আজকাল।'

প্রতুল বললে, 'তা চোখে ছানি পড়ে' থাকে, কোলকাতায় আমার ওখানে যেয়ো, কাটিয়ে দেব 'খন।'

পিসিমা আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, তুই নাকি ভবার বড়ো মেয়েটাকে বিয়ে করছিস?'

তাঁর কথা শুনে সকলে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো।

'তোরা হাসছিস কেন লা ছুঁড়িরা?' পিসিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন : 'এক পয়সা দেবে না থোবে না, উপোস করিয়ে দান, উপোস করিয়ে বিদায়—এ আবার একটা বিয়ে নাকি?'

'দেয়া-থোয়া দিয়ে কী হ'বে, পিসিমা, আমার অনেকই তো আছে।' প্রতুল সকরুণ স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'এখন কেবল পাত্রীটি নিয়ে কথা।

শিবকেও একদিন ভিক্ষায় বেরুতে হয়েছিলো পিসিমা, কিন্তু তার ক্ষুধা মিটিয়েছিলো শুধু অন্নপূর্ণা।'

'এ আবার একটা পাত্রী নাকি?' পিসিমা ততোধিক ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠলেন: 'অন্নপূর্ণা তো নয়, শ্মশানকালী। আমি বুঝি তাকে দেখি নি ভেবেছিস? এইটুকু বেলা থেকে দেখছি।'

কিন্তু সম্প্রতি তাকে দেখতে পাচ্ছেন বলে' মনে হলো না।

তাই সন্তর্পণে রেখার দিকে একটু এগিয়ে তাকে চুপি-চুপি বলার মতো করে' প্রতুল বললে, 'তুমি এখন যাও। আমারই সামনে তুমি তোমার নিন্দা শুনবে এটা অসহ্য।'

রেখা উঠে চলে' গেলো।

পিসিমা তাঁর আগের কথায় ফিরে গিয়ে বললেন, 'এ-বিয়ে আমি হ'তে দেবো না।'

প্রতুল বললে, 'এ-বিয়ে হবে বলে'ই তো তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।'

'হবে বললেই হবে।' পিসিমার চোখে আবার বান ডেকে এলো 'গদা আজ বেঁচে থাকলে এ-বিয়ে সে আজ ঘটতে দিতো নাকি? এমন একটা পোড়ো ঘরে?'

প্রতুল দেখলো, এ-আলোচনা অবান্তর। তাই সে বললে, 'আমাকে না বলে' কন্যাকর্তাদের বলো। আমি চললাম, অমিয়। তোমার লোক হাট থেকে মিষ্টি নিয়ে ফিরেছে। অধিবাসের তত্ত্ব সাজাই গে যাই। তুমি এসো চটপট।'

পিসিমা যখন আসেন, রাজেন বিশ্বাস বা'র-বাড়িতে মজুর খাটাতে ব্যস্ত, তাই এ-আলোচনায় সে পক্ষ ছিলো না। খবর পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এলো। এসে দেখলো বুড়ি নির্দন্ত মুখে অগ্নিস্রাব করছে।

কার্য-কারণ খোঁজ না করে' সে সটান প্রশ্ন করলে : 'চিনতে পারলেন জগদীশকে ?'

'চিনবো না, সোনার কার্তিক জগদীশ দিগ্বিজয় করে' বাড়ি ফিরেছে, চিনতে পারবো না ? একটা হাঁচি দিলে পর্যন্ত তাকে চিনতে পারি। রক্তের টান, নাড়ির টান।'

রাজেন স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। বললে, 'চিনতে পারলেন, এ গদাধরের ছেলে জগদীশ ?'

'তবে কি এ করিমদ্দির ছেলে অজিমদ্দি ?' পিসিমা মুখিয়ে উঠলেন : 'কই, ডাকো দেখি তোমাদের ভবানন্দকে। তার আক্কেলটা একবার দেখি।'

ভবানন্দবাবু কাছেই কোথায় ছিলেন, অপরাধীর মতো সামনে এসে জানতে চাইলেন তাঁর কী ঘাট হয়েছে।

'আপনার কী আস্পর্ধা শুনি, আপনি গদাধর বাঁড়ুয্যের ছেলেকে জামাই করতে চান ?' পিসিমা কোমর বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ভবানন্দবাবুর মুখ কাঁচুমাচু করে' উঠলো। বললেন, 'আমাদের চাওয়াতে কি কিছু হয় ? সব ভগবানের ইচ্ছে।'

'তা তো বুঝলুম, কিন্তু ক'টি হাজার টাকা তাকে দিয়েছেন শুনি ?'

'কোত্থেকে দেবো ?' ভবানন্দবাবু ম্লানমুখে বললেন।

'কোত্থেকে দেবো !' পিসিমা উঠলেন ভেঙচিয়ে : 'ছেলেমানুষ ভুলিয়ে কেলে-কিষ্কিন্দি মেয়ে পার করছেন, বলি মাগনা ?'

'সব ঐ জগদীশ, জগদীশের উদারতা।'

'খুব যে উদারতা ফলাচ্ছেন দেখছি, কিন্তু ছেলের মাথার উপরে কেউ নেই এমন কথা মনেও স্থান দেবেন না।' পিসিমা তাঁর বৃদ্ধ বয়সে যতদূর

সম্ভব একটা বীরত্বের ভঙ্গি করলেন: 'আমি আছি। এমন শুকনো বিয়ে আমি হ'তে দেবো না।'

ভবানন্দবাবু নিতান্ত বিরক্তমুখে রাজেনের দিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন। বললেন, 'তখন বলেছিলাম এ-সব হাঙ্গাম বাধিয়ে কাজ নেই। গোঁয়ারের একশেষ, কথাটা তুমি কানেই তুললে না।'

রাজেন সাঙ্ঘাতিক অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলো।

তার এই দুরবস্থাটা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করলো অমিয়, যে আনুপূর্বিক সমস্ত ব্যাপারটা ধাপে-ধাপে অনুধাবন করেছে। এ-সব কথা সে তো আগেই বলে' রেখেছিলো—সত্যি কিনা! নাটক নিয়ে তার কারবার, সে জানে কোন দৃশ্যে কী ঘটে' ওঠে!

কাচারি-বাড়িতে যাবার আগে সে শুধু বললে, 'হাতুড়ি থাকলেই ডাক্তারি করা চলে না, বুদ্ধি থাকা চাই। এখন পিসিমার শুকনো হাত তৈলাক্ত করুন।'

সে-দিনের রাত্রিটা দু' কারণে উল্লেখযোগ্য। এক, পথশ্রান্তিতেই হোক বা যে কারণেই হোক, প্রতুল বিভোর ঘুমিয়ে পড়লো—আর অতি অধিক গরম পড়ার জন্যেই হোক বা যে কারণেই হোক, রেখার চোখে এক রেখা ঘুম এলো না। ঘুমের মধ্যে প্রতুল কী স্বপ্ন দেখলো তা কে জানে, কিন্তু রেখা দেখলো জেগে-জেগে স্বপ্ন, যে-স্বপ্নে রয়েছে দুর্দান্ত কল্পনা, যে-স্বপ্নে তুমি যা ইচ্ছে তা ভাবতে পারো, গড়তে পারো, মুছতে পারো। যাকে লেখাপড়া বলে রেখা তার কিছুই শেখেনি বটে, কিন্তু কল্পনার উদ্দামতায় সে পিছে পড়ে' থাকবে না। কী যে সে ভাবছে তার কোনো হিসেব নেই, কেননা ঘুমে যে-স্বপ্ন দেখা যায়, জেগে উঠে তুমি তার একটা বিবরণ দিতে পারো, কিন্তু জাগন্ত যে-স্বপ্ন তার তুমি কোনো চেহারা আঁকতে পারো না।' সে রেখা থেকে

রেখায় যায় গড়িয়ে, রঙ থেকে রঙে যায় ফেটে, বিবর্ণ, একাকার হ'য়ে। এ-দিক ঠিক করেছ, ও-দিক পড়েছে ভেঙে; ও-দিক সামলাতে গেছ এ-দিককেও আর খুঁজে পাচ্ছ না। এইটুকু শুধু বলতে পারি, যে-স্বপ্ন সে দেখছে সে একটা খুব সুখের স্বপ্ন: সে-সুখের আকৃতি নেই, অবয়ব নেই, তবু সে একটা প্রচণ্ড, প্রকাণ্ড সুখ। এই সুখ নিয়ে, এত সুখ নিয়ে সে ঘুমুতে পাচ্ছে না, পাছে ঘুমুলেই সেটা শুধু একটা স্বপ্ন হ'য়ে ওঠে।

শেষরাতের ঘোলাটে জ্যোৎস্না ফিকে হ'তে-হ'তে ভোর হ'য়ে গেলো। দধিমঙ্গল সেরে রেখা আবার এসে শুয়েছে। শুয়ে-শুয়ে রেখা দেখলো সমস্ত সংসার কাজে-কর্মে মেতে উঠেছে—ঘর-ধোয়ার শব্দ, বাসন-মাজার শব্দ, কাপড়-কাচার শব্দ। কোন ছেলেটা কাঁদছে, কার হাত থেকে কোন জিনিস পড়ে' ভেঙে যাচ্ছে, একটা করতে আরেকটা কে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে আছে শুয়ে, কুঁকড়ে, জামদানি শাড়ির রাঙা আঁচলে গা ঢেকে।

পাড়ার সমবয়সী অথচ বিবাহিতা একটি মেয়ে ঘরে ঢুকে বললে, 'তুই এখুনো শুয়ে আছিস, রেখা ?'

রেখা মিষ্টি করে' হাসলো: 'আজ আমার ছুটি।'

মেয়েটি তার পাশে বসে' বললে, 'শেষকালে তোরো বিয়ে হ'লো।'

এক গা রমণীয় রুক্ষতা নিয়ে রেখা উঠে বসলো। চুলটা ভেঙে ফেলতে-ফেলতে হেসে বললে: 'আমারো।'

'আর এমন রাজপুত্রের সঙ্গে।'

রেখা গলা নামিয়ে বললে, 'সন্নেসির সঙ্গে।'

'ওমা, নেকলেসটা পরে'ই শুয়ে পড়েছিলি।' মেয়েটি বিদ্রূপ করে' উঠলো।

'সত্যিই তো!' সলজ্জ সন্ত্রাসে রেখা তাড়াতাড়ি সেটাকে খুলে ফেললো ; বললে, 'মা বলেছিলেন বাক্সে তুলে রাখতে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, একদম মনে ছিলো না। ছি ছি, সবাই দেখলে কী ভাববে!' রেখা একেক করে' চুলের কাঁটাগুলো খুলে ফেলতে লাগলো।

'এখনো তো এটাকে তুই তুলে রাখছিস না, কোলে নিয়ে আছিস।'

'বাক্সের চাবিটা মা'র আঁচলে। মনে পড়লো, তখন ভুল করে' বাক্সের মধ্যে খাপটাই শুধু তুলে রেখেছিলাম।' রেখা তেমনি নির্ভয়ে হাসলো।

এদিকে প্রতুলের হয়েছে মুস্কিল। এক মুহূর্ত সে একা থাকতে পারছে না, সব সময়েই তাকে ঘিরে গোলাকার একটি ভিড় হ'য়ে আছে।·· দাড়ি কামাচ্ছে, সব রয়েছে তার মুখের দিকে চেয়ে, সাবানে তার কত ফেনা ওঠে, ব্লেডের তার কী পরিমাণ ধার! সিগরেট খাচ্ছে, সবাই হাঁ করে' আছে ধোঁয়া গেলবার জন্যে। ঘড়িতে চাবি দিচ্ছে, এটা যেন প্রায় মোটর চালানো। তার কাপড়ের ঝুল, জুতোর পালিশ, পাঞ্জাবির ঢিলেমি—সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা অলৌকিকতা আছে, এমন কি, যখন সে একটা হাই তোলে, হাঁচি দেয়। প্রতুলের মনে হচ্ছিলো সবাই যেন তাকে বেশি করে' দেখছে, একটু-বা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, তাকে সনাক্ত করতে, তাকে বা'র করে' ফেলতে। সবাইর চোখে যেন রাজেনের সেই বিষাক্ত, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

কেননা, একসময় স্পষ্ট শুনতে পেলো—রাজেন কোন একজন অপরিচিত যুবককে সম্বোধন করে' বলছে: 'কোলকাতায় তুই একে কোনোদিন দেখেছিস, ব্রজ?'

ব্রজ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো: 'দেখেছি বই কি, এ যে ভারি নোন্ ফেস।'

‘কে ও ?’

‘দেশসেবক, ভীষণ স্বদেশী।’

‘নাম জানিস ?’

‘নাম কী করে’ বলবো ? তবে বক্তৃতা দিতে শুনেছি।’

‘কোথায় ?’

‘শ্রদ্ধানন্দ-পার্কে। ঠিক এমনি পাগড়ি মাথায় দিয়ে।’ ”

দুপুরের ষ্টিমারের সময় প্রতুল অমিয়কে চুপিচুপি জিগগেস করলে : ‘বড়দির আসার কিছু খবর পেলে ?’

‘জিগগেস করি নি।’ এ-সব ব্যাপারে অমিয়র মেজাজ ভারি চটে আছে।

‘একবার খোঁজ নিলে মন্দ কী।’

‘এলে আসবেন। এক পিসিমাকেই নিয়েই হাঁপিয়ে উঠেছেন বাছাধনরা। এর পর বড়দি এলে ল্যাজে-গোবরে হ’য়ে যাবেন। আসুন না। তাঁর আসাই তো চাই।’

কিন্তু খবর পাওয়া গেল দুপুরের ষ্টিমারে কেউ আসে নি।

কিন্তু এর পরেও একটা ফেরি আছে, রাত ঘেঁসে।

## ৪

দশটা চুয়ান্ন মিনিটে লগ্ন, এগারোটা পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত। আরেক লগ্ন আছে সেই ভোর রাত্রে, সাড়ে-তিনটের কাছাকাছি। আটটা বাজতেই বর এসেছে আসরে, একটু আগেই, কেননা আগে থেকেই সভাসীন থাকাটা প্রায় অর্ধেক খাসদখল। এদিক থেকে অনুষ্ঠানের অনেক ত্রুটি ছিলো, কিন্তু বিপদে নিয়ম চলে না, যেহেতু নিয়মকর্তারা

মানে শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতরাও এক্ষেত্রে আর্থিক বিপন্ন। টাকা পেলে টিকি পর্য্যন্ত কেটে ফেলা যায়, এ তো ক'টা নিয়ম-কানুন ছাঁট-কাট করা। সাতপুরুষের নাম না জানলে বিয়েটা আর পণ্ড হ'য়ে যাবে না। শোলোক আওড়ে পুরোতরাই প্রতুলকে অভয় দিয়েছে।

মফস্বলের নিমন্ত্রণ হয় মধ্যাহ্নে, আর সে-খাওয়া সুরু হয় ঠিক সন্ধেবেলা। পরের দিন না রেখে এরা আগের দিনে উপোস করিয়ে রাখে। সেই সব উপোসির দল খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রতীক্ষা করে' আছে বিয়ে দেখবার জন্যে। যাত্রা শুনবার জন্যে যেমন তারা ভিড় করে' থাকে, তখন থেকে, যখন বাঁশ খাটিয়ে সামিয়ানটা শুধু টাঙানো হয়েছে।

এমন সময় জনরব, রাতের ফেরিতে সনৎ এসেছে।

রাজেন উঠলো উৎফুল্ল হ'য়ে। বললে, 'তোমার স্ত্রী কোথায় ?'

শোনা গেলো, তার এখন ভরা মাস, রেলে-ইষ্টিমারে আসবার তার অবস্থা নয়।

রাজেন তবু দমলো না। বললে, 'চেন একে ?'

সনৎ হেসে বললে, 'হ্যাঁ-না বলা আমার সাধ্য নয়। জগদীশের যখন দশ বছর বয়েস তখন আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর ওকে আমি বেশি দেখি নি। জানোই তো, তখন আমি আলোয়ারে একটা চাকরি নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'তবে, ঘোড়ার ডিম, তোমাকে ডেকে আনতে গেলাম কেন ?' রাজেন মাটিতে একটা লাথি মারলো।

'ওর দিদিই উদ্যোগ করে' আমাকে পাঠিয়ে দিলে, বৌ-সমেত ওকে একেবারে আমাদের ওখানে ধরে' নিয়ে যেতে।'

'আমাকে কৃতার্থ করতে।' রাজেন ভেঙচিয়ে উঠলো : 'একবার

চেয়ে দেখ না ভালো করে', তোমার স্ত্রীর চেহারার সঙ্গে কোথাও এর এতটুকু সাদৃশ্য আছে কিনা।'

সনৎ ইতস্তত করে' বললে, 'আমি ভাই ফিজিওগনমিতে এক্সপার্ট নই।'

'কিন্তু গাধার সঙ্গে তো তোমাকে গরুর মিল করতে বলছি না। দেখনা একটু ভালো করে'।'

'তা যদি বলো', দূর থেকে নির্নিমেষে খানিকক্ষণ প্রতুলের দিকে চেয়ে থেকে সনৎ বললে, 'মিল খানিকটা আছে ভাই। চিবুকের দিকটা ঠিক আমার স্ত্রীর মতো।'

'আর আমার এই কপালের দিকটা? এটাও ঠিক তোমার স্ত্রীর মতো নয়?' রাজেন দাঁত খিঁচোল। বললে, 'সমস্ত সংসার তুমি স্ত্রী-ময় দেখছ। নইলে এই বুড়ো বয়সে—'

তাকে বাধা দিয়ে সনৎ বললে, 'কেন, তোমার সন্দেহ করবার কারণ কী?'

'কারণ কী! বিয়ে করতে কেউ কখনো মাথায় পাগড়ি বেঁধে আসে? এটা কি মাড়োয়ারির বিয়ে?'

'সেটা এক্সপ্লেন করে নি?'

'বলেছে, চুল ছাঁটিতে গিয়ে অসমান হয়েছিলো। এটা একটা এক্সপ্লেনেশান?'

'হ'তে পারে মাথায় কেনো কাটা-ফাটার দাগ আছে, সেটা ঢেকে রাখতে চায়।'

'এই না হ'লে বুদ্ধি!' রাজেন খেঁকিয়ে উঠলো: 'দাগ থাকবে তো সে চুল গজাবে, বাবরি রাখবে। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া আবার কী!'

'তা ছাড়া, বিয়ে করতে আসছে, সঙ্গে একটা বরযাত্রী নেই ?'

'এই কথা ! দাঁড়াও, আমি একটু কথা কয়ে দেখি।' বলে' সনৎ আসরের দিকে অগ্রসর হ'লো।

'কে, জামাইবাবু না ?' প্রতুল উৎফুল্ল ব্যস্ততায় দুই হাতে সনতের পায়ের ধুলো মাথায় নিলো।

'আমাকে চিনতে পারলে ?' সনৎ সস্নেহে হাসলো।

'আমাকে আপনি চিনতে পারলেন, আর আমি পারবো না ? বিয়েতে ডাকিনি বলে' কি আপনাদের সবাইকে ভুলে গেছি নাকি ? বড়দি কেমন আছেন ?'

জগদীশ বড়দি বলে'ই ডাকতো তার স্ত্রীকে।

সনৎ প্রতুলের পাশ ঘেঁসে বসলো। ক্রমান্বয়ে তার দীর্ঘ অজ্ঞাত-বাসের কথা, বিপজ্জনক জীবনযাপনের কথা, বর্তমান সম্পদ-প্রতিপত্তির কথা সেরে আস্তে-আস্তে সে ঘরোয়া কথার অবতারণা করলে। কিন্তু মনে রাখতে হ'বে—জগদীশ নিরুদ্দেশ হয়েছিলো ষোলো বছরে পা না দিতেই এবং তার আগের পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে সনতেরো জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তার ব্যক্তিত্ব যাচাই করতে হবে এমন ভাবে সে মোটেই প্রস্তুত হ'য়ে আসে নি, নইলে সে স্ত্রীর কাছ থেকে ছোট-খাটো অথচ অনেক সব সবিশেষ ঘটনার তালিকা নিয়ে আসতো। এতদিন পরে নিরুদ্দেশ ভাই ফিরে এসেছে খবর পেয়ে ব্যাকুল বোন বেচারা তাকে দুই হাতে ঠেলে পাঠিয়েছে তাকে ধরে' নিয়ে আসবার জন্যে। এ যে তার ভাই না-ও হ'তে পারে, এমন অসম্ভব সন্দেহ তাদের কারুরই মনে আসে নি। তবু কথার নিবিড়তার মাঝে সনৎ তাকে দু-একটা প্রশ্ন করলে, যেগুলি নেহাৎই মামুলি ও মোটা। এই যেমন, বাবাকে তার মনে পড়ে কিনা, তাদের চাঁদপুরের সেই বাসা, বড়দির বিয়েতে

তার সেই গলায় মাছের কাঁটা আটকানো এবং সব সে নির্ভুল উত্তর দিলে। সনতের মনে কুয়াসার একটি আঁশও রইলো না। কথোপকথনের তরলতায়, বয়স্থ শালার সঙ্গে যতটা সম্ভব, সে দু'টো-একটা খেলো রসিকতাও করলে।

সনৎ উঠে এলে রাজেন উৎসুক হ'য়ে জিগগেস করলো: 'কী দেখলে?'

'আমার শ্যালক।'

'তোমার মাথা আর মুণ্ডু। চলো, চা খাবে চলো।' রাজেন সনৎকে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গেলো।

প্রতুল ঘড়িতে দেখলো, সাড়ে ন'টা। আর বেশি দেরি নেই।

মধুর সম্বন্ধের একটি ছেলে কোত্থেকে একটা হার্মোনিয়াম নিয়ে এসে অনেকক্ষণ ধরে' প্রতুলকে একটা গান গাইবার জন্যে সাধাসাধি করছিলো, কিন্তু প্রতুল কর্ণপাত করে নি। কিন্তু এবার, এতক্ষণে, তার সত্যি-সত্যি ইচ্ছা করলো, গান গায়। মনেও বেশ স্ফূর্তির হাওয়া দিয়েছে, লগ্নও আসন্ন, আর এতগুলি লোক কখন থেকে খড়কে মুখে দিয়ে বসে' আছে। প্রতুল মধুরসম্পর্কিতকে বললে, 'আনো তোমার হার্মোনিয়াম।'

সবাই ভেবেছিলো বিয়ের আসরে সব বরকেই গান গাইতে বলা হয়, আর কোনো বরই গায় না। আর যদি বা কেউ গায় কালে-ভদ্রে, নেহাৎ পাড়াগাঁ বলে'ই গায়, যেখানে খোলের উপরে বাজনা নেই, হরেকৃষ্ণ-র উপরে গান নেই। বড়লোক গাইবে, মিষ্টি লাগতেও পারে বা।

প্রতুল চাবি টিপলো ও সঙ্গে-সঙ্গেই গলা দিলো ছেড়ে। সে-গলা সচরাচর শোনা যায় না, গ্রামে কেন, মফস্বলের সহরেও নয়। ভোর

রাতে উঠে সাধা গলা, দরাজ, নির্ভাজ। চড়ার দিকে যেমন কাজ, তেমনি নেমে আসার পথে ছোট-ছোট খোঁচ। আর হার্মোনিয়ামের চাবিগুলি নিয়ে সে যেন আঙুলের সার্কাস দেখাচ্ছে। অগায়ক গ্রামের লোক শুনছে বলে' এতটুকু সে কার্পণ্য বা কাতরতা দেখাচ্ছে না, সে গান গাচ্ছে শুধু নিজের উন্মাদনায়, কে শুনছে বা না শুনছে তার খেয়াল নেই। যে যেখানে ছিলো ঘনিয়ে আসতে লাগলো, এমন-কি বাড়ির মেয়েরাও হাতের কাজ ফেলে উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো।

একখানা লুচির সঙ্গে আস্ত একটা কাঁচাগোল্লা মুখে পুরে সনৎ জিগগেস করলে: 'কে গায়?'

এক আঁটি কুশাসন নিয়ে কে-একটা চাকর যাচ্ছিলো এখান দিয়ে হেঁটে, বললে, 'নতুন জামাইবাবু।'

'কে, জগদীশ?' সনৎ ভরামুখে অস্পষ্ট একটা বিস্ময়োক্তি করলে।

'তাই হবে।' রাজেন বাইরে উঁকি মারলো: 'এ-অঞ্চলে এমন গান তো কই শুনিনি।'

'বলো কি, জগদীশ এমন গায়! চলো, শুনি গে।' দাঁতের পাটি দুটো বিকৃতির সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করে' সনৎ কাঁচাগোল্লাটা দ্রুত গলাধঃকরণ করলো, এক ঢোঁকে খানিকটা জল খেয়ে রাজেনকে টানতে-টানতে বললে, 'চলো।'

রাজেন প্রতিবাদ করলো: 'গান শোনবার আমার সময় নেই। যজ্ঞের জন্যে এখন আমাকে ইট জোগাড় করতে যেতে হবে।'

'হবে'খন তোমার ইট।' সনৎ তাকে টেনে নিয়ে গেলো।

তাদেরকে দেখে এবং রাজেনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে' অমিয় বললে, 'আসুন সনৎবাবু।'

সনৎকে দেখে প্রতুল নিঃশব্দে একটু হাসলো এবং গুণী সমজদারের

উপস্থিতি বিবেচনা করে' উদারা থেকে তারা পর্যন্ত গলার সে একটা নিদারুণ কেরামতি দেখালো।

ভিড় ঠেলে সনৎ আর এগিয়ে এলো না, দরজার কাছেই রইলো দাঁড়িয়ে। গান থামলে শুধু বললে, 'আরেকখানা ধরো, বেশ বিফিটিং দি অকেশান।'

এবার প্রতুল ধরলো একটা গজল। আর তবলার অভাবে অমিয় ঠেকা দিতে লাগলো তাকিয়ায়।

গান শেষ হ'বার আগেই সনৎ রাজেনকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। কিছুটা দূর আড়ালে চলে' গিয়ে সনৎ বললে, 'এ জগদীশ নয়।'

'নয় ?' রাজেন তার মর্মমূল পর্য্যন্ত চম্‌কে উঠলো : 'এই দিব্যজ্ঞান হঠাৎ হলো কি করে' ?'

'জগদীশ গান গাইতে পারে না।' শেষের কথাটায় সনৎ অসম্ভব জোর দিলে।

'তার মানে ?'

'তার মানে আমার শ্বশুরবাড়িতে কোনো শালাও গাইতে জানে না। ভাত-খাওয়া আর হাই-তোলা ছাড়া কেউ কোনোদিন হাঁ করে নি।'

'এটা তোমার কোনো কাজের কথাই হ'লো না।' তর্কের কষ্টি-পাথরে যুক্তিটা রাজেন যাচাই করতে চাইলো : 'পরেও তো সে শিখতে পারে।'

'পারে না। ষোলো বছর বয়েস পর্যন্ত যে গানের গা জানতো না, যে-বাড়িতে গানের কথা উঠলে বাড়ির কর্তা সিন্দুক খুলে রাম-দা নিয়ে বেরুতেন, সে-বাড়ির ছেলে এমন ওস্তাদ হয়ে উঠবে, এ অবিশ্বাস্য। শোনো,' রাজেনকে নিয়ে সনৎ আরো কিছুদূর অগ্রসর হ'লো : 'আমার জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে বাবা শ্বশুরমশাইকে জিগগেস করেছিলেন,

তাঁর মেয়ে গাইতে-বাজাতে পারে কিনা, তার উত্তরে শ্বশুরমশাই স্থান-কাল ভুলে সটান বলে' উঠেছিলেন : 'গাইয়ে বাজিয়ে চান, বাজারে ঢের বাইজি পাবেন, আমার মেয়েকে নয়।' এমন বাপের ছেলে জগদীশ !'

'হ'তে পারে সেই রিপ্রেশানের এই প্রতিক্রিয়া।'

'হ'তে পারে না।' সনৎ গলায় আরো দৃঢ়তা আনলো : 'ষোলো বছর পরে হঠাৎ তার এই গানবাজনার দিকে ঝুঁকে পড়াটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আর এ-গান খেয়ালের গান নয়, শুনেই বুঝতে পারছ, এটা দীর্ঘ সাধনায় পাওয়া। আরামের মধ্যে, কর্মহীনতার মধ্যে, একটু বা বিলাসের মধ্যে যে-সাধনা সম্ভব। ষোলো বছরের যে-ছেলে নিরুদ্দেশ হ'য়ে পথে বেরিয়েছে, খাওয়া ও থাকার যার সংস্থান নেই, আজ কুলি কাল ভিখিরি সেজে যাকে খাদ্য জোটাতে হয়েছে—সব খানিক আগে তার নিজের মুখে শুনলুম—বিনে টিকিটে যে ভারত ভ্রমণ করেছে, আজ রেঙ্গুন আর কাল কোয়েটা, সে বসে'-বসে' অনায়াসে দিব্যি এই বাংলা গীতাভ্যাস করলো—এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবো না।'

'কিন্তু তার পরেও তো সে শিখতে পারে, যখন ব্যবসা করে' হাতে তার অনেক টাকা এলো ?'

'সে তো আরো পরে। তখন আরো অসম্ভব। আর পৃথিবীতে এখন ব্যবসাদার তুমি পাবে না যে টাকা না বাজিয়ে হার্মোনিয়াম বাজাতে বসেছে। মোটকথা,' সনৎ তপ্ত, অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'তার রক্তেই এই গানের বীজ নেই। ভাইয়ে বোনে তারা ছ' জন, কিন্তু এরা কেউ সুর করে' কাঁদতে পর্যন্ত পারে নি। এমন পরিবার তুমি পাবে না, যেখানে সবাইকে ফেলে একজন মাত্র গাইতে পেরেছে, আর এমন উঁচু দরের গান।'

'পরিবারের বাইরে, বিদেশে থাকলে পারবে না কেন?'

'বিদেশে থাকলেও, যে-অবস্থায় সে ছিলো, তার পক্ষে গানের এই ঝোঁক হওয়াটাই অহৈতুক। সে তোমাকে আগেই বললুম। জগদীশ যদি গাইতে পারতো, তবে তার ভাই-বোনেদের মধ্যে আর কেউও নিশ্চয় পারতো। আমার দিকটা যেমন শুকনো, আমার স্ত্রীর দিকটাও তেমনি। তাই বিয়ের যুগ্যি বুড়ো মেয়েটা শত চেষ্টা-চরিত্র করে'ও আজ পর্যন্ত এক লাইন ভ্যাবাতে পারলে না।'

রাজেন হেসে বললে, 'তোমার মেয়ে পারে নি বলে' আর কেউ পারবে না এটা ভাবা তোমার বাড়াবাড়ি।'

'তবেই বুঝতে পারছ, আমার দিক থেকে যেমন নয়, তার মা'র দিক থেকেও সে এ-রস গ্রহণ করতে পারে নি। তার মামারা মুগুর ভাঁজতে পারে, কিন্তু সুর ভাঁজে নি জীবনে, আর মামিরা বাইজি হ'বার ভয়ে গান গাওয়া দূরের কথা, গান শুনেছে কিনা সন্দেহ। সেই দৈত্যকুলে এই প্রহ্লাদের আবির্ভাব হ'লো এটা আমি মানতে পারবো না, কিছুতেই না। তর্ক নয়, তর্কে হেরে যেতে পারি', সনৎ প্রায় আস্তিন গুটোলো: 'কিন্তু আমি ওকে ধরবো। তুমি এসো।'

তার ভার আর কেউ নিলো বলে' রাজেন কিছুটা আশ্বস্ত হ'লো বটে, কিন্তু সনতের যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'তে পারলো না। বরঞ্চ নিরাত্মীয় এই বিয়ে করতে আসা ও অহৈতুক মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধা, এ দু'টোই তার প্রধান চক্ষুশূল।

দ্বিতীয় গান শেষ করে' প্রতুল একটা সিগরেট ধরিয়েছে, দরজার কাছে এসে সনৎ ডাকলে: 'জগদীশ, শোনো।'

জামাইবাবু ডাকছেন, জুতোর মধ্যে প্রায় কোঁচাশুদ্ধ পা ঢুকিয়ে কাউকে ঠুকে কাউকে ঠেলে প্রতুল হন্তদন্ত হ'য়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

সনৎ বললে, 'আমার সঙ্গে একটু এসো, দরকার আছে।'

জামাইবাবু তার বিবাহের বরযাত্রী-জনোচিত কোনো অনুপান চান কিনা জানবার কৌতূহলে সে একটু হেসে বললে, 'কোথায় ?'

'কোথাও নয়। এই রাস্তায় একটু বেড়াবো, কতদিন পরে দেখা।'

'কিন্তু—'

'বিয়ের লগ্নের এখনো দেরি আছে। দাও, একটা সিগরেট দাও।' সনৎ তার পকেটের দিকে হাত বাড়ালো।

টিন থেকে সিগরেট খুলে দিয়ে প্রতুল বললে, 'চারদিক যে অন্ধকার।'

'ভয় নেই সঙ্গে আমার টর্চ আছে। পাড়াগাঁয়ে এসেছি, টর্চ আর পিস্তল দুটোই আমার সঙ্গে করে' এনেছি।' বলে' শেষেরটা বার না করে' টর্চটাই সম্প্রতি সনৎ বার করলো। খানিকটা আলো হ'তেই প্রতুল তার মুখের দিকে তাকালো, তার অদ্ভুত লাগলো দেখতে সনৎ ঠোঁটে চেপে সিগরেট এখনো ধরতে শেখেনি।

ব্যাপারটা প্রতুলের ভালো লাগলো না। বিশেষ করে' রাজেন বিশ্বাসও যখন তাদের পিছু আসছে। একবার বললে, 'অমিয়কে ডাকি।'

'তুমি এত কাবুল-কান্দাহার করে' এলে, আর এই সামান্য অন্ধকারকে তোমার ভয়।' সনৎ চলতে লাগলো : 'তারপর সঙ্গে আমরা দু'-দু'টো নামজাদা ডাক্তার। সাপও যদি কামড়ায়, ফার্স্ট এইড থেকে বঞ্চিত হবে না।'

'বিয়ে করলেই লোকে একটু ভীরু হয়, না ?' প্রতুল আলাপটাকে নৈর্ব্যক্তিক করতে চাইলো : 'তখনই তো লোকে লাইফ-ইনসিয়োর করে, রিস্‌ক্ নিতে ভয় পায়।'

'তা, বিয়ে তো এখনো হয় নি। আর ভাই, বিয়ে করলেই তো ফুরিয়ে গেলো : তখন আর পরের মেয়ে রইলো না, নিজেরই বউ হ'য়ে

উঠলো। দর্জির দোকানে জামার ছিট যখন পছন্দ করে' আসি, ভাবি, কী খোলতাইই না জানি হবে, ছেঁটে-কেটে ছিটটা যখন জামা হ'য়ে গায়ে ওঠে, মনে হয়, ধ্যেৎ, ঠকিয়ে দিয়েছে।'

প্রতুল হেসে উঠলো। বললে, 'আবার আপনার গায়ের জামা দেখে অন্য লোকের চোখ টাটায়।'

'তা টাটাক্। তোমার নিজের কথা বলো। রাজপুতনার কোথায় গিয়েছিলে ?'

'যোধপুরে।'

'সেখানে করতে কী ?'

'ধর্মশালা ঝাঁট দিতাম।'

'সেখানেও ধর্মশালা আছে নাকি ?'

'ধর্মশালা কোথায় নেই ?'

এমনি কথা বলতে-বলতে তারা এগোতে লাগলো। অনেকটা এগিয়ে এসে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে পড়ে' হাতের সিগরেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলা-কওয়া নেই সনৎ প্রতুলের বাঁ হাতটা বাঘের থাবা দিয়ে চেপে ধরলো। হঠাৎ তার গলার স্বর অন্তরঙ্গ থেকে এক লাফে উত্তরঙ্গ হ'য়ে উঠলো। বললে, 'বলো, এ-গান তুমি শিখলে কোথায় ?'

প্রথমটা প্রতুল কিছু হদিস পেলো না। শূন্য চোখে চারদিকে একবার চাইলো। ভীত, মূঢ় গলায় বললে, 'কেন, গানটা কি ভালো নয় ?'

'ভালো নয়! ভীষণ ভালো, চমৎকার ভালো, ক্ল্যাসিক্যাল গান। ভালো বলে'ই তো বলছি, এ-গান তোমাকে শেখালে কে, কবে ?' সনৎ আরো জোরে চাপ দিলো।

'শেখাবে কে! ও আমার ইনবর্ণ। ছেলেবেলা থেকেই আমি

গাই। বাবার তানপুরা ছিলো তাই নিয়ে গলা সাধতাম। পরে যখন লাক্ষ্ণৌ ছিলাম, ওস্তাদের কাছে শিখেছি।' প্রতুলের স্বর কেমন আর্দ্র, আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো।

'ওস্তাদ! তোমার বাবার তানপুরা ছিলো, ছেলেবেলা থেকে তুমি গলা সাধতে!' সনৎ সজোরে তার হাত মুচড়ে দিলো, বাজের মতো হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'বলো, তুমি কে?'

'কে আবার! জগদীশ—'

'জগদীশ তো আমার চাকরেরো নাম। বলো শিগগির।'

'আমি গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়ো ছেলে, আমার ছোট ভাইর নাম কালীকৃষ্ণ, তার ছোটটির নাম—'

'রাখো তোমার সব মুখস্ত। বলো, তোমার বাবা তানপুরা ছাড়া আর কী বাজাতেন?'

'তাঁর সেতার ছিলো, এস্রাজ ছিলো।'

'বলো, তাঁর বাড়িতে কখন গানের আসর বসতো?'

'দোলের সময়, সরস্বতীপূজোর সময়। কেন, বড়দির কাছ থেকে শোনেন নি?'

'রাজেন, এ সব জানে, সব জানে।' বলে' সনৎ প্রতুলের মুখের উপর মারলো এক প্রবল ঘুসি। বললে, 'এখনো বলো তুমি কে?'

'একি, ভদ্রলোকের ছেলেকে আপনি মারবেন নাকি?' প্রতুল অন্ধকারের উপর অন্ধকার দেখলো।

'গদাধর ছেড়ে এখন বুঝি শুধু ভদ্রলোকে এসেছ?' এই বলে' রাজেন তার বাঁ হাত ধরলো চেপে। এতক্ষণে রাস্তা পেয়ে তার রাগ একেবারে লেলিহান হ'য়ে উঠলো: 'ষ্টুপিড, স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার, এক নিরীহ ভদ্রলোকের মেয়ের তুমি সর্বনাশ করতে এসেছ?'

এত বিপদেও প্রতুল হাসলো। বললে, 'বিয়ে করা কি মেয়ের সর্বনাশ করা ?'

'একশোবার। যদি সে বিয়ে বেজাত, বেঘরে বিয়ে হয়। তুমি তো অন্যের নাম ভাঁড়িয়ে ঠকাতে এসেছ, জোচ্চোর, স্নুইণ্ড্‌লার!' বলে' রাজেন তার ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে বসলো।

'কিন্তু ঠকিয়ে আমার লাভ কী বলুন।' প্রতুল একটা কাতরোক্তি করলো: 'ভেবে দেখুন, এতে আমার কী সুসারটা হবে, এই বিয়ে করে'। মেয়ে আপনাদের একটা কিন্নরী নয়, আর তার ভেতর দিয়ে রাজত্বও কিছু একটা আমি পাবো না। বরং উলটে আমাকেই এই বিয়ের খরচ জোগাতে হয়েছে।'

'কলিকালে সেইটেই তো আশ্চর্য। গাঁটের পয়সা খরচ করে' ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে কালো মেয়ে বিয়ে করতে আসা।'

'চোখে যাকে ভালো লাগে, তার জন্যে মানুষে আরো অনেক দাম দেয়।' এত দুঃখেও প্রতুল কবিত্ব করতে ছাড়লো না: 'বুঝলাম আমার বেলায় এই দাম পর্যাপ্ত হ'য়ে ওঠে নি। বেশ তো', দু'জনের মুঠির মধ্যে দু'টো হাতই শিথিল করে' দিয়ে সে বললে, 'বেশ তো, আমার আইডেন্টি নিয়ে যখন আপনাদের সন্দেহ হচ্ছে, আর মানুষের বংশপরিচয়টা যখন তার ললাটে লেখা থাকে না, তখন মিছে গোল করে' লাভ নেই। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে' যাই।'

'তাই যাবে, তবে দু' ক্রোশ দূরে থানাটা একটু ঘুরে যেতে হবে কষ্ট করে'।' বলে' রাজেন তাকে সামনের দিকে সজোরে আকর্ষণ করলো। আর সেই সহানুভূতিতে সনৎ।

'তাই যাচ্ছি, হাত ছাড়ুন।' প্রতুল সনতের দিকে ঘাড় ফেরালো: 'এ নিয়ে একদিন আপনাকে অনুতাপ করতে হবে, জামাইবাবু। হাত

ছাড়ুন বলছি। এ কী অন্যায় কথা! সারা রাস্তা আমাকে এমনি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবেন নাকি?'

'তবে তোমার পাগড়িটা খুলে দাও, কোমরে একটা গেরো দিয়ে রাখি।' বলে' একটানে সনৎ তার পাগড়িটা খুলে ফেললো।

'কী, হাত ছাড়বেন না?' প্রতুলের কী যে দুর্মতি হ'লো, গেলো জোর করে' হাত ছিনিয়ে নিতে।

আর যায় কোথা! মুহূর্তে তার জামা গেলো ছিঁড়ে, পাশের একটা দাঁত গেলো আলগা হ'য়ে, নাক ফেটে দরদর করে' রক্ত বেরুলো।

গ্রামান্তরে ক'টা চাষা যাচ্ছিলো, সঙ্গে একটা কালি-পড়া হ্যারিকেন। একজন রাজেন বিশ্বাসকে চিনলো, এগিয়ে এসে জিগগেস করলো: 'কী হয়েছে, ডাক্তারবাবু?'

রাজেন হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'মেয়ে চুরি করে' নিয়ে পালাচ্ছিলো।'

অভিযোগটা এ-অঞ্চলে অপ্রতুল ছিলো না। তাই কেউ উঠলো রেগে, কেউ উঠলো চমকে, আর কেউ বা পেলো মজা। শেষের জন জিগগেস করলে: 'কার মেয়ে?'

'যারই মেয়ে হোক না কেন, শালাকে ধর্ দিকি পাঁজাকোলে করে', বোধহয় বেহুঁস হ'য়ে পড়েছে। সামনেই রামসুন্দরের ছাড়া-বাড়িটা পড়ে' আছে না, সেখানে নিয়ে চল্। আর শোন্', রাজেন দলের একজনকে জিগগেস করলে: 'তোর ঐ বোঁচকাতে ঘটি-বাটি শিশি-বোতল কিছু আছে, চট্ করে' পুকুর থেকে খানিকটা জল নিয়ে আয়। আর তুই একবার ছুটে মুখুজ্জে-বাড়িতে চলে' যা, সেইখানে কর্তাকে গিয়ে বলবি, যে বিয়ে করতে এসেছিলো, সে ধরা পড়ে' গেছে, সে জামাই নয়, অন্য লোক, একটা বাটপাড় বদমাস। সেই সঙ্গে আমার

বাড়ি গিয়ে আমার কম্পাউণ্ডারকে বলবি, ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে যেন এক্ষুনি চলে' আসে।'

তখন থেকেই অমিয়র মনে একটা অস্বস্তি ছিলো, প্রতুলকে অমনি ডেকে নিয়ে যাওয়ার থেকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরলো না দেখে একটা লণ্ঠন নিয়ে সে খুঁজতে বেরুলো। আরো দু-একজনকে পাঠিয়ে দিলো এদিকে-সেদিকে। বিয়ের কথা তিনি ভুলে গেলেন নাকি?

কিন্তু সবাইর আগে অমিয়ই পেলো সন্ধান। বেড়ার ফাঁকে আলো ও ব্যস্ত একটা জনতার আভাসে।

তার চেয়ে পৃথিবীতে আর যা-হোক কিছু সে ভাবতে পারতো— অমিয় মৃত, স্তব্ধ একটা শিলাস্তূপের মতো রইলো দাঁড়িয়ে।

দেখলো বেড়ার গায়ে ঠেসান দিয়ে প্রতুল-দা বসে', সারা শরীর ভিজা, মুহ্যমান। নাকটা ফুলে উঠেছে, নাসা-রন্ধ্রের কাছে কালো-কালো রক্তের ডেলা, ভুরুর উপরে কপালটা ফাটা, চিবুকের কাছটায় খানিকটা মাংস নিয়েছে খুবলে। সিল্কের পাঞ্জাবিটা ছেঁড়া, বোতামের ফিতেটা ঝুলছে আলগা হ'য়ে।

'দেখে যাও তোমার বন্ধুর কীর্তি।' রাজেন অমিয়কে সম্বর্ধনা করলো।

অমিয়র দিকে প্রতুল কী রকম করে' যে চাইলো বলা যায় না।

সনৎ এগিয়ে এসে বললে, 'এখনো বলো তুমি কে?'

'বলছি', প্রতুল শুকনো গলায় ঢোঁক গিললো: 'তার আগে আমাকে কথা দিন, আমার একটা অনুরোধ শুধু রাখবেন।'

'রাখবো। কী অনুরোধ?' সনৎ বললে।

'আমাকে দয়া করে' পুলিসে দেবেন না।' প্রতুল মাথা নামালো।

'আচ্ছা, তবু সত্য কথা তুমি বলো।'

'বলছি।' প্রতুল জলের জন্য এ-দিক ও-দিক চেয়ে আরেকটা ঢোঁক গিললো : 'আমি জগদীশ নই।'

'তবে কে তুই ?' এবার রাজেন উঠলো হুঙ্কার দিয়ে।

'তাতে আমাদের আর কোনো ইনটারেষ্ট নেই।' সনৎ বাধা দিলো ; বললে 'তবে জগদীশের এত কথা তুমি জানলে কোত্থেকে ?'

'ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো রেঙ্গুনে, বছর তিনেক আগে।' প্রতুল বললে।

'এখন সে কোথায় ?'

'সাংহাইয়ে কিম্বা আর কোথায়, আমি জানি না।'

'তবে ওর নাম তুমি ব্যবহার করতে চেয়েছিলে কেন ?'

'নইলে তাকে পাওয়া আমার সম্ভব ছিলো না।'

'তাকে দিয়ে তুমি কী করতে ?'

'কী করতাম জানি না, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে আমি শপথ করে' বলছি', প্রতুলের দুই চোখে কান্না দাঁড়িয়ে গেলো : 'তাকে বিয়ে করতাম, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতাম, তাকে নিয়ে সুখী হতাম।'

'সুখ বার করছি তোমার।' বলে' রাজেন প্রতুলের শিথিল একটা হাত ধরে' সবেগে টান মারলো। মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'চলো, শ্রীঘরে না গেলে তোমার এই সুখের ষোলকলা পূর্ণ হবে না।'

'খবরদার।' দপ করে' অমিয় উঠলো জ্বলে' : 'কথা দিয়েছেন পুলিসে দেবেন না। কথা রাখুন। একজনের সত্য যেমন পেলেন, তেমনি নিজের সত্যও রক্ষা করুন।'

সনৎও পুরোমাত্রায় সায় দিলো। বললে, 'যথেষ্ট হয়েছে। হয়তো বা তারো কিছু বেশি। এর পর আর কেলেঙ্কারি বাড়িয়ে কাজ নেই। আমি, তুমি, ভবানন্দবাবু, তাঁর মেয়ে সব নিয়ে একটা ল্যাজে-গোবরে

কাণ্ড হ'য়ে যাবে। খবরের কাগজের কাটতি বাড়িয়ে কিছু লাভ হ'বে না।'

কম্পাউণ্ডার ওষুধের ব্যাগ নিয়ে এসে হাজির হ'লো। আর তার পশ্চাতে একটা উত্তাল জনসমুদ্র। যারা ছিলো শ্রোতা, এখন তারা দর্শক।

যতদূর সম্ভব রাজেন আর তার কম্পাউণ্ডার তাদের ঠেকিয়ে রাখতে লাগলো, আর সনৎ লাগলো সন্তর্পণে প্রতুলের ক্ষতস্থানগুলি ড্রেস করে' দিতে।

ভুরুর উপর প্ল্যাষ্টার লাগাতে-লাগাতে সনৎ বললে, একটু-বা সমবেদনার স্বরে: 'এখন কী করবেন?'

প্রতুল একবার ঘরের চারদিকে, একবার অমিয়র মুখের দিকে, একবার নিজের জামা-কাপড়ের দিকে তাকালো। বললে, 'আপনারাই জানেন।'

'আমি বলি কি,' সনৎ অমিয়কে লক্ষ্য করে' বললে, 'ওকে আমরা ঘাটে নিয়ে গিয়ে নৌকায় তুলে দিয়ে আসি, উনি চলে' যান। কী, পারবেন যেতে?'

কষ্টে দাঁড়াবার চেষ্টা করে' প্রতুল বললে, 'পারবো। তেমনি আপনি আর অমিয় যদি হাত ধরেন।'

হাত বাড়িয়ে সন্তর্পণে অমিয় তাকে দাঁড় করালো, জামার ঘরে বোতামের ফিতেটা আটকে দিলো একেক করে'।

রাজেনের দিকে ফিরে সনৎ বললে, 'তোমারই জয় হ'লো, রাজেন। তুমি এদেরকে নিয়ে উল্লাস করো, আমি আর অমিয়বাবু এঁকে নৌকোয় তুলে দিয়ে আসি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে সনৎ প্রশ্ন করলো: 'আপনার জিনিস-পত্র?'

প্রতুল বললে, 'ও কিছু নয়। ও থাকবে অমিয়র কাছে। ইচ্ছে হয় আমাকে একদিন পৌঁছে দেবে, না হয় ফেলে দেবে আস্তাকুঁড়ে।'

এ-দিকে লগ্ন আসন্ন, বিয়ের বর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভবানন্দ-বাবুর কাছে পাখা মেলে খবর পৌঁছে গেছে, ও-বর বর নয়, ছদ্মবেশী জুয়াচোর, গর্জনেই বোঝা গেছে গাধার গায়ে সিংহের চামড়া। তারপর অর্ধচন্দ্রের স্বাদ পেতেই বাছাধন সুড়সুড় করে' স্বরূপ খুলে দেখিয়েছেন।

'মিথ্যে কথা।' ভবানন্দবাবু গর্জন করে' উঠলেন: 'সব ঐ রাজেন বিশ্বেসের কারসাজি। বিয়ে একটা কেউ তৈরি করতে পারে না, ভাঙতে ওস্তাদ। স্বীকার করেছে! কী স্বীকার করছে শুনি? নৃশংস মার খেলে নির্দোষীও পরের দোষ নিজের বলে' স্বীকার করে! কী ওদের আস্পর্ধা শুনি আমার জামাইর গায়ে ওরা হাত তোলে! পুলিস! পুলিস কেবল ওদের একচেটে! ওদেরকে আমি পুলিসে দিতে পারি না, যারা আসর থেকে বর তুলে নিয়ে গিয়ে মার দেয়! ওদের কী! দোবোই আমি বিয়ে।' বাড়িময় ঘুরে-ঘুরে ভবানন্দবাবু অস্থির উন্মত্ততা সুরু করলেন: 'এ-লগ্ন চলে' যায়, সাড়ে-তিনটের লগ্নেতে বিয়ে দেবো। নাই বা হ'লো সে গদাধর বাঁড়ুয্যের ছেলে, হলোই বা সে বেজাত-বেঘর, তাতে রাজেনের কী, গদাধর বাঁড়ুয্যের জামাইর কী! জাত বড়ো, ধর্ম বড়ো, পরকাল বড়ো, না আমার মেয়ের সুখ বড়ো! ডাকো সবাইকে, আমি এর হাতেই মেয়ে দেবো। এমন চেহারা, এমন বুদ্ধি, এমন উদারতা! ঠকিয়ে বিয়ে করতে এসেছে! আসুক! ঠকবে কে? আমার মেয়ে না রাজেন বিশ্বেস? তোমরা ডাক ওকে, ধরে' নিয়ে এসো, যে করে' হোক আজ রাত্রেই আমি ওদের দু'হাত এক করে' দেবো। কাল ভোরে আমি আমার মা'র ম্লান মুখখানা দেখতে পারবো না।' ভবানন্দ দুই হাতে মুখ ঢেকে শিশুর কতো কেঁদে উঠলেন।

ঘাটে নৌকো ঠিক করে' দিয়ে সনৎ বললে, 'কেউ আপনার সঙ্গে যাবে ?'

অমিয় ইতস্তত করছিলো তার বিমূঢ় আচ্ছন্নতার মধ্যে ; প্রতুল বললে, 'না, দরকার হবে না। শরীর অনেক সুস্থবোধ করছি। নৌকো বেশ বড়ো আছে, মাঝিরা একটা বালিস দিয়েছে, পাটাতনের উপর দিব্যি শুয়ে যেতে পারবো। ষ্টিমার ঘাটটা আর না ছুঁয়ে সটান গোয়ালন্দ চলে' যাবো ভাবছি, যদি এরা পথিমধ্যে রাজি হয়। কতক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিবে।'

নিজের পকেটটা অনুভব করে' সনৎ বললে, 'সঙ্গে টাকা আছে ?'

প্রতুল একটু-বা হাসলো। বললে, 'আছে। হয়তো একটু বেশিই আছে। সেটা নিরাপদ নয়।' বলে' মনিব্যাগ থেকে একতাড়া নোট বার করে' অমিয়র হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'যদি পারো, এই টাকাটা ভবানন্দবাবুকে দিয়ো। তাঁর অনেক ক্ষতি, অনেক দুঃখ, অনেক মনস্তাপ ঘটালাম। আর' প্রতুল এক মুহূর্ত থামলো, বললে, 'আর, অধিবাসের তত্ত্বে আদ্ধেক জিনিসও দেয়া হয় নি। যা কিছু রইলো, সমস্ত ট্রাঙ্কটাই রেখাকে উপহার দিলাম। না, আর পাগড়ি নয়, এটাকে এখন সিল্কের চাদর করবো। নমস্কার।' প্রতুল নৌকোয় উঠলো ; আবার বললে, 'নমস্কার। বড়দিকে আমার প্রণাম দেবেন।'

উৎসবের বাড়ি কখন অন্ধকারে ডুবে গেছে। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে-কাঁদতে উপবাসী রেখা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো, এক ঘুম পরে গা ঝেড়ে উঠে বসে' ভাবলো, বা, আজ তার বিয়ে না ? সাড়ে তিনটের লগ্নে ? তবে, এ কী ! মা এখনো শুয়ে আছেন কেন ? এ কী, আলো জ্বলছে না, বাজনা বাজছে না, পা টিপে-টিপে দরজা খুলে রেখা বারান্দায় ও বারান্দা থেকে উঠোনে বেরিয়ে এলো, সামিয়ানাটা পর্য্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে ! সব গেলো কোথায় ?

কোথায়, কতদূর সে গেছে? নিশি-পাওয়ার মতো রেখা উঠোনটুকু পেরিয়ে বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়ালো। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ এসেছে আকাশে, তারই মতো চেহারায়, উপোসে শীর্ণ, প্রতীক্ষায় ক্লান্ত; তারি মতো বিনিদ্র বিছানা থেকে উঠে। সমস্ত রাতটাকে কি-রকম যেন অন্যরকম লাগছে, তার প্রথম অচেনা রাত। যেন এইখানেই কোথায় সে লুকিয়ে আছে, তার জন্যে। সে তো বর নয়, চোর। তবু তার সঙ্গেই সে আজ যাবে। তাকে কী করবে সে? খুন করবে? কিসের লোভে? তার গলায় যে এ-নেকলেস এ-ও তারি দেয়া। তবে, তাকে আর-কোথাও বেচে দিয়ে আসবে? কোথায়! রেখা মনে-মনে হাসলো। তার আগে রেখার কাছে নিজেকে সে বেচে দিতো না?

'আমলকি গাছের উপর থেকে একটা প্যাঁচা উঠলো ডেকে, শুকনো পাতায় কি-একটা উঠলো খসখস করে'। রেখা আস্তে-আস্তে তার মায়ের পাশ ঘেঁসে এসে শুয়ে পড়লো।

# অপূর্ণ

কাঁচা মাটির রাস্তার উপর দিয়ে সাড়ে সাত মাইল কঙ্কাল-বার-করা গরুর-গাড়িতে আসতে-আসতে অসীমা ভাবছিলো, কী দৃশ্যই না জানি দেখতে হবে। কিন্তু না, বাড়িটা পাকা, দোতলা : নিচে আপিস, উপরে কোয়ার্টার। পিছনের দিকে উঠোনটুকু ঘিরে রান্নাঘর, পাতকুয়ো, পাইখানা, একটুখানি ক্ষেত করবার মতো মাটি। বাইরেটা একেবারে জঙ্গল, আতঙ্কময় অন্ধকার দিয়ে তৈরি। যে-লোকটা আগে এখানে ছিলো সব তছনছ, একাকার করে রেখে গেছে, ভাঙা হাঁড়ি, মুড়ো ঝাঁটা, ছেঁড়া মাদুর, ঘুঁটের গুঁড়ো—কী নয়! উনুনটা পর্যন্ত আস্ত রাখে নি, শিকগুলি নিয়ে গেছে। কুয়োতলা পর্যন্ত সার-ফেলা ইঁটের চিহ্নই শুধু আছে, ইঁট নেই। আর এই বে-আব্রু কুয়োর পাড়ে সে স্নান করবে কি করে'?

'বাড়িওলাকে শিগগির একটা বাথরুম করে' দিতে বোলো।' অসীমা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে জিগগেস করলে : 'এর জল কেমন?'

কাছেই একটা আপিসের লোক ছিলো, বললে, 'ঘরধোয়া বাসন-মাজার কাজ চলতে পারে।'

'খাবার জল?'

'কাছেই টিউব-ওয়েল আছে। এটার জন্যে গাঁয়ের পেসিডেন্ কম লড়াই করেন নি।'

অসীমা উপরে চলে' এলো। তখনো সন্ধে হবার সময় হয়নি, কিন্তু

গাছ-গাছড়ার অন্তরালে অপরাহ্ণটিকে কেমন যেন ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে। দু'খানা ঘর ও রাস্তার দিকে অনতিপ্রশস্ত একটি বারান্দাতেই সমস্তটা সুসমাপ্ত। অসীমা দেয়ালের দিকে চেয়ে হতাশ হয়ে গেলো: কী সর্বনাশ, কোনো ঘরেই একটাও তাক নেই। তবে কোথায় সে তার বাঁধানো মাসিক-পত্রিকাগুলি সাজিয়ে রাখবে, তার হোমিয়োপ্যাথির বাক্স, তার প্রসাধনের এটা-ওটা! কী ভয়ানক, সিলিঙে একটাও কড়া নেই, লেপের ঝোলাটা সে তবে টাঙাবে কোথায়? আর, আগে যারা ছিলো, তারা কি অন্তত একখানা ক্যালেণ্ডারো রাখতো না ঝুলিয়ে? না, যাবার সময় দেয়ালের পেরেকগুলোও তুলে নিয়ে গেছে?

গ্রাম্য গণনীয়দের সঙ্গে বাক্যালাপ সেরে সুরেশ্বর উপরে এসে বললে, 'প্রথমেই হচ্ছে একপেয়ালা চা!'

'না', অসীমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: 'প্রথমেই হচ্ছে একটা চাকর। জল আনা, বাজারে যাওয়া, ঘর ঝাঁট দেয়া, বিছানা খোলা, এক গাদা কাজ বাকি।'

'সব হচ্ছে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ঠাকুর গেছে জল আনতে, আপিসের একটা লোককে বাজারে পাঠিয়েছি, বিছানাটা খুলে নিজেই দিচ্ছি ঝাঁটা বার করে', তুমি শুধু দয়া করে' শোবার এলেকাটা পরিষ্কার করে' নাও।' ডেক-চেয়ার খুলে সুরেশ্বর পা এলিয়ে দিলো: 'আজ, মনে করো, ধর্মশালায় আছি। কাল সকালে চাপরাশি জয়েন করবে, আর ভাবতে হবে না। ও ছুটি নিয়ে গেলো বলে'ই এত অসুবিধে।'

'আজ রাতে তবে আর রাঁধতে হবে না নাকি?'

'কী দরকার! স্বচ্ছন্দ খাবার আছে টিফিন-কেরিয়ারে, তারপর চা আছে আর তুমি আছ।' স্ত্রীর দিকে চেয়ে সুরেশ্বর বাঁধানো দাঁতে

হাসলো : 'এই একটা অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলা একরাত্রির জন্যেও কি তুমি সইতে পারবে না ?'

'পারবো', অসীমা ততক্ষণে বাক্স-প্যাঁটরা খুলে বসেছে : 'কোথা থেকে যদি একটা লোহা কিম্বা শক্ত দেখে ইঁট নিয়ে আসতে পারো।'

'কী হবে ?'

'কপালে আমার পেরেক ঠুকতে হবে। কপালটা যে আমার দেয়ালের মতো সাদা হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ না ?' অসীমা একে-একে তার প্রসাধনের টুকিটাকিগুলি বার করতে লাগলো : 'আয়নাটা টাঙাতে হবে যে। চুল বাঁধবো।'

সুরেশ্বর একটা বিস্তৃত হাই তুললো : 'দাঁড়াও, রাত হোক।'

'রাতে আমি কখনো আয়নায় মুখ দেখি নাকি ?' অসীমা খেঁকিয়ে উঠলো : 'আর, বিছানাটা খুলে শিগ্‌গির ঝাঁটাগাছটা বার করে' দাও।'

চেয়ারে সুরেশ্বর শরীরটাকে আরো শিথিল করে' ঢেলে দিলো : 'দাঁড়াও, তোমার হাতে এখুনি কিছু অস্ত্র দিতে আমার ভয় করছে।'

কতক্ষণ পরে বাড়িওলা এসে হাজির, বিনয়ে পরনের বস্ত্রখানি থেকে সমস্ত দেহটিই যেন অতিমাত্রায় খর্ব, সঙ্কুচিত। কি-কি অসুবিধে তাই একবার জানতে এসেছে।

সুরেশ্বর আঙুল দিয়ে স্ত্রীকে দেখিয়ে দিলো।

'সব প্রথমেই একটা বাথরুম চাই মশাই, ছাদ-দেয়া ঘেরা জায়গা, সঙ্গে একটা চৌবাচ্চা, পাড়টা বেশ খানিকটা চওড়া রাখবেন। আর, কোনো ঘরেও একটা তাক রাখেন নি কেন, তাক করে' দিতে হবে, মায় দরজা—মানে আলমারির মতো। ভেতর দিক থেকে টানবার জন্যে দরজায় একটাও কড়া লাগানো নেই—আর জানলায় এগুলো ছিটকিনি না আমার মুণ্ডু ? আর লেপের ছালাটা কি শূন্যে ঝোলাবো ? নিজে

কৃপণ হয়েছেন বলে’ জানলাগুলোকেও কি অমনি কঞ্জুস করতে হয়? এ কি জানলা না ঘুলঘুলি? আর শুনুন, উঠোনে ইট পাততে হবে, এক সারি কুয়োর দিকে আরেক সারি পাইখানার দিকে। বর্ষা সামনে, আপনার রান্নাঘর অমনি আলগা একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পাবে না—বৃষ্টির মধ্যে বারে-বারে ছাতা খুলে আর ছাতা মুড়ে কে যাওয়া-আসা করবে শুনি? নিচের বারান্দার সঙ্গে রান্নাঘরটা জয়েন করে’ দেবেন, অন্তত টিনের ছাদ দিয়ে। আর শুনুন, কাল ভোরেই আমার একটা গয়লা চাই, মেথর চাই, আরেকটা চাকর। সঙ্গে আমি শুধু ঠাকুর নিয়ে এসেছি। বেশ একটা জোয়ান মজবুত চাকর আনতে হবে, অনেক ভারি কাজ সংসারে। কত মাইনে এখানকার চাকরের?’ অসীমা একটাল জিনিস্-পত্রের মধ্যে থেকে হাঁপিয়ে উঠলো।

বাড়িওলা সবিনয়ে বললে, ‘সব কি একসঙ্গে পারবো?’

‘না পারবেন তো ভাড়া পাবেন না বলে’ রাখছি।’ অসীমা শরীরে একটা দৃপ্ত ভঙ্গি আনলে: ‘এ মশাই গবর্ণমেণ্ট ভাড়াটে, চালাকি চলবে না। আপনাকে সাত দিনের আলটিমেটাম দিচ্ছি, সমস্ত করে’ দিতে হবে, সমস্ত, যা-যা বললাম। তাও তো এখনো সব দেখি নি।’

কতক্ষণ পরে বাজার এসে হাজির।

লণ্ঠন জ্বালবার জন্যে কেরোসিন তেল আসেনি, তাই অসীমার হাতে একটি টর্চ।

‘স্পিরিট এনেছ?’ লোকটার চোখ ঝলসে দিয়ে অসীমা জিগগেস করলে।

‘সে মা, সরকারি ডিসপেনসারি থেকে আনতে হবে।’

‘তা হোক, আনলে না কেন?’

'বাবু একটা টাকা দিয়েছিলেন, এ-সব কেনাকাটা করে' মোটে এই তিন পয়সা ফিরেছে।'

'তাই বলে' পয়সার জন্যে তুমি ফিরে এলে ?' অসীমা মুখ-চোখের একটা অসম্ভব ভঙ্গি করলে : 'সরকারি ডাক্তারখানা হাকিমের নাম শুনলে একবোতল স্পিরিট তোমাকে বাকি দিতো না ?'

'দিতো না, মা।' লোকটা ভয়ে-ভয়ে বললে।

'তোমাদের এই ভূত পাড়াগাঁয়ে কোনো মুন্সেফ আসে, না, ডিপটি আসে ? এই সাব-রেজিষ্ট্রারই তো এখানকার একমাত্র হাকিম, একচ্ছত্র। মুন্সেফে মুন্সেফ, ডিপটিতে ডিপটি। এজলাসে বসে' বিচারও করতে হয়, সাইকেলে করে' কমিশনেও বেরুতে হয়। মাইনেতে মাইনে, টি-এতে টি-এ। 'যাও', অসীমা গর্জন করে' উঠলো : 'দাঁড়িয়ে আছ কি হাঁ করে' ? দেখি কেমন তোমার সরকারি ডিসপেনসারি এক বোতল স্পিরিট দেয় না ক্রেডিটে। যাও শিগগির। স্পিরিট এলে পরে আমি ষ্টোভ ধরিয়ে চা করবো।'

রাতটা অসীমার প্রায় অনিদ্রায় কাটলো, প্রায় একটা উত্তেজনার মধ্যে। কাল থেকে তার নতুন সংসার পাতা, নতুন সব জ্যামিতিক পরিস্থিতিতে—কোথায় টেবিল, কোথায় খাট, কোথায় আলনা, কোথায় বা ট্রাঙ্ক-স্যুটকেস রাখবার বেঞ্চিটা। গুড্‌স্-এ মাল এখনো এসে পৌঁছয় নি, সে তো একটা পাহাড় ভেঙে পড়বে। গবর্ণমেণ্টের মাল নিয়ে, যাই বলো, ট্রেন আরো আগে আসা উচিত। তারপরে বাজার কোথায়, কোন জিনিসের কী দর, ক' তোলার ওজন, মাছ এখানে সেরে বেচে না গোটা বেচে, কয়লা কি দিয়ে যায় না নিয়ে আসতে হয় ! কখন ডাক আসে, কখন ডাক যায়, পোষ্টাপিস কতদূর, খবরের কাগজ কখন বিলি হয়। ধোপার শ' কত করে', প্যাণ্ট ইস্ত্রি করতে পারে কিনা, রুমাল

আর ব্লাউজ, মোজা আর বালিসের অড়, টাই আর টেবিলের ঢাকনি ফাউ নেয় তো ? মনিহারি দোকান বলতে এরা কী বোঝে, কুঙ্কুম আর সুর্মা পাওয়া যায় কিনা, পাউডার আর স্নো, ফিতে আর ফাংনা। চায়ের পাউণ্ড কত করে' ? পাঁউরুটিতে এরা চিনি মেশায় ? এখানে নিশ্চয়ই জেলখানা নেই, তবে কোথায় সে খাঁটি সর্ষে তেল আর আটা পাবে ? তা ছাড়া এখানকার পাঁড়া-পড়শিরা কী রকম ? গ্রামোফোনকে এখনো কলের গান, টকিকে এখনো বায়োস্কোপ বলে নাকি ? এদেশে কি ঝুমকো এসেছে, আর্মলেট কিম্বা টায়রা ? না, সেই অনন্ত চলছে ? কিন্তু সব চেয়ে দেখ দিকি চাপরাসিটার আক্কেল। সামান্য ক'দিন ইষ্টারের ছুটিতে তার বাড়ি যাবার কী হয়েছিলো, যখন জানে যে তারা আসবে। কাল কে বা জোগাবে তার চায়ের দুধ, কে বা পাঁউরুটি। উনুন চাই, ক'টা দিনের জন্যে তক্তপোস চাই, শিল-নোড়া চাই, স্নানের জন্যে মাটির দু'টো জালা অন্তত দরকার। একবার আসুক ও !

সকালবেলায়ই চাপরাসি এসে হাজির।

'তোমার নাম কি ?' অসীমা জিগগেস করলে।

'খোসালচন্দ্র দাস।'

'এ-ডি-এমকে লিখে তোমার চাকরি নিয়ে নিতে পারি জানো ?' অসীমা রূঢ় একটা ভঙ্গি করলো।

'ছেলেটার অসুখ শুনে বাড়ি গিয়েছিলাম, ভারি শক্ত অসুখ'।'

ততোধিক শক্ত কথা অসীমার মুখে আসছিলো, সামলে নিয়ে জিগগেস করলে : 'কী হয়েছে ?'

'হুপিং কাশ। ' মুখের আর পাতা পড়ছিলো না।'

'বয়েস কতো ?'

'এই মাস আষ্টেক।'

'এখন কেমন আছে ?'

'আর নেই, মা। পশু´ রাতে মাটির তলায় তাকে পুঁতে এসেছি।'

অসীমা ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে রইলো, কিন্তু সে জানে সরকারি কাজে শোকের অবকাশ নেই। সেবার তার বোন যখন মৃত্যুশয্যায়, সে বহু কাকুতি-মিনতি করে'ও ছুটি পায় নি। তার তা মনে আছে।

তাই সে বললে, 'যাও, একটা চাকর নিয়ে এসো।'

'নিয়ে এসেছি, মা।' বলে' খোসাল অন্তরালবর্তী কাকে যেন সামনে আসতে ইসারা করলো।

এমন কাউকে দেখবে অসীমা আশা করতে পারেনি। বছর তেরো-চোদ্দ বছরের অপরিপুষ্ট একটি ছেলে। মুখে ভীত, বিহ্বল একটা ভাব নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

সব-কিছু বলবার আগে অসীমা জিগগেস করলো: 'কী নাম তোর ?'

'দেবেন্দ্র—'

নাম শুনে অসীমা হেসে ফেললো। বললে, 'ঐটুকু ছেলের এত বড়ো নাম। কেন, দেবু, দেবু বলে' ডাকতে পারে না সবাই ?'

'কে ডাকবে! বাপ-মা কেউ নেই', খোসাল বললে, 'ঘরছাড়া হ'য়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।'

'তা, তুই জল আনতে পারবি ?'

দাঁড়াবার ভঙ্গিটা একটু সতেজ করে' দেবেন্দ্র বললে, 'খুব পারবো।'

'বাঁকে করে' ?'

'বাঁক না বইতে পারি, বালতি করে' বারে-বারে নিয়ে আসবো, মা।'

'বুঝলাম, কাকস্নান করতে হবে।' অসীমা আবার জিগগেস করলে, 'বাসন মাজতে জানিস ?'

'দেখিয়ে দিলে কী না পারবো বলো?' সারি-সারি পরিচ্ছন্ন দাঁতে দেবেন্দ্র হাসলো।

'বাজার করতে?'

'বাজার তো এই আপিসের নিচেই বসে, মা। ওপরের বারান্দা থেকে তুমিই দরদস্তুর করে' কেনাকাটা করতে পারবে।'

'মাইনে কতো?'

ডান হাতের আঙুল ক'টা প্রসারিত করে' দেবেন্দ্র বললে, 'পাঁচ টাকা।'

'এত টাকা দিয়ে করবি কী?'

'বাবার সাত কাঠা জমি মহাজনের কাছে বাঁধা আছে, সেটা ছাড়াতে হবে যে।'

'তা তো হবে, কিন্তু সব্বার আগে একটা নাপিত ডাকতে হয়, খোসাল', অসীমা ব্যস্ত হ'য়ে বললে, 'ওর মাথায় এই বাবুই পাখির বাসাটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। আর, টাকা দিচ্ছি, কিছু ওর জন্যে কাপড়জামা কিনে নিয়ে এসো।'

আশ্চর্য, দেবেন্দ্রকেই চাকরিতে নেয়া হ'লো। লাভের মধ্যে হ'লো এই, ভাঁড়ি রাখা হ'লো জল টানবার জন্যে, নিজের হাতে কয়লা ভেঙে ঠাকুরকে হ'লো উনুন ধরাতে, আর এক বেলাতেই দু'-দু'টা চায়ের প্লেট ভেঙে ফেললো বলে' অসীমাকেই বাসনের পাঁজা নিয়ে বসতে হ'লো কুয়োতলায়। তারপর দেবেন্দ্র যখন বাজার করে' আনলো, দেখা গেলো কী অসম্ভব দুর্মূল্যের দেশেই না তারা এসেছে!

'কী করবো, মা', দেবেন্দ্র হাসিমুখে বললে, 'এক-দুইই গুনতে জানি না, তা এত-র থেকে এত বাদ দিলে কত থাকে, কে আমাকে শিখিয়ে দেবে?'

সন্ধের আগে আপিস থেকে ঘরে ফিরে সুরেশ্বর ডাক দিলো : 'দেবেন্দ্র !'

কে একটা ছেলে কাছে এসে দাঁড়াতে সুরেশ্বর বিরক্ত মুখে বললে, 'তুই কে ? দেবেন্দ্রকে চাই—নতুন যে চাকর এসেছে সকালবেলা।'

দেবেন্দ্র সলজ্জ হাসিমুখে বললে, 'আমিই।'

'তুই দেবেন্দ্র ?' সুরেশ্বর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

'মা বলেছে আমাকে দেবু বলে' ডাকতে।'

'বটে ! আর রাজ্যে চাকর ছিলো না বুঝি ?' কাছেই কোথাও অসীমার উপস্থিতি অনুভব করে' সুরেশ্বর বললে, 'কী দেখে তোকে তোর মা'র পছন্দ হলো শুনি ?'

'খোরাকি কম, মাইনে কম, কাজে বিচক্ষণ—'

'কত মাইনে ?'

'ভবিষ্যৎ পাঁচ টাকা, তবে মা বলেছে এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনতে শিখলেই মাইনে ছ' টাকা হ'য়ে যাবে।'

সুরেশ্বর না হেসে পারলো না। চেয়ারে বসে' পা দু'টো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'দেখি কেমন তোর কাজের বাহাদুরি। আমার এই জুতোর ফিতে খুলে দে তো !'

এ আর একটা এমন কী বেশি কথা এমনি একখানা ভাব করে' দেবেন্দ্র সুরেশ্বরের দুই পা কোলের উপরে টেনে নিয়ে মেঝেয় বসে' পড়লো। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর অসহায় মুখে বললে, 'গোড়ালি ধরে' ফস্ করে' টেনে যে-জুতো খোলা যায় সে-জুতো পরো না কেন ?'

সুরেশ্বর হাসতে লাগলো।

কিন্তু হাসি দেখে দেবেন্দ্রের আর সহ্য হ'লো না। একটানে হুক শুদ্ধ ফিতেটা সে ছিঁড়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গেই : 'যা !'

'য়্যা! ছিঁড়ে ফেললি?' জুতোর ডগা দিয়ে সুরেশ্বর তার হাঁটুতে একটা ঠোক্কর মারলো।

'আহা! এতে একেবারে মারবার কী হয়েছে! ভারি তিন পয়সার তো একটা ফিতে, দাও, আমি খুলে দিচ্ছি।' কোত্থেকে অসীমা এলো ছুটে।

'করো কি, করো কি', সুরেশ্বর শশব্যস্তে বললে, 'তুমি খুলবে জুতোর ফিতে!'

'কেন, কোনো দোষ আছে?'

'না, কোনোদিন খোলো নি কিনা—' সুরেশ্বর ভয়ে-ভয়ে বললে।

'অনেক কিছুই তো করি নি এত দিন', স্বামীর পা-টা অসীমা জোর করে' টেনে নিলে: 'বাসন মাজি নি, মশলা পিষি নি, ঘর ঝাঁট দিই নি, মশারিটা টাঙাই নি পর্যন্ত। সব চাকরে করে' দিয়েছে।'

একবার দেবেন্দ্র ও একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সুরেশ্বর বললে, 'তবে এই নিষ্কর্মা বাচ্চা চাকর রেখে কী লাভ হ'লো?'

'ক্ষতিই বা হ'লো কী শুনি?' ফিতের হট্‌কাটা টানতে গিয়ে অসীমা আঁট করে' একটা গিঁটই লাগিয়ে ফেললো, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে' বললে, 'আগে যেখানে ছিলে, চাকরের মাইনে ছিলো সাত টাকা। এখানেও তার চেয়ে তোমার এক আধলা বেশি লাগবে না। দেবুকে দেব পাঁচ টাকা আর বাকি দু'টাকা জলের জন্যে। চুকে গেলো।'

'আর বাকি সমস্ত কাজ তুমি নিজে করবে?' সুরেশ্বর নিজের প্রশ্নটাকেই যেন অবিশ্বাস করছে।

'কেন, খুব একটা দোষের কাজ করবো নাকি? নিজের সংসারে নিজে খাটবো এর চেয়ে বড়ো সুখ আর মেয়েদের কী হ'তে পারে? অন্তত এক্‌সারসাইজ তো হবে! সেদিন খবরের কাগজে পড়লাম, বসে'

থেকে-থেকে মেয়েদেরো আজকাল ডায়াবেটিস হচ্ছে।' বলতে-বলতেই জুতোর ফিতেটা সে সমূলে ছিঁড়ে ফেললো।

উল্লাসে দেবেন্দ্র উঠলো লাফিয়ে: 'কই, মারো দেখি তো এবার মাকে।'

'চুপ কর্, দেবু।' অসীমা ধম্‌কে উঠলো।

কিন্তু স্বরেশ্বর দেখলো তাতে শাসনের চেয়ে স্নেহই বেশি প্রকাশ পাচ্ছে।

শুধু পা দুটো সামনের দিকে আরো ছড়িয়ে সে মুহ্যমানের মতো একবার বললে, 'মধুসূদন!'

যাই বলো, স্বরেশ্বরের একটা ভাবনা ঘুচলো। আর তাকে মুহুর্মুহু ব্যস্ত থাকতে হবে না অসীমাকে ব্যাপৃত রাখতে। বাঙলা ভাষায় এমন পত্রিকা বেরোয় না, ভাঙা কুলো থেকে ডাষ্টবিন পর্যন্ত, যা না অসীমার জন্যে সংগ্রহ করতে হয়, দিন থেকে সপ্তাহে, সপ্তাহ থেকে মাসে। আর বইর যা বিজ্ঞাপন দেখা যায়, যৌনবিজ্ঞান থেকে সুরু করে' ভাওয়াল-মামলার রায়। সব সময়ে তার বই চাই—শুয়ে-শুয়ে যা পড়া যায়—এক ঘুম থেকে আরেক ঘুমের মধ্যবর্তী মরুভূমিতে। তবু তার সময় থাকতো, আল্‌গা ফাঁকা ঢিলে সময়, স্বরেশ্বর ভেবে পেতো না কী দিয়ে তা ভরে' ভুলিয়ে রাখতে পারে। জিনিসের মধ্যে বড়ো জোর একটা গ্রামোফোন আর একটা সেলাইয়ের কল। গ্রামোফোনে তারা সেই এখনো আঙ্গুর-বালাকে নিয়ে আছে, আর সেলাই বলতে কখনো দু'খানা রুমাল আর বছরে ছ'টা সেমিজ। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করা গেলো অসীমার কাজের আর অন্ত নেই। তার একটানা সেই প্রসারিত ভঙ্গিটা এখন নানা ছন্দে এঁকে-বেঁকে ভেঙে-চুরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে। এত কাজ করবার তার শক্তি ও উৎসাহ এলো কোত্থেকে স্বরেশ্বর ভেবে-চিন্তে

কিছু কিনারা করতে পারলো না। তার সংসার যেন হঠাৎ খুব বড়ো হ'য়ে উঠলো, এখান থেকে ওখানে এটা থেকে সেটায় কে যেন তাকে শত-সহস্র হাতে খাটিয়ে বেড়াচ্ছে। চাকরটার এক আঙুলও নাড়তে হচ্ছে না। পান-সাজা থেকে জুতো বুরুশ-করা, ঝুল-ঝাড়া থেকে ঘর-মোছা, কাঁপড়-কাচা থেকে বাসন-মাজা, ভারি আর হালকা, উপরে আর নিচে, সমস্ত কাজই এখন অসীমার নিজের কাজ। এই কাজেই তার ছুটি, তার বিশ্রাম।

'চাকরটা তবে আছে কি করতে?' সুরেশ্বর বিরক্ত হ'য়ে বললে।

'কেন, তোমার বাজেট তো আর ছাড়িয়ে যায় নি। সাত টাকা ছিলো, সাত টাকাই আছে।'

'বেশ তো, ওটাকে না ছাড়াও, আরেকটা রাখো।'

'কী একবারে লাট-সাহেব হয়েছ যে দু'-দুটো চাকর রাখতে হবে।' অসীমা ঝামটা দিয়ে বললে, 'তোমার কোন কাজটা হচ্ছে না শুনি?'

'কিন্তু মাইনে-করা চাকর থাকতে তুমিই বা এত খাটবে কেন?' সুরেশ্বর গলা নামিয়ে আনলো।

'শুয়ে-বসে' থেকে লাভের মধ্যে তো শুধু ভুঁড়ি হচ্ছিলো', কথার স্থূলতায় অসীমা নিজেই হেসে ফেললে: 'এখন খেটে-খুটে চেহারার ঢিলেমিটা কেমন কমে' যাচ্ছে দিন-দিন। কেন, পছন্দ হচ্ছে না?' অসীমা শরীরে একটা তির্যক ভঙ্গি আনলো।

'ছাই! আজকাল ভালো করে' চুলটা পর্যন্ত বাঁধো না। কোথায় বা তোমার সুর্মা, কোথায় বা তোমার আলতা! শুতে যে আস যেন ঘুমুতে আস।'

'আমার অত সময় কোথায়!' অসীমা কার্যান্তরে চলে' গেলো।

নিচু মোড়ার উপর লণ্ঠন রেখে, রাত্রে, মেঝেয় বসে' অসীমা কল

চালিয়ে কী সেলাই করছিলো, সন্ধের পর তাস খেলে বাড়ি ফিরে এসে জামা ছাড়তে-ছাড়তে সুরেশ্বর ডাকলো : 'দেবু।'

নামটাকে হ্রস্ব না করে' আর উপায় ছিলো না।

'কেন?' অসীমা সেলাইয়ের লাইন ভাঙতে-ভাঙতে উদাসীনের মতো বললে।

'এক গ্লাস জল দেবে।'

'বোসো, আমি দিচ্ছি।'

'কেন, ও তবে আছে কী করতে?' সুরেশ্বর মুখিয়ে উঠলো।

'তোমার জল খাওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা। জলের মধ্যে জল যে দেবে তার নাম লেখা থাকবে না।'

অসীমা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনলো।

জল সুরেশ্বর খেলো কি না-খেলো, গ্লাসটা টিপাইয়ের উপর নামিয়ে রেখে বললে, 'শালাকে একবার ডেকে দাও।'

অসীমা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো কঠিন কিছু বলবার জন্যে। গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'নিজের ছেলেকেও তুমি একদিন শালা বলতে পারবে দেখছি।'

'বেশ, তোমার ছেলেকেই ডেকে দাও দয়া করে'।'

'হ্যাঁ, ছেলে, একশোবার ছেলে। পনেরো বচ্ছর আজ বিয়ে হয়েছে, যদি হ'তো এমনি বড়োটিই সে হ'তো। হ'লে তখুনি-তখুনিই হয়', অসীমার গলা কেমন ছলছলিয়ে এলো : 'আর যখন একবার হয় না, হয়ই না।'

'তারা ব্রহ্মময়ী!' সুরেশ্বর পাতা বিছানায় শুয়ে পড়লো।

অসীমা কাছে এসে বললে, 'কেন দেবুকে কী দরকার?'

'গা-হাত-পা-টা একটু টিপে দিতো।

'তা বললেই হয়। আমিই দিচ্ছি টিপে।'

'সেটা টেপা হবে না, বুলুনো হবে।' সুরেশ্বর হাসলো।

'আর দেবু একটা কী গঙ্গার ঘাটের নাপতে এসেছে। পাপড়ির মতো তো তার হাত-পায়ের ছিরি, একখানা বাসন মাজতে দিলে হাত টাটিয়ে ফোস্কা পড়ে। আমারটা যদি বুলুনো হয় তবে ওরটা তো সুড়সুড়ি হবে।'

স্বামীর পদ-সেবার মধ্যে সতীত্বের যতো কবিত্বই থাক, পায়ের উপর অসীমার হাতের স্পর্শ এসে লাগতেই সুরেশ্বর অস্থির হ'য়ে উঠলো। বললে, 'কেন, ও নবাবপুত্তুর তোমার কী করছে ?'

অসীমা সংক্ষেপে বললে, 'পড়ছে।'

'পড়ছে ?' এর চেয়ে মাথায় একটা বাড়ি মারলে সুরেশ্বর বেশি আরাম পেতো।

'হ্যাঁ, দুপুরবেলা পড়া দিয়েছি, এখন ওর তা তৈরি করবার সময়।'

প্রাণ খুলে যে হাসবে অসীমার মুখের চেহারায় সুরেশ্বর তার এতটুকু প্রশ্রয় পেলো না। তাই রুক্ষ গলায় বললে, 'লেখা-পড়া শিখে রেজেস্ট্রি আপিসের দলিল লিখবে নাকি ?'

এ যেন শুধু তার শিক্ষকতাকে অপমান করা। অসীমাও পাল্টা জবাব দিলো: 'কেন, শুধু নাম-দস্তখৎ-করা রেজেস্ট্রি-অপিসের হাকিম হ'তে পারবে না ?'

যাক্, দুপুরবেলাটাও অসীমার পরিপূর্ণ। টিফিন করা বা টিফিনের সময় বাড়ি আসার রেওয়াজ ছিলো না সুরেশ্বরের। কিন্তু এখন মাঝে-মাঝে সে দু'দশ মিনিটের ফাঁক খুঁজে উঠে আসে উপরে। দেখে, মেঝের উপর পাটি পেতে বসে' অসীমা শেলেট-পেন্সিল নিয়ে দেবুকে আঁক শেখাচ্ছে। অসীমার চুলগুলি খোলা, আঁচলটা বহুদূর পর্যন্ত স্খলিত, সমস্ত চেহারায় কেমন একটা মাতৃত্বের তন্ময়তা, আর দেবুর দুই চোখে কৌতূহলের

যেন সীমা নেই, শেলেটের উপর পেন্সিলের ক'টা চিহ্ন যেন তার কাছে আকাশের গায়ে তারার রহস্যের মতো। যেমন নিঃশব্দে আসে তেমনি নিঃশব্দে সুরেশ্বর চলে' যায়। কোনদিন এসে দেখে অসীমা তাকে মুখে-মুখে ভূগোল শেখাচ্ছে—কী আমাদের দেশ, কতো বড়ো, কতো তার জেলা, কত তার নদী, আর কী অপরূপ সে কোলকাতা, রাজধানী! শুধু একটা তালিকা দিচ্ছে না, যেন সব আত্মীয়-স্বজনের কথা বলছে, জল পাথর মাটি সবেতেই যেন কী অসীম মমতা মাখানো। আর দেবুর বিস্ময়ের অন্ত নেই, অহেতুক জিজ্ঞাসার। সুরেশ্বর আপিসে ফিরে গিয়ে অমৃত-বাজারের পৃষ্ঠা ওল্‌টায়।

'আমার জিনের প্যাণ্টালুন দুটো কী করলে?' আপিসে বেরুবার আগে বাক্স ঘাঁটতে-ঘাঁটতে সুরেশ্বর জিগগেস করলে।

'কেন, ও দুটো তুমি পরতে নাকি? ওদের তো পায়ের তলা দিয়ে সুতোর শুঁড় বেরিয়েছিলো।'

'কাঁচি দিয়ে কেটে নিলেই পরা যেতো—অন্তত দু' ছুট করে।'

'কাঁচিই চালিয়েছি বটে, তবে হাঁটুর কাছাকাছি।' অসীমা হাসলো।

'কেটে ফেলেছ নাকি? কেন?'

'দেবুকে হাফ-প্যাণ্ট করে' দিয়েছি।'

'এই না সেদিন কাপড় কিনে দিলে?'

'দেখলাম হাফ-প্যাণ্ট পরলেই বেশি স্মার্ট দেখায়।'

শুধু স্মার্ট, কয়েক মাসের মধ্যেই দস্তুরমতো সে বাবু হ'য়ে উঠেছে। আগে আট আনার রবারের জুতো ছিলো, মাঝখানে চোদ্দ আনার কেড্‌স্‌, এখন একেবারে আড়াই টাকার নিউ-কাট য়্যাল্‌বার্ট। ঘাড়ের থেকে মাথার আধখানা পর্যন্ত জায়গায় চিমটি দিয়েও তার চুল টানা যাবে না। ধোপার হিসেবের খাতায় সে একটা বেশ স্থায়ী জায়গা করে' নিয়েছে।

কখনো যদি বা ধুতি পরে, কোঁচাটা আর তার সঙ্ক্ষিপ্ত, সঙ্কুচিত থাকে না, ধুলো ঝেড়ে লুটিয়ে চলে। বুক-পকেটের ভিতর থেকে রুমাল উঁকি মারে, যেখানে এসে দাঁড়ায় হাওয়াটা হঠাৎ এসেন্সের গন্ধে ঘুলিয়ে ওঠে। অসীমার সাড়িতে রান্নাঘরের ধোঁয়ার আর ভাঁড়ার ঘরের মশলার গন্ধ থাকে লেগে, কিন্তু তার প্রসাধনের মাসিক ফিরিস্তিটার ছাঁট হয় না। সেদিন ভি-পিতে একটা টাইম-পিস ছাড়িয়ে নিতে হ'লো। খোঁজ করে' দেখা গেলো, পুরোনো ঘড়িটা নিচে দেবুর শোবার ঘরে শিয়রের কুলুঙ্গিটার শোভাবর্দ্ধন করছে। য়্যালার্ম দেয়া না থাকলে ছেলের ঘুম ভাঙে না।

একদিন দেবু এসে বললে, 'নিচে, ও ঘরে আমি শুতে পারবো না, মা।'

অসীমার বুকটা ধক করে উঠলো: 'কেন?'

'কাল রাতে ঘুমের মধ্যে ঠাকুর আমার গা থেকে কম্বলটা টেনে নিয়েছে, মা। সারা রাত আমি শীতে হি-হি করে' কেঁপেছি।'

'কেন, ওর কাঁথা নেই?' অসীমা জ্বলে' উঠলো।

'বলে, ত্যানার কাঁথাতে শীত মানে না, তাই খালি-খালি আমারটা ধরে' টানাটানি করবে।' অভিমানে কি অপমানে দেবু ঠোঁট ফোলালো: 'তারপর এক তক্তপোসে ওর সঙ্গে শোয়া আমার পোষাবে না, মা। খালি লাথি মারে, মশারি থেকে বাইরে ঠেলে-ঠেলে দেয়—মশার কামড়ে সারা রাত আমি ঘুমুতে পারি না।'

'এত'দূর!' অসীমা রাগে একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।

'বলে কিনা, তুই তো চাকর, নিচে নেমে শো না, লক্ষ্মীছাড়া, আমার এইটুকু তক্তপোসে তুই ভাগ বসাতে এসেছিস কেন?'

সত্যিই তো, এ-কথাটা তো অসীমার মনে হয়নি এতদিন। আজ দেখলো, কত বড়ো একটাই না সে অসামঞ্জস্য করে' বসেছে। ঐখানে

শুয়েই কি ওকে মানায়, একপাশে যেখানে কয়লা আর ঘুঁটে টাল করা, মাকড়সার জাল আর পোড়া বিড়ি—সেই একটা নোংরা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায়? রাজ্যের চাকরবাকর যেখানে এসে আড্ডা দেয়, বিড়ি ফোঁকে, জুয়ো খেলে, মুখ-খারাপ করে। সেই আবহাওয়াটা কি ওর চরিত্রের অনুকূল হবে, কোথাকার কে একটা খোট্টাই বামুনের সাহচর্য? এ যেন সহর থেকে পান কিনে খাবার প্রমাণ দেবার জন্যে নতুন জামায় পিক্ ফেলে গ্রামে ফিরে যাওয়া। নইলে এত তার সাজগোজ করিয়ে, ছ'আনা চোদ্দ আনা চুল ছাঁটিয়ে, ঘড়িতে এলার্ম বাজিয়ে অসীমা আবার তাকে চাকরের ঘরেই শুতে পাঠায় কেন? এতে কি তার নিজের সম্মানই ষোল আনা বজায় থাকছে? এ যেন রাজা হ'য়েও কুকুরের জুতো-চিবোনো। ছি ছি, এত দিন এই সামান্য কথাটাই তার মনে হয় নি।

হাতের যেখানে-যেখানে লালচে-মতন গোটা দেখাচ্ছে সেখানে-সেখানে হাত বুলিয়ে অসীমা বললে, 'দেখেছ! আচ্ছা, আজ থেকে তোমার আর ও-ঘরে শুতে হবে না। ওপরে শোবে, আমাদের পাশের ঘরে।'

পাশের ঘরটা সুরেশ্বরের বসবার, এক কোণে একটা টেবিল পাতা। বিস্তর খালি পড়ে আছে মাঝখানটায়, ও-পাশে আলনা, ব্র্যাকেট, বাক্স রাখবার বেঞ্চি, দেরাজ, বইয়ের আলমারিটার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়েও। দিব্যি আরেকখানা তক্তপোস পড়বে, জিনিসের মধ্যে তো টিনের একটা ওর সুটকেস, ঘড়িটা, ফুলতোলা একখানা আয়না, আর এটা-ওটা বইবার জন্যে বেতের একটা বাক্স বা যাদুঘর। দড়িতে আর ওর জামা-কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে হবে না, ব্র্যাকেট আছে, আসন-পিঁড়ি হ'য়ে পড়া করতে হবে না, টেবিল-চেয়ার আছে। বরং আরেক প্রস্ত করে' কাগজ-কলমের, হ্যারিকেন লণ্ঠনের, মশার ধূপের তার বন্দোবস্ত করতে হবে না।

লাগবার মধ্যে লাগবে শুধু একটা মাপসই তক্তপোস, নতুন একসেট বিছানা, একটা মশারি। তা লাগুক। সংসারে টাকা বড়ো, না সম্মান বড়ো? দেবু তাই তার পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে উপরে উঠে এলো।

তাকে যেন কে হঠাৎ ছালার মধ্যে পুরে মুখটা সেলাই করে' দিচ্ছে সুরেশ্বর মুখের তেমনি একটা ভয়াবহ চেহারা করলে। বললে, 'একেবারে ওপরে টেনে নিয়ে এলে দেখছি।'

'না একা-একা নিচের ঘরে শুয়ে ভয়ে ও মরে' যাক!'

'কেন, ঠাকুর কী করলো?'

'ও সব সময়ে থাকে নাকি বাড়িতে? রাত-বিরেতে কোথায় আড্ডা দিতে যায় কিছু ঠিক আছে?' অসীমা দৃষ্টিটাকে কুটিল করে' তুললো: 'আর বলিহারি তোমার কাণ্ডজ্ঞানকে। খইনি টেপে আর ফিচ-ফিচ করে' থুথু ফেলে, অমনি একটা খোট্টাই মার্কণ্ডেয়র সঙ্গে ও ঘুরে বেড়াক! এই বুদ্ধি না হ'লে কি আর সাব্‌রেজিষ্ট্রার হয়েছ?'

'কিন্তু আমি ভাবছি, জাজিম না হ'লে কি শুধু তক্তপোসে শ্রীমান ঘুমুতে পারবে?' সুরেশ্বর কথাটাকে নির্লজ্জের মতো বাঁকা করলো: 'আমি বলি কি, আমাকে ও-ঘরে চালান দিয়ে তোমরা দু'জনে খাটে এসে শোঁও।'

ইঙ্গিতটা অসীমা গায়ে মাখলো না। বললে, 'ঈশ্বর না করুক, যদি ওর কোন অসুখ-বিসুখ হয়, তবে সেই বন্দোবস্তই করতে হবে।'

সুরেশ্বর চুপ করে' গেলো। কেননা অসীমা যে কোন একটা-কিছু নিয়ে ব্যাপৃত, তন্ময়, পরিপূর্ণ থাকতে পারছে, সংসারে সেইটেই তার প্রকাণ্ড লাভ। কেননা, এত দেবার পরেও অসীমা যখন মুখোমুখি তাকে জিগগেস করে: 'আমাকে তুমি কী দিয়েছ?' তখন সত্যিই সুরেশ্বর

কোনো জবাব দিতে পারে না। আজ ঈশ্বর তার হাতে খেলনা এনে দিয়েছেন, তাকে নেড়ে-চেড়েই যদি তার তৃপ্তি হয়তো হোক।

দেবু এবার তাই উপরেও নির্বাধ জায়গা পেয়েছে। সেই আজকাল ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলায়, মাস ফুরুলে পাতা ছেঁড়ে, ঘড়িতে চাবি দেয়, য়্যালার্মের কাঁটা ঠিক করে' রাখে, ডিস্ক্ ঘোরায় গ্রামোফোনের, তার রুচি দিয়ে অসীমার রুচিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সকালবেলায় দু'এক ঘণ্টার জন্যে যা সুরেশ্বর তার বসবার টেবিলে জায়গা পায়, বাকি সময়টা তার উপরে দেবুর দুর্দান্ত কর্তৃত্ব। সেই বিশৃঙ্খলাটাকে সন্ধের আগে অসীমা কেমন সমাদরে গুছিয়ে রাখে, যেন সে একটা উদ্বেল ভাবাবেগকে কোমল একটি কবিতাতে সংযত, সুসম্বদ্ধ করে' আনছে।

কিন্তু সেদিনের কাণ্ড দেখে সুরেশ্বরের পক্ষেও মাত্রা বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে উঠলো। তখন ঘোরতর বর্ষা, আর মফস্বলের বর্ষা, যে-বর্ষার কোনোকালে কখনো শেষ হবে বলে' মনে হয় না। তেমনি এক সন্ধ্যাশেষে বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে প্রথমে পা দিতেই সুরেশ্বর ভয়ে আর রাগে কতক্ষণের জন্যে মূঢ় হ'য়ে রইলো।

দরজা-জানলাগুলো খোলা, বৃষ্টির ছাঁট আসছে। টেবিলে তার টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু উচ্চ শিখার দৌরাত্ম্যে চিমনি ও তার ঘেরাটোপটা দুইই ফেটে চৌচির। শিখাটা লকলকে জিভ মেলে চারপাশে আহুতি খুঁজছে। কাগজ-পত্র কি কোথায় ছত্রখান হ'য়ে ছিটিয়ে পড়ছে তার হিসেব নেই। কিন্তু আর ক' মিনিট পরেই একটা অগ্নিকাণ্ডের সমারোহ হ'তো, যদি না এ সময় সে এসে পড়তো আকস্মিক। অথচ এরি মধ্যেই দিব্যি ঠাণ্ডা পেয়ে দেবুচন্দ্র টেবিলের উপর হাত রেখে তাতে মাথা গুঁজে আরামে ঘুম যাচ্ছেন।

সমস্ত শরীরে তেমনিই বুঝি আগুন জলে' উঠলো সুরেশ্বরের। ডান

হাতে দেবুর কান আমূল আকর্ষণ করে' সে বললে, 'আলো কতখানি চড়া হলে, ব্যাটাচ্ছেলে, তোমার পড়া হয় ?'

চোখ চেয়েই দেবুর চক্ষু স্থির।

কিন্তু তার চেয়েও স্তম্ভিত হয়েছে সে এই তার অসম্ভব অপমানে। সুরেশ্বর কী বলছে যেন সে ঠিক কান দিতে পাচ্ছে না।

বাঁ হাতে ল্যাম্পের পলতেটা ডুবিয়ে দিয়ে কানটা তীব্রতর মুচড়িয়ে দিয়ে সুরেশ্বর বললে, 'তুমি কি এখন রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে এসে পৌঁচেছ, হতচ্ছাড়া ?'

আলো নিবতে এতক্ষণে দেবুর যেন হুঁস হ'লো। তেজ দেখিয়ে বললে, 'কান ছাড়ো বলছি।'

'কান ছাড়বো, কিন্তু হারামজাদা চাকর, তোর শরীরে আর জায়গা নেই ?' বলে' সুরেশ্বর ধাঁ করে' তার গালে এক দীর্ঘ চড় বসালো।

দেবু খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালো। চোখ পাকিয়ে বললে, 'মারো যে ভালো হবে না বলছি।'

'কী ভালো হবে না রে পাজি ? মুখ একেবারে ভেঙে দেবো।' সুরেশ্বর হাতের টর্চটা উঁচিয়ে এলো।

'মারো দেখি তো তোমার কেমন বুকের পাটা।'

সত্যি-সত্যিই সুরেশ্বর মারলো, চড়ের পরে চড়। বললে, 'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি ছেড়ে।'

অসীমা কোথায় বাইরে গিয়েছিলো, পাগলের মতো ছুটে এলো লণ্ঠন নিয়ে।

'কী হয়েছে ?'

'ব্যাটাচ্ছেলে ল্যাম্প জ্বেলে ডোম-চিমনি সমস্ত ভেঙে দিয়েছে, আরেকটু হ'লে আগুন লেগে যেতো বাড়িতে। আগুন জ্বালিয়ে তিনি ঘুম যাচ্ছেন।'

‘মিথ্যে বলো না বলছি, মুখ খসে’ যাবে।’ দেবু রুখে উঠলো।

‘ছাখ্ না কার মুখ খসে।’ বলে’ স্থরেশ্বর আবার তার মুখে একটা চড় মারলো।

স্বামীর এমন বিজাতীয় রাগ অসীমা দেখে নি। আর কী আশ্চর্য, এই ছেলেটা সামান্য আর্তনাদও করছে না।

‘আমি ভেঙেছি নাকি? হাওয়ায় ভেঙেছে।’

‘এই না হ’লে বিদ্বান চাকর! আমি মারছি নাকি, আমার হাত মারছে। কিন্তু হারামজাদা, এই আলো তোমাকে জ্বালতে বলেছিলো কে?’ স্থরেশ্বর মুখ খিঁচিয়ে উঠলো: ‘এখানে পাওয়া যায় না এই চিমনি, আমি কত কষ্টে পোষ্টমাষ্টারবাবুকে দিয়ে সদর থেকে আনিয়েছি। দে আমার এই চিমনি আর ডোমের দাম।’

‘আমার মাইনে থেকে কেটে নাও গে।’

‘মাইনে!’ স্থরেশ্বর ফের মারবার জন্যে উদ্যত হয়েছিলো, কিন্তু অসীমার সামনে সাহস পেলো না।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, তেমনি চুক্তি করে’ই রাখা হয়েছিলো। যা কাটবে কাটো, বাকি টাকা যা আমার এতদিনে পাওনা হয়েছে চুকিয়ে দাও।’

‘[illegible]রে’ নে গে যা। দেবো না। বেইমান, নেমকহারাম কোথাকার!’

‘আর মাস-মাস মাইনে দেবে বলে’ চাকর রেখে যে মাইনে না দেয়, তাকে লোকে কী বলে? বলে ভদ্রলোক, বলে হাকিম, না?’

দেবু অসীমার দিকে ফিরেও চাইলো না, বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

অনেক রাতে ঘুমের মধ্যেই স্থরেশ্বর অনুভব করে’ দেখলো পাশে অসীমা শুয়ে নেই। কোথায় গেল সে হঠাৎ, কখন? এই তো তখন

খেয়ে-দেয়ে আলো নিবিয়ে পাশে এসে সে শুলো, দিব্যি মশারি ফেলে ধারগুলি টান করে' গুঁজে দিয়ে। কথা অবিশ্যি সে একটাও বলেনি, এবং সুরেশ্বরের থেকে ব্যবধানটা সে কিঞ্চিদধিক বিস্তৃত করে'ই রেখেছিলো।

সুরেশ্বর জানতো আকাশের স্তম্ভিত ভাবটা যেমন ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ, তেমনি এই অভিমানটা আসন্ন মিলনোল্লাসেরই সূচীপত্র। তাই সে রাতটাকে গম্ভীর হ'তে দেবার জন্যে অপেক্ষা করছিলো, কিন্তু অসীমা যে বিছানা ছেড়ে ঘর ছেড়ে চলে' যাবে তা সে ঘূণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে নি। কিন্তু কোথায় সে সত্যি গেলো? সুরেশ্বর পা টিপে-টিপে, যেন কি-একটা আশাতীত দেখবার আশায়, পাশের ঘরে উঁকি দিলো। না, দেবুর বিছানাটা খালি, কেউ সেখানে নেই, সমস্ত ঘরে সেই রাশীভূত বিশৃঙ্খলা। টর্চটা হাতে নিয়ে বারান্দা ও ছাদটা সে ঘুরে এলো, কোথায় অসীমা যেতে পারে! তারপর নামলো নিচে, নিঃশব্দে। দেখলো রান্নাঘরে নিম্নশিখায় আলো জ্বলছে। টিনের বেড়ার গোলাকার একটা গর্তে সে চোখ রাখলো। দেখলো পিঁড়িতে বসে' দেবু গোগ্রাসে ভাত গিলছে, আর অসীমা, কালো চওড়া কস্তা-পাড় সাড়ি পরনে, পাশে বসে' একদৃষ্টে তার খাওয়া দেখছে।

সুরেশ্বর শুনলো অসীমা বলছে: 'কাল সকালে উঠেই পা জড়িয়ে ধরে' ওঁর ক্ষমা চাইবি। লজ্জা কিসের? বলবি, আর অমন করবো না।'

দেবু জল খাচ্ছিলো, আধ পথে থেকে ঢোঁক গিলে বললে, 'ও আমি পারবো না, মা।'

'সে কী কথা, তিনি গুরুজন, তাঁর মুখে-মুখে কি কথা কইতে আছে?'

'কে গুরুজন? তুমি যদি সামনে অমনি না দাঁড়াতে, মা, আমি ঠিক ওর মাথা সই করে' পেপার-ওয়েটটা ছুঁড়ে মারতাম।'

অসীমা শিউরে উঠলো : 'দূর ডাকাত-ছেলে। সে কথা মনেও করতে নেই। আচ্ছা, আমি তোর গুরুজন তো ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়, একশোবার। তুমি আমার মা।'

'তেমনি তিনি তোর বাবা।'

'ঐ বুড়ো ?'

'কেন, আমিও তো বুড়ি হয়েছি।'

'তুমি বুড়ি ! কে বলে ?' দেবু তার হাতের গ্লাসটা শক্ত করে চেপে ধরলো : 'বাবা, না হাতি ! ও তো তোমার বাবার বয়সী, গোঁফে কলপ দেয়, বাজারের দাঁত পরে, বৃষ্টি হ'লেই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে' হাঁচে।'

অগোচরে অসীমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো কিনা বোঝা গেলো না ; শুধু বললে, 'আমি যেমন তোর গুরুজন হই, তেমনি তিনি আবার আমার গুরুজন হন। একটা কথা তুই আমার রাখতে পারবি না, দেবু ?'

'তুমি বললে নিশ্চয়ই পারবো।' চিবোতে-চিবোতে দেবু হাসিমুখে বললে, 'কিন্তু তোমার গুরুজনকে বলে' দিয়ো মা, আমার গুরুজনকে যেন তিনি না কখনো বুড়ি বলেন। তবে তার তোবড়ানো গাল আরো তুবড়ে যাবে।'

ধর্না' ক্ষমা চাইবার কোন প্রয়োজন ছিলো না, যেমন অপ্রতিবাদে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে গেলো তেমনি অপ্রতিবাদেই দেবু সংসারে তার সাবেক জায়গা খুঁজে পেলো। বোধকরি বা আগের চেয়েও বেশি। কেননা কখনো-কখনো অসীমার হাত জোড়া থাকলে চাবি দিয়ে বাক্স খুলে দেবুই আজকাল পয়সা বার করে' দিচ্ছে।

পুজোর সময়টায় এ-অঞ্চলের যুবক জমিদার তার নবপরিণীতা গৃহিণীকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে এসেছেন। জমিদারের না-হয় সেলাম আর সালামি আছে, দুই অর্থে শিকার আছে, প্রজা-ঠ্যাঙানো আর নায়েব-

শাসানো আছে, কিন্তু গৃহিণী তাঁর ঐশ্বর্যটা কিসে ও কোথায় উদ্‌ঘাটিত করেন? একমাত্র সাব-রেজিষ্ট্রারের বাড়িতেই তিনি আসতে পারেন, যার কারখানায় তাঁদের পাট্টা আর কবুলতি হচ্ছে, একরার আর এওয়াজনামা, কবালা আর জায়স্বুদি।

তাই তিনি একদিন এলেন, দুপুরবেলা, গয়নায় গম-গম করতে-করতে। অসীমা তাঁকে কোথায় বসাবে ভেবে পেলো না। প্রথমেই নিয়ে এলো তাঁকে বসবার ঘরে। বললে, 'আপনি এসেছেন শুনেছি। কিছুদিন আছেন নাকি এখানে?'

জমিদার-গৃহিণী নাসিকাগ্রকে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করলেন: 'পাগল! এ তো আর চাকরি করে' উদরান্ন সংস্থান করতে হচ্ছে না। সপ্তাহখানেক পরেই পালাবো। যেখানে ইলেকট্রিক নেই, ভদ্রলোক সেখানে টিকতে পারে? আর যেখানে ইলেকট্রিক নেই, সেখানে রইলো কী? না রইলো রেডিয়ো, না রইলো টকি। রাতে উঠে এককাপ চা খেতে ইচ্ছে করলেই গরম জল করতে ভোর হ'য়ে যাবে। তা আপনার বাড়িখানা মন্দ নয়। ঐ বুঝি আপনার বড়ো ছেলে?'

ঘরের কোণে টেবিল-চেয়ারে বসে' দেবু পড়ছিলো। হাঁ কিম্বা না কিছু না বলে' অসীমা বললে, 'প্রণাম করো, দেবু।'

দেবু উঠে এসে প্রণাম করলো। জমিদার-গৃহিণী গদ্গদ হ'য়ে বললেন, 'বাঃ, ভারি সুন্দর ছেলেটি তো! কী নাম তোমার?'

'দেবব্রত।' দেবু বললে।

'আর হয় নি কিছু?' জমিদার-গৃহিণী অসীমার দিকে তাকালো।

'না।' অসীমা স্বচ্ছন্দে বললে। জিগগেস করলে: 'আপনার?'

'এখনো সময় হয় নি।' জমিদার-গৃহিণী হাসলেন।

'বিয়ে হয়েছে কদ্দিন?'

'এই পাঁচ বছর।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অসীমা বললে, 'এখনো তবে সময় যায়নি।'

'সময় যায় নি নয়, সময় হয় নি।' জমিদার-গৃহিণী কি-রকম যেন একটা গূঢ় ইসারা করলেন: 'আপনি বুঝি মিসেস্ স্যাঙ্গারের নাম শোনেন নি কখনো? ফোঁপরা হ'লে নারকোলে কি বেশি শাঁস থাকে? দাঁড়ান না, ক'টা দিন একটু হিল্লি-দিল্লি করে' নি।' জমিদার-গৃহিণী দেবুর টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন: 'তুমি কি পড়, দেবব্রত?'

দেবু প্রায় গর্বিত বিজয়ীর মতো বললে, 'এই ফার্স্ট-বুক সবে শেষ করেছি।'

জমিদার-গৃহিণী হয়তো কিছুটা থম্‌কে গেলেন, কিন্তু অসীমা ব্যাপারটা বেশ বিশদ করে' দিলো: 'ছেলেবেলা থেকেই ওর অসুখ, একরকম বিছানাতেই শোয়া। এই বছর আড়াই ধরে' ও খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পেরেছে। পড়াশুনোয় তাই মোটেই এগুতে পারে নি।'

'কিন্তু কী হবে গুচ্ছের পড়াশুনো করে'? কী সুন্দর ওর চোখ, দুষ্টুমিতে টলটল করছে। বড়ো হ'লে প্রকাণ্ড একটা লেডি-কিলার হ'বে দেখছি। বুঝলেন, পড়ুয়া ছেলের চাইতে দেশে আজকাল বেশি বয়াটে ছেলের দরকার।' জমিদার-গৃহিণী এগিয়ে গেলেন: 'আর ঐ বুঝি আপনাদের বেড-রুম?'

কক্ষান্তরে চলে' এসে বললেন, 'বাঃ, একটা গ্রামোফোন আছে দেখছি। এনায়েৎ খাঁর সেতার আছে? মাণিকমালার নাচ?' জমিদার-গৃহিণী বাক্স খুলে রেকর্ডের ল্যাবেল দেখতে লাগলেন।

সেই ফাঁকে একটু বা লুকিয়ে হাত-বাক্স খুলে অসীমা পয়সা বার করতে বসলো।

জমিদার-গৃহিণী চালাক মেয়ে, তা টের পেলেন। বললেন, 'আপনাকে

সাবধান করে' দি, গ্রামের এই পচা খাবার কিনে আনবেন না। টাইফয়েড আর স্মল-পক্সে গিজগিজ করছে।'

তততোধিক চালাক মেয়ে অসীমা। হাসিমুখে বললে, 'কিন্তু যদি বলি, আপনাকে এক পেয়ালা চা করে' দেবো ততটুকু চিনিও আজ ঘরে নেই, তা হলে আপনি কী বলবেন?'

বলে' পয়সা নিয়ে পাশের ঘরে সে দেবুর কাছে এসে উপস্থিত হ'লো। গলা খাটো করে' বললে, 'একদৌড়ে বসন্তর দোকান থেকে টাটকা দেখে কিছু খাবার নিয়ে আয় চট করে'।'

দেবু গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'আমি এখন পড়ছি।'

অসীমা বললে, 'কতক্ষণ আর লাগবে। জমিদারের বৌ এসেছে, একটু মিষ্টি মুখ করে' না দিলে কি ভালো দেখায়?'

ততোধিক গম্ভীর হ'য়ে দেবু বললে, 'চাকরকে গিয়ে বলো।'

অসীমা একটা ঢোঁক গিললো। বললে, 'দুপুরবেলা সে থাকে নাকি বাড়িতে? কোথায় আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেছে।'

'না থাকে তো, চাকরটাকে ছাড়িয়ে দেয়া উচিত।'

দেবু বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়লো: 'পড়ার সময় আমাকে এখন বিরক্ত করো না।'

অসীমা এগিয়ে এসে দেবুর চুলে-পিঠে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, 'বাড়িতে চাকর না থাকলে বুঝি ঘরের ছেলে কখনো বাজার করে' আনে না? যারা গরিব, যাদের চাকর রাখবার মুরোদ নেই, তাদের ছেলেরাই তো বাজার করে।'

দেবু অসীমার মুখের দিকে মুগ্ধের মতো চাইলো, এক মুহূর্ত। হাত পেতে বললে, 'দাও।'

এবং মুঠোর মধ্যে পয়সা পেয়েই সে বসন্তর দোকানের দিকে

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলো। জুতো দূরের কথা, গেঞ্জিটা পর্যন্ত সে গায়ে দিলো না।

তারপর এলো গ্রীষ্মের ছুটি।

চাপরাসি ডাক দিয়ে গেছে, হঠাৎ সুরেশ্বর উৎসাহিত হ'য়ে বললে, 'সত্যর চিঠি এসেছে, ছুটিতে আসছে এখানে বেড়াতে।'

অসীমা কি কাজ করছিলো, অন্যমনস্কের মতো বললে, 'কেন, এ-বছর মামাবাড়ি গেলো না?'

কথার সুরটা সুরেশ্বরের পছন্দ হ'লো না। বললে, 'বছর তিনেক বাদে বাপকে হয়তো হঠাৎ মনে পড়েছে।'

'বাপের ভাগ্য ভালো। কিন্তু গ্রামে এ-সময়টায় বসন্ত দেখা দিয়েছে, এখন কি তার আসা উচিত হবে?'

'আর উচিত!' সুরেশ্বর স্ত্রীর দিকে করুণ করে' তাকালো: 'কালই সে আস্‌ছে বিকেলে।'

'কালই?'

'হ্যাঁ, কলেজ তো ছুটি হয়েছে হপ্তাখানেক আগে। ডিক্সন লেনে ওর মাসি এসেছে চিকিৎসা করাতে, সেখানে দিন কয়েক থেকে কাল রওনা হয়েছে।'

অসীমা অকস্মাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল। আর সে-স্তব্ধতা সমস্ত সংসারে একটা যেন কি বিষণ্ণ ছায়া ফেললে।

বিকেলবেলা সাজগোজ করে' ষ্টেশনে যাবার প্রাক্কালে সুরেশ্বর বললে, 'ছোঁড়াটাকে আমার সঙ্গে দাও।'

অসীমা কঠিন কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো: 'কেন, ইষ্টিশানে কুলি নেই?'

'বা, আমি সেই জন্যে বলছি নাকি? এতটা রাস্তা গরুর গাড়িতে

একা-একা যাবো, তাই ভাবছিলাম গল্প করবার জন্যে সঙ্গে একটা লোক থাকলে মন্দ হ'তো না।'

'কেন, গরুর গাড়ি করে' যাবে কেন ? তোমার সাইকেল নেই ?'

'তা, ও না গেলে সাইকেলেই যেতে হবে বৈ কি।' সুরেশ্বর আমতা-আমতা করে' বললে। অসীমার কুটিল, সন্দিগ্ধ চোখের সামনে বেশিক্ষণ সে দাঁড়াতে পারলো না।

সন্ধে হ'তে-না-হ'তেই বাড়ির দোর-গোড়ায় এসে একটা গাড়ি দাঁড়ালো। কে এলো দেখবার জন্যে দেবু একটা লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে গেলো। দেখলো সুরেশ্বরের সঙ্গে আরেকটি কে ভদ্রলোক গাড়ির থেকে নামছে। চমৎকার তার সাজগোজ, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, আলো পড়ে' পায়ের কালো চামড়ার জুতোটা কেমন চকচক করছে, চুলে এমন ছাঁট দেয়া যে এখানকার পরামাণিকরা বি-এ পাশ করে' এলেও তেমন কাটতে পারবে না।

দেবু একদৌড়ে অসীমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'কে এসেছে, মা ?'

অসীমা তার কৌতুকোজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে তাকালো। বললে, 'তোমার দাদা।'

'দাদা?' দেবু যেন অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো: 'সে কি কথা ? তুমি না বলতে আমিই তোমার বড়ো ছেলে! আমার তবে দাদা এলো কোত্থেকে ?'

নিস্পৃহ, উদাসীনের মতো অসীমা বললে, 'তোমার আরেক মা ছিলো, তিনি নেই, মারা গেছেন, তোমার দাদা সত্যব্রত তাঁরই ছেলে।'

দেবু যেন খানিকটা আরাম পেলো। বললে, 'তবে তোমার ছেলে নয়।'

ততক্ষণ অসীমা দেবুকে নিয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে সত্যব্রত তখন জিনিস-পত্র নামাবার জন্যে চারপাশে একটা সাহায্য খুঁজছে। সুরেশ্বরকে বললে, 'বাড়িতে চাকর নেই?'

সুরেশ্বর দেবুকে চুপ করে' একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রুখে উঠলো: 'কি অমন হাঁ করে' দাঁড়িয়ে আছিস? মালগুলো নামা! মাইনে নেবার বেলায় তো দেখি খুব ওস্তাদ, এখন কাজ করবার বেলায়ই আর হাত ওঠে না, না? ওপরে নিয়ে যা সব বাক্স-পত্তর।'

এমন একটি সুবেশ, সুদর্শন ছেলে বাড়ির চাকর হ'তে পারে কথাটা সত্যব্রত চট্ করে' বিশ্বাস করতে পারলো না।

দেবু হয়তো এগিয়ে যাচ্ছিলো, কেননা তার বিশ্বাস হয়েছে বাড়ির কাজে ঘরের ছেলেদেরো কখনো-কখনো হাত লাগাতে হয়, তাতে অপমান নেই, কিন্তু অসীমা তার হাত চেপে ধরে' বাধা দিয়ে ঠাকুরকে বললে, 'জিনিসগুলি নামাও ঝটপট, গাড়োয়ানটাও বা দাঁড়িয়ে আছে কী করতে?'

সত্যব্রত এসে অসীমাকে প্রণাম করলো।

অসীমা দেবুকে বললে, 'দাদাকে প্রণাম করো, দেবু।'

খানিকটা কুণ্ঠিত, খানিকটা কৌতূহলী হ'য়ে দেবু প্রণাম করলো সত্যব্রতকে। তার প্রণাম ও প্রণামের ধরন দেখে সত্যব্রতও কম কুণ্ঠিত, কম কৌতূহলী হ'লো না।

ততোক্ষণে সত্যব্রত হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় বদ্‌লে সুরেশ্বরের শোবার ঘরে খাটের উপরে বসে' বাপের সঙ্গে গল্প করছে, কোলকাতার কথা, তার কলেজের কথা, বি-এ শেষ করে' কোন লাইনে যাবে তারি জল্পনা। রাজধানী ছেড়ে তারপর তারা এই গ্রামে এলো, এই সংসারে, একেবারে এই শোবার ঘরটিতে। বড়ো-বড়ো সমস্যা থেকে একেবারে খুঁটিনাটি বিষয়, দুধের দাম, ডিমের হালি, চাকর-ঠাকুরের মাইনে।

কিন্তু সম্প্রতি সিগারেট খাবার জন্যে তার আল-জিভ পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। তাই সমস্ত শরীরে শিথিল একটা ভঙ্গি এনে সে বললে, "কী বিচ্ছিরি ট্রেন আর কী ন্যুইসেন্স গরুর গাড়ি, একেবারে ক্লান্ত, দুর্বল করে' ফেলেছে !'

'হ্যাঁ, পাশের ঘরে বিছানায় গিয়ে একটু শো না', সুরেশ্বর বললে, 'রান্নার হয়তো দেরি আছে।' বলে' সে-ই তার বিছানায় একটু প্রসারিত হ'লো।

নিচে অসীমা তখন রান্নার তদারকে ব্যস্ত, হঠাৎ একটা কান্না আর কোলাহল তার কানে যেন আগুন ঢেলে দিলো। কান্নাটা দেবুর আর কোলাহলটা সত্যব্রতের।

আঁচলে ভিজে হাত মুছতে-মুছতে অসীমা ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে এলো উপরে। এমন একটা দৃশ্য দেখবে বলে'ই সে যেন অন্তরে-অন্তরে শিহরিত হচ্ছিলো এতক্ষণ।

দেখলো, দেবু তক্তপোসের উপর পাতা বিছানাটা কামড়ে পড়ে' আছে, আর সত্যব্রত তাকে টেনে তোলবার জন্যে আসুরিক আস্ফালন করছে। যেমনি একবার ঠেলে ফেলে দিচ্ছে বাইরে, অমনি আবার দেবু বিছানায় গিয়ে মাটি নিচ্ছে। চড়-চাপড় ঘুসি-লাথি কিছুরই কমতি নেই, সরাসরি জোরে না পারলেও ক্রোধে দেবু এক ইঞ্চি পেছনে নয়— কুটি-কুটি করে' ছিঁড়ে ফেলছে সে বিছানার চাদর, তুলো বার করে' ফেলছে বালিসের।

একেবারে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। অসীমা দেখলো, দূরে দাঁড়িয়ে এ যুদ্ধের প্রেরণা দিচ্ছে সুরেশ্বর।

অসীমাকে দেখেই যুদ্ধটা বাক্যে রূপান্তরিত হ'লো।

সত্যব্রত বললে, 'দেখলে মা, আমার বিছানাটার কী দুর্দশা করলে !'

'তোমার বিছানা!' দেবু দুঃখে, রাগে, অসহায় অপমানে তীব্র কণ্ঠে বললে, 'আজ তিন বচ্ছরেরো উপর সমানে আমি শুচ্ছি, আজ একদিনে সেটা তোমার বিছানা হ'য়ে গেলো?'

'আলবৎ আমার বিছানা।' সত্যব্রত হুঙ্কার দিয়ে উঠলো: 'এই বাড়ি ঘর জিনিস-পত্র সমস্ত আমার। তুই কে?'

'তুমি কে?' দেবু পাল্টা নিক্ষেপ করলে।

'আমি এ বাড়ির ছেলে। আমার এই বাবা-মা, আমার এই ঘর-বাড়ি, সমস্ত আমার।'

'তুমি তো আরেক মায়ের ছেলে, যে মরে' কবে ভূত হ'য়ে গেছে। এই মা তো আমার। আমার একলার।' দেবু অসীমার দিকে করুণ করে' তাকালো: 'তাই না, মা?'

এতোটা অসীমার সহ্য হ'লো না, সত্যব্রতের সামনে, সুরেশ্বরের সামনে, সুরেশ্বর ও সত্যব্রতের সামনে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দেবুর কানটা সে সজোরে মুচড়িয়ে দিয়ে বললে, 'ওঠ্, ওঠ্ এই বিছানা থেকে। চাকর, তুই আমার ছেলে হ'তে যাবি কোন লজ্জায় রে, মুখপোড়া? এই তো আমার ছেলে।' সত্যব্রতের দিকে সে আঙুল দেখালো, 'সত্যিকারের ছেলে। তোকে আমি পেটে ধরেছি, হতভাগা? যা, নিচে শু গে যা ঠাকুরের ঘরে। যতোই নাই দেয়া যায় ততোই কুকুর মাথায় এসে ওঠে, না? যা এখান থেকে।' বলে' অসীমা তাকে দরজার দিকে ঠেলে দিলো।

পরে নতুন চাদর বার করে' বালিস বদলে স্বহস্তে পরিপাটি করে' বিছানা করলো। সত্যব্রতকে স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'শোও, বিশ্রাম করো। রান্নার আর বেশি দেরি নেই।'

নিচে ঠাকুরের ঘরে গিয়ে দেখলো, দেবু নেই। কুয়োতলা, দূরে

পুকুরের ঘাটলা, কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেলো না। অনেক রাত পর্যন্ত তার ভাতের থালা নিয়ে অসীমা বসে' রইলো, ভাবলো খিদে পেলেই সে সেদিনের মতো ফিরে আসবে। কিন্তু এলো না। ভাবলো, এ ক' বছরের মাইনের—দু' শো টাকারো উপর—একটি আধলাও সে নেয়নি; ভাবলো, নিশ্চয়ই কাল সকালে সে আসবে, অন্তত টাকা ক'টা চেয়ে নিতে, মাইনে সম্বন্ধে চেতনা যার ভয়ঙ্কর জাগ্রত। কিন্তু পরদিনের সকাল গত রাত্রির সন্ধ্যার মতোই অন্ধকার।

# সময়

এখানে সবই আছে, হাসপাতাল আছে, আদালত আছে, ইনস্পেকশান বাঙলো আছে, আঞ্জুমান ইসলামিয়া আছে, কেবল সদরে যাবার ট্রেনেরই সুবিধে নেই। একখানা ট্রেন ছাড়ে রাত চারটে বাইশ মিনিটে, আরেকখানা দুপুর আড়াইটেয়—সদরে পৌঁছুতে প্রায় চার ঘণ্টার ধাক্কা। ঘোরতর মফস্বল।

বরেন সদরালা বড়ো-সাহেবকে ডি-ও লিখে দিলো, আসচে রবিবার তোমাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাতে চাই।

বরেনের যে চাকরি তাতে ঊর্ধ্বতম রাজপুরুষকে তোয়াজ না করলেই নাকি নয়। দেবতার মনে দেবতা রইলো, তুমি তোমার কাজ করে' গেল, এমনটি হুবহু হ'তে পারবে না। দেবতা যখন রইলোই তখন তাকে স্বীকার না করা মানেই নিজের অস্তিত্বকে সন্দেহ করা। অতএব বরেন আর দেরি করলো না, চিঠি লিখে দিলো।

লিখলো, সকাল ন'টায় সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করলে ভালো হয়।

ওটুকুই তার বেয়াদবি বলতে হবে। ফেরৎ ডাকে সাহেব লিখলেন, বিকেল চারটের সময় আমার বাঙলোয় তোমাকে দেখতে পেলে ভারি খুসি হবো।

বরেন তার স্ত্রী উমাকে বললে, 'তুমি নিশ্চয়ই খুসি হও নি। আমাকে তা হ'লে সেই ভোররাত্রের ট্রেনে বেরিয়ে রাত্তির সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফিরতে হবে।'

'কি আর করা!' উমা বিরসমুখে বললে, 'ওখান থেকে ডাউন ট্রেন ছাড়ে কখন?'

'পাঁচটা ক' মিনিটে। সাহেবের বাঙলো থেকে ষ্টেশন বেশি দূর নয়। আর্লি ও-ট্রেনেই ফিরবো।'

'এর পর?'

'ও সর্বনাশ!' বরেন যেন চোখে আকাশব্যাপী অন্ধকার দেখলো: 'পরের ট্রেন ছাড়তেই প্রায় সাড়ে ন'টা। সেটা শুনেছি এখানকার ফ্লায়ার, তা-ও বাড়ি পৌঁছুতে বারোটার কম হবে না।'

'রাত্তির বারোটায়?' উমার স্বর ভয়ে শুকিয়ে গেলো।

'হ্যাঁ গো, নিশুতি মধ্যরাত্রে। তা তোমার ভাবনা নেই, আমি সাড়ে ন'টার গাড়িতেই চলে' আসবো।'

কথাটা বলে' ফেলেই বরেন ভেবে দেখলো একেবারে নির্ভাবন হবারো কিছুই নেই। এতটা সময়, সূর্যোদয় হবার আগে থেকে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদ ওঠা পর্যন্ত এই প্রায় আঠারো ঘণ্টা উমা একটানা কাটাবে কি করে'? কোলকাতা ছেড়ে তারা কত দূর এই এসে পড়েছে, জীবিকার অন্বেষণে, তাদের বহুবিস্তৃত অভিযানেও পাণ্ডুপুত্রেরা যেখানে কোনোদিন আসে নি। কোলকাতা তাদের কাছে এখন একটা ধূসর স্বপ্নের মতো মনে হয়। আবার কবে না-জানি সেখানে যাওয়া যাবে! এখানে সময় কাটানোই একটা সমস্যা, যেমন ধরো, তোমার পয়সা আছে অথচ খরচ করবার কিছু নেই। তার মতো শাস্তি আর মানুষের কী হ'তে পারে! তবু বরেনের না-হয় আপিসের কাজ আছে, পাঁচটা পর্যন্ত সে মুক্ত; সন্ধ্যায় তার একটা ক্লাব আছে, রাতে খবরের কাগজ আছে, কিন্তু উমা এতক্ষণে করে কী? সে ভারি একলা। সবাই বলে আর তাদের নাকি ছেলেপিলে হবার সময় নেই। তার নিঃসঙ্গতা লাঘব করবার জন্যে বরেন

আয়োজনের ত্রুটি করে নি, কিন্তু জিনিসের ভিড়ে কখনো ঘর ভরে না। তাকে সেলাইয়ের কল কিনে দিয়েছে কিন্তু কী সে স্বাধীন মনে সেলাই করবে বলো, দরকারি সব জামাই যখন দর্জির তৈরি! আছে একটা গ্রামোফোন, কিন্তু কাকে সে শোনায়! বরেন আবার একটা টাইপ-রাইটার কিনে দেবে বলছে, কিন্তু কেন সে অকারণে আঙুল বেঁকিয়ে টাইপ করতে যাবে?

বরেনকে সবাই তাই স্ত্রৈণ বলতো, স্ত্রীকে ছাড়া এক মুহূর্তও সে বাইরে থাকতে পারতো না বলে'। আপিসের এক ফাঁকে বোঁ করে' সাইক্লে একবার তাকে দেখে যেতো। বিকেলে বেড়াতে বেরুতো সঙ্গে করে', যেটা এখানে একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা, আর ক্লাবে গেলে আটটা বাজতে-না-বাজতে রাবার্ সম্পূর্ণ না করে'ই হাতের তাস ফেলে বাড়ি ফিরে আসতো। এসে দেখতো হয়তো উমা জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছে, রাত্রি আটটাতেই যেখানে মধ্যরাত্রি, কিম্বা হয়তো উদ্‌ভ্রান্তের মতো এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মেঝের সঙ্গে তার শিথিল স্যাণ্ডেলের সেই ঘসার শব্দটা ঠিক একটা আর্তনাদের মতো। বাড়িতে ফিরলেই তারা যে কথোপকথনে নিবিড় হ'য়ে উঠতো তা নয়, বরেন হয়তো খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে, আর উমা হয়তো স্বামীর খিদে পাবার অপেক্ষায় বিছানায় পড়েছে এলিয়ে—তবু এই যে তারা পরস্পরের কাছে আছে, কেউ কোনো কথা বলছে না, এতেই তো তাদের সময় যাচ্ছে কেটে। তার কোনো অভাব আছে ও-কথা ভাবতেই উমার কেমন ছেলেমানসি মনে হয়, তার কেবল অভাব আছে সময়ের, যে-সময় দিয়ে সমস্ত সময় সে ঢেকে রাখতে পারে।

বরেন বললে, 'এতোটা সময় তুমি কাটাবে কি করে'?'

উমা হাসলো। বললে, 'ঘরে খিল দিয়ে দম বন্ধ করে' পড়ে' থাকবো।'

বরেন চুপ করে' রইলো। পরে কথায় সমাপ্তি এনে বললে, 'না। যাবো না, উমা।'

'এ কী বলছ! সাহেবের পাকা চিঠি এসে গেছে, তুমি না যাও তোমার স্কন্ধ যাবে।' উমা ততক্ষণে কথার সুর বেশ তরল করে' এনেছে: 'আমার জন্যে ভাবছ কী! আমি কি কচি খুকি? তিন পোয়া বেলা একলা কাটিয়ে দিতে পারবো না?'

'কি করে'?'

'এই ধরো, শেষরাত্রে তুমি বেরিয়ে গেলে, তোমার গাড়ির শব্দ মিলিয়ে গেলে দরজা দিয়ে ফের বিছানায় এসে শুলুম—প্রকাণ্ড বিছানায় আমি একা, এর মধ্যে বিরহের একটা চমৎকার আরাম আছে। আধো ঘুমে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যাকে ভালোবাসতুম সে আমাকে ফেলে চলে' গেছে, দিনের আলোয় ভাবতে পর্যন্ত তাতে মাদকতা আছে, আর সে তো, তখনো তো রাত!'

শুনতে বরেনের ভারি ভালো লাগলো। বললে, 'তারপর?'

'রোদ উঠতেই ধড়মড় করে' উঠে বসলুম, মুখ ধুলুম, না না, মুখ তো আগেই ধুয়েছি, তোমাকে যখন রওনা করিয়ে দি, বসে'-বসে' আরেক পেয়ালা চা খেলুম একলা। একা-একা চা খেতে না-জানি কেমন লাগবে!' উমা একটু করুণ করে' তাকালো: 'তার পর ভাঁড়ার বা'র করে' দিলুম, কুটনো কুটলুম, বাজারে পাঠালুম, সমস্ত সকালটা ঠাকুরকে রান্না দেখিয়ে দিলুম—ও হরি, রান্না দেখিয়ে দেবো কী', উমা খিল খিল করে' হেসে উঠলো: 'তুমি তো সেদিন খাবে না, তুমি তো সেদিন মফস্বলে।'

'মফস্বলে!'

'ঐ হ'লো, সদরে। হেডকোয়ার্টার ছেড়ে বাইরে গেলেই মফস্বল যাওয়া হ'লো না?'

'হ'লো। তার পর ?'

'রান্নাঘরের ছায়াও মাড়ালুম না, যা খুসি ঠাকুর রাঁধলো। আমি বসে'-বসে' গ্রামোফোন বাজালুম।'

'সন্ধ্যালবেলা ?'

'কেন, তোমার ভালো লাগবে না বুঝি ? ও হরি, তুমি তো সেদিন বাড়িতেই নেই, তবে শুনলে কি করে' শুনি ? আচ্ছা, ছেড়ে দিলুম, নিয়ে বসলুম একটা সেলাই। দাঁড়াও, কোনটা ?' উমা হতাশার ভঙ্গি করে' বললে, 'কতোগুলি যে আরম্ভ করেছি, একটাও আমার শেষ হ'লো না। আবার আরেকটা আরম্ভ করলুম।'

'তা-ও বা কতোক্ষণ ?'

'সেলাই কোলে নিয়ে নিচু হ'য়ে বসে' থাকতে-থাকতে পিঠটা ধরে' গেলো, না ? তবে তুমিই বলে' দাও না, আর কী করলুম তার পর ? ও হ্যাঁ, ঘর-দোর ওলোট-পালোট করলুম, আবার গুছোলুম নতুন করে', নতুন সব য়্যাঙ্গ্‌ল্‌-এ। অনেক ধুঁলো ঘাঁটলুম, অনেক ঝুল মাখলুম। জানলার পরদা, বাক্সের ঢাকনি, বালিসের অড়—সকলের নবজন্ম হ'লো। খাটটা ঘুরে দাঁড়ালো, টেবিল দু'টো তাদের কোণ বদলালো, নতুন দেয়ালে আয়নাতে মুখ দেখলুম। তুমি বাড়ি এসে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলে—এ তুমি কোথায় এসেছ, কোন অপরিচিতার কুটিরে !'

'বলো কী, এই তো সেদিন তুমি সব গোছগাছ করলে।'

'তাই নাকি ?' বেতের পিঠতোলা লম্বা বেঞ্চিটাতে উমা আধখানা হ'য়ে কুঁকড়ে শুয়ে পড়লো হাতলের উপর মাথা রেখে : 'তোমার সঙ্গে কথা বলে' পারবো না।'

'স্নান করতে গেলে কখন ?' বরেন তাকে ধরিয়ে দিলো।

'তক্ষুনি। ও হ্যাঁ, সেদিন কী স্নানটাই যে করলুম', চুলের চূড়া

গড়তে-গড়তে উমা উঠে বসলো : 'টিনের বেড়া-দেয়া বাথরুমটা আমাদের উত্তাল সমুদ্র হ'য়ে উঠলো। আমাদের না, আমার। তিনটে ড্রাম জলে ভরতি করে' নিলুম, আর এক, দুই,—আটটা বালতি। উঃ, কত জল, সব আমার, একলা আমার। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে' স্নান করলুম, অনেক জলে, অনেক সাবানে। তারপর, যখন বেরিয়ে এলুম বাথরুম থেকে, কী করুণ ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছি, বরফ-পড়া জানলার কাঁচের মতো। কিন্তু কাউকে ছুঁতে দিলুম না আমাকে, আমি এমন দুঃস্পৃশ শীতল!'

'কথাটা কী বললে?' বরেনের কথায় বা একটু ঠাট্টা।

'বললুম, সামনের টিউব-ওয়েলটা খারাপ হয়ে গেছে, জলের বদলে বালি উঠছে অনবরত, বাঁকে করে' ভাঁড়ি জল এনে দিলো ইস্কুলের টিউব-ওয়েল থেকে—একেক বাঁক একেক পয়সা। সেদিন আমার স্নানই হ'লো না।' উমা আবার শুয়ে পড়লো।

'তুমি জানো না, সকালবেলাই মিউনিসিপ্যালিটি সারিয়ে দিয়ে গেছে টিউব-ওয়েল—জল, জল, অফুরন্ত জল। তার পর', বরেন মৃদু-মৃদু হাসলো : 'তার পর কী করলে, খেয়ে-দেয়ে?'

'জাজিমের উপর শীতল-পাটি বিছিয়ে রেখেছিলুম, জানলা-দরজা বন্ধ করে' ঘরটাকে একটু বিষণ্ণ করে' শুয়ে পড়লুম, বালিসে ভিজে চুল ছড়িয়ে। হাতের কাছে পুরোনো কতকগুলো মাসিক-পত্রিকা ছিলো, তাতে মন বসলো না। তার পর উপুড় হ'য়ে শুয়ে-শুয়ে তোমাকে একটা চিঠি লিখলুম।'

'চিঠি! আমি তো সেদিনই ফিরে আসবো।'

'তবু তোমাকে একটা চিঠি লিখতে ভারি ইচ্ছে করছিলো। বিয়ে করে' অবধি আমাদের আর ছাড়াছাড়ি নেই।' উমা করুণ করে' তাকালো : 'এ পর্যন্ত একখানা মনের মতো চিঠি লিখতে পারলুম না।

চিঠিতে কত কথা লিখতুম, যা তোমাকে মুখে বলতে পারি নি, কত সুন্দর করে' নিজেকে দেখাতুম, যা তোমাকে শত সেজেগুজেও দেখাতে পারি নি।'

'কি করে'ই বা ছাড়াছাড়ি হ'বে, কোথায়ই বা তোমাকে রেখে আসবো ?' বরেন সমবেদনার সুরে বললে, 'বাপের বাড়িতে তোমার কেউ নেই, আর আমি তো চিরকালের বাউণ্ডুলে। এই প্রথম আমরা আকাশ ঢেকে তাঁবু ফেললুম! তোমার-আমার আরেকটা কোথায় আশ্রয়ই যদি থাকতো তবে তোমাকে এমন একলা থাকতে হ'তো নাকি ? কত লোক বেড়িয়ে যেতে পারতো—মা কিম্বা শাশুড়ি, বোন কিম্বা ননদ, বৌদি কিম্বা জা, ভাইঝি কিম্বা ভাসুরঝি—কত! কতই তো মানুষের থাকে।'

'না, সঙ্গীর আমার অভাব কী! মূর্তিমান তুমি আছ, ঠাকুর আছে, একটা ঝি রেখেছ, তোমার আবার একটা চাপরাসি না পাপরাশি আছে, তোমার পাম্পাপুলারটাকেও পাওয়া যায় দরকার হ'লে, লোকের অভাব কোথায়!'

'হ্যাঁ, তারপর চিঠি লিখতে-লিখতে ঘুমিয়ে পড়লে, না ?' বরেন কথার বাঁক ঘোরালো।

'পড়লুম।' সঙ্কীর্ণ বেঞ্চিটাতে আরেকটু প্রশস্ত হ'বার চেষ্টা করে' উমা বললে, 'কেউ আমাকে ব্যস্ত করলো না, বিরক্ত করলো না। একেবারে সন্ধে ঘেঁসে জাগলুম।'

'তারপর ?'

'সেই চা-খাওয়া, বিছানা-পাতা, গা-ধোয়া, সন্ধে-দেয়া। চাকরকে বলে' দিলুম পেট্রোম্যাক্স জ্বালাতে। দু'-দু'শোটা মোমবাতি একসঙ্গে জ্বলে' উঠলো।'

'পেট্রোম্যাক্স কেন ?'

'দিগ্বিজয় করে' যে আমার জীবিতেশ্বর আসছেন।'

'তারপর যদি না আসি, উমা ?'

'আসবে না কী ! পরদিন সোমবার, আপিস, কাঁটায়-কাঁটায় দশটা, হামাগুড়ি দিয়ে এলেও আসবে। বরং বাড়ি এসে আমাকেই তুমি আর দেখতে পাবে না।'

শনিবার, বিকেলে আপিস থেকে এসে বরেন জিগগেস করেলে : 'ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছ ? ক'টায় ?'

'সাড়ে-তিনটেয়।' উমা ঈষৎ চিন্তিত গলায় বললে, 'সেখানে থাকবার কী ব্যবস্থা করলে ?'

'ওয়েটিঙ-রুমেই থাকবো। অচেনা জায়গা, আমাদের আত্মীয় বলতে কে-কে তা তো জানোই, বন্ধুত্বও পৃথিবীর এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নি।'

'খাবে কোথায় ?'

'ষ্টেশনেই রেষ্টুর‍্যাণ্ট জাতীয় কি-একটা আছে শুনেছি।'

'স্নান ?'

'তুমিই আমার হ'য়ে দু'ঘটি জল বেশি ঢেলো।'

'কেন, পয়সা দিলেই ওয়েটিঙ-রুমে তুমি জল পাবে।'

'তার অনেক হ্যাঙ্গাম, যদিও-বা পাই। প্রথমতো, তার জন্যে আরেক প্রস্ত কাপড়-জামা নিতে হয়, এবং কাজে-কাজেই গোটা একটা সুটকেস। সেটাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে অনর্থক একটা স্নায়বিক অস্বস্তি।'

'তবে তুমি কি বাড়ি থেকেই পোষাক পরে' যাবে নাকি ?'

'অগত্যা।'

'চারটের সময় সে-পোষাকের থাকবে কী জিগগেস করি?' উমা কাতর একটু হাসলো।

'আমি যদি থাকি তা হ'লেই যথেষ্ট।'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে দু'জনে শুলো, একটু সকাল-সকাল। গাড়োয়ানকে বলে' দেয়া হয়েছে, সে ঠিক তিনটের সময় এসে হাজির থাকবে। পোষাক-পত্র সব উমা বা'র করে' রেখেছে, টাই-পিনটি পর্যন্ত। জুতো আয়নার মতো ঝকঝক-করা। সব তৈরি, নিখুঁত।

দু'জনেরই আজ ভারি নিরানন্দ ঘুম, খালি কেটে-কেটে যাচ্ছে। ঘড়িটা শিয়রের কাছে টিকটিক করছে, কান ব্যাপৃত রয়েছে তার শব্দের অনুসরণে। কখন, কোন অসতর্ক মুহূর্তে না-জানি বরেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো, ধড়মড়িয়ে উঠে নিঃসাড় উমাকে সে দুটো ঠেলা দিলো, উদ্বিগ্ন গলায় বললে, 'এলার্ম শুনেছ, উমা?'

'য়্যাঁ!' উমা অসহায় একটা আর্তনাদ করলে।

বালিসের নিচে বরেন ছোট একটা টর্চ রাখে। ত্বরিত ভঙ্গিতে সেটা সে টিপলে, মশারি তুলে ঘড়ির দিকে তাকালো। মোটে তখন বারোটা।

যাই হোক, দু'টোর বেশি বরেন আর শুয়ে থাকতে পারলো না। অন্ধকারে তার ডেক-চেয়ারটায় এসে বসলো। এমন অসময়ে তার রাত জাগবার কখনো কোনো অবকাশ ঘটে নি। আজ মনে হ'লো এমন শান্তি বুঝি কোথাও নেই, ব্যথার মাঝে যে শান্তি। মনে হ'লো উমাকে ছেড়ে সে যেন আজ কতদূর চলে' যাচ্ছে স্থান দিয়ে বা সময় দিয়ে সে-দূরত্ব বোঝা যাবে না, শুধু সে একটা মধুর মনোভঙ্গি। হাত দিয়ে নিচেকার সে একপাট জানলা খুলে দিলে, মৃদু-মৃদু হাওয়া এলো তার মুখের উপর, যেন কা'র রুক্ষ চূর্ণকুন্তলের স্পর্শের মতো। দিগন্ত-রেখায় একটা তারা অস্ত যাচ্ছে। দিনের আলো থেকে অন্ধকারে আকাশকে কত প্রকাণ্ড

মনে হয়, জীবনকে মনে হয় কত অকিঞ্চিৎকর। যখন তোমার মনে বিরহের একটি ভাব আসে, উদার ঔদাস্যের ভাব। উমার থেকে বরেনের আজ এই প্রথম বিরহ।

গাড়োয়ানকে এসেও জাগাতে হ'লো না, তিনটে না বাজতেই বরেন হ্যারিকেন জ্বালালো। জানলার গায়ে ওটাকে ঝুলিয়ে রেখে আয়নায় দাঁড়িয়ে সে দাড়ি কামালো—যদিও সকালে সে একবার কামিয়েছে। টুথ-ব্রাশ মুখে পুরে সে বললে, 'গাড়ি এসেছে এতোক্ষণে।'

উমা উঠে স্টোভ ধরালো। ময়দা মাখা ছিলো, লুচি ভেজে দিতে তার দেরি হ'লো না। আরেকটু মোহনভোগ। চা।

'তোমার আজ কিছু খাওয়া হ'বে না সমস্ত দিন।' উমা বললে।

'কাল বলো। ভারতীয় মতে এখনো ভোর হয় নি।'

টাই বাঁধা এক হাঙ্গাম। আড়াই-প্যাঁচের কায়দাটা বরেন মনে করতে পারলো না।

'কি হ'বে? তুমি জানো, তোমার মনে আছে?' বরেন চোখে অন্ধকার দেখলো।

উমা তার কী জানে! খানিক অপরাধীর মতো খানিক বা কৌতুকান্বিতের মতো চেয়ে রইলো।

'পেরেছি। কিন্তু এই যাঃ, এটার তলা দিয়ে কলারের এ দু'টো শুঁড় যে আগে আঁটতে হ'বে। সর্বনাশ হ'লো! এ-ফাঁসটা মরতে যে কেন গলায় বাঁধে তা কে বলবে!'

উমা এক হাতে হ্যারিকেন উঁচিয়ে রইলো, অন্য হাতে টাইয়ের বিলম্বমান প্রান্তটা 'তুলে ধরে' স্বামীকে কলারের বোতাম আঁটতে সাহায্য করলে। অসম্ভব মুখবিকৃতি করে' বরেন রজ্জুবদ্ধ হ'লো। ওয়েটিঙ-রুমে এ কসরৎটা করতে হ'লেই হয়েছিলো আর-কি।

নিভাঁজ পোষাকে বরেন নিজেকে হঠাৎ খুব গরীয়ান মনে করলো। বললে, 'কেমন দেখাচ্ছে বলো তো ?'

ঠোঁট উলটিয়ে উমা বললে, 'ছাই।'

'পছন্দ হচ্ছে না ? ভালোবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমাকে ?'

'কি করে' হ'বে ?' উমা খিলখিল করে' হেসে উঠ্‌লো : 'ভালো-বাসতে গেলেই তো তোমার ক্রিজ্ নষ্ট হ'য়ে যাবে ?'

এটায়-ওটায় আরো খানিকক্ষণ কাটলো।

বরেন বললে, 'টাকা দাও।'

'কত দেবো ?'

'একটু বেশি করে'ই দাও। এই পোষাকে তো আর একশো এগারো নম্বরে যেতে পারবো না। তা ছাড়া ওয়েটিঙ-রুমে থাকতে হ'বে।'

হ্যাঁ, সবই সে নিয়েছে। টাকা, রুমাল, ঘড়ি, ফাউন্টেনপেন, সিগারেটের টিন, দিয়াশলাই, তার যা দরকার। হ্যাঁ, সাহেবের চিঠি-খানাও নেয়া দরকার, তার অস্তিত্বের যাথার্থ্য সম্বন্ধে যদি-বা কখনো প্রশ্ন ওঠে। আশ্চর্য, যখনই কোথাও যায় বরেনের কেবলই মনে হয়, কী যেন সে ফেলে এসেছে। ওটা তার একটা দুর্বলতা। না, কিছুই সে ফেলেনি। শুধু উমাকে ছাড়া।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উমা বললে, 'আরো খানিকক্ষণ তুমি বসতে পারো।'

'কিন্তু জানো তো মফস্বলের ট্রেন, ওদের মতি-গতির ঠিক নেই।'

যখনই যাবে, বরেন ষ্টেশনে যাবে অন্তত একঘণ্টার ব্যবধান রেখে—এটা উমার জানা। কিন্তু আজ একটু পরে গেলে যেন ভালো লাগতো।

বরেন বললে, 'ঝিকে আজ বাড়ি যেতে দিয়ো না, কাছে-কাছে রেখো। আর চাকর-ঠাকুর তো পাহারাতেই থাকবে।'

মৃদু হেসে উমা বললে, 'আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।'

'ঘরে তালা দিয়ে কারু বাড়িতেও বেড়াতে যেতে পারো দুপুরে।'

'ছুটির দিনে! রবিবারের দুপুরে বেড়াতে যাওয়া কি অফিসিয়েল এটিকেট?'

'চাপরাসি দিয়ে খবর পাঠালে কেউ-কেউ আসতেও পারেন হয়তো।'

'তার চেয়ে ঘুমুলে মোটা হওয়া যাবে।'

'আর শোনো', বরেন উমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'তোমার সেই ছোরাটা আছে না?'

'কেন?' উমা ভুরু কুঁচকোলো।

'সেটা কোথায়?'

'কোন বাক্সের তলায় পড়ে' আছে।'

'ওটা বা'র করে' রেখো।'

'কী হবে ওটা দিয়ে?'

'একলা আছ, হাতের কাছে একটা অস্ত্র থাকা ভালো।'

স্বামীর বুদ্ধিকে প্রশংসা করতে হয়, কিন্তু মূর্খ উমা অনর্গল হেসে উঠলো। বললে, 'তুমি কি মনে করো, হাতের কাছে ওটা থাকলেই আমি কারুর বুকে বসিয়ে দিতে পারি?'

পাখিও তখন ডাকে নি, বরেন গাড়িতে উঠে বসলো। সামনের রোঁয়াকে উমা এসে দাঁড়িয়েছে, পায়ের কাছে লণ্ঠনটা বসানো। গাড়ি ছেড়ে দিলো, উমাকে আর দেখা গেলো না।

সহরে গাড়ি এসে দাঁড়ালো, সাড়ে-আটটা। প্লাটফর্মে নেমেই প্রথম বরেনের মনে হ'লো, সাহেবের ইচ্ছার একটু অনুকূল সঞ্চালন হ'লেই তো

সে এখন অনায়াসে গিয়ে সাক্ষাৎকারটা সেরে আসতে পারতো। কিন্তু ইচ্ছাকে অ-পরতন্ত্র না করতে পারলে শক্তি ও মর্যাদার সার্থকতা কি! না-ও হ'তে পারে। হয়তো সাহেব কোনো সভা করছেন, কিম্বা ইনস্পেক্‌শান, হয়তো বা বেরিয়ে গেছেন কাছাকাছি কোনো গ্রাম দেখতে। নিজেই বা বরেন কী করে? কোনো উমেদার তার সুমধুর ইচ্ছানুসারেই কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারে?

ওয়েটিঙ-রুমটা বেশ বড়ো, নানা ধাঁচের লম্বাটে যতোগুলো চেয়ার ফেলা। লোকজন নেই। কায়েমি হ'য়ে একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে পড়া যাক।

তার আগে বরেন টাকাখানেকের চুটকি বাঙলা পত্রিকা কিনলে। এক পয়সা থেকে চার আনা। গালাগাল, সিনেমা আর মনস্তত্ত্ব। প্রত্যেকটি লাইন সে পড়বে, প্রতি দু' লাইনে এক সেকেণ্ড করে' সময় দিলে ছয়খানি পত্রিকাতেই বারোটা বেজে যাবে, যখন সোরাবজির ওখানে তার খাবার ডাক পড়বে, খেয়ে-দেয়ে আর বাকি ছ'খানাতেই চারটে।

প্রথম ছ'খানা শেষ করে' যখন সে ঘড়ির দিকে তাকালো, দেখলো দশটাও তখনো বাজে নি। বোঝা গেলো, আকৃষ্ট করে' রাখবার মতো কাগজের একটি পৃষ্ঠাও উপযুক্ত নয়, কোনো রকমে উলটে যেতে পারলেই যেন যথেষ্ট। কিন্তু তারপর, এখন আর কি করা যায়!

হু-হু করে' একটা ট্রেন এলো কোত্থেকে। জনবিরল ষ্টেশনটা মুহূর্তে সরগরম হ'য়ে উঠলো, কুলি, যাত্রী ও গাড়োয়ানের চীৎকারে। নির্লিপ্ত হ'য়ে ষ্টেশনের ব্যস্ততা দেখতে বরেনের ভারি ভালো লাগলো।

হঠাৎ দেখা গেলো ঘরের মধ্যে কারা এসে সুবিশাল একটা মশারি খাটাতে আরম্ভ করেছে। দিনের বেলা এত বড়ো মশারি, ব্যাপারটা

বরেন বুঝে উঠতে পারলো না, কৌতূহলী হ'য়ে সে বাইরে এসে দাঁড়ালো; দেখলো একটা পালকিতে আনুপূর্বিক আচ্ছাদিত হ'য়ে একটি পুরমহিলা ওয়েটিঙ-রুমের দিকে বাহিত হচ্ছেন। দিবালোকে বেরিয়ে এসেও তিনি সূর্যের মুখ দেখবেন না এই জাগ্রত অভিসম্পাত নিয়ে তিনি মশারির গহ্বরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। মশারি টাঙানো থেকেই বোঝা যাচ্ছে অপর যাত্রীর অধিকারকে সমূলে অস্বীকার করা হচ্ছে না, কেননা ষ্টেশনে এই একটিমাত্র ওয়েটিঙ-রুম, কিন্তু মোটা একটা মশারির মধ্যে গভীর বোরকায় নিশ্ছিদ্র আবৃত হ'য়ে কেউ তোমার চোখের সামনে বসে' আছে, তার চেয়ে চোখ মেলে একটা ফাঁসি দেখাও অনেক সহজ। বরেন ষ্টেশনের ঢাকা চাতালে পাইচারি করতে লাগলো। কিন্তু মাল-পত্রের ঠাসাঠাসিতে চলাফেরা করবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেয়ালের টাইম-টেবল পড়লে, ফিরিয়ালাদের বহু-বিচিত্র ডাক শুনলে, প্রতীক্ষমান যাত্রীর সমুখে কাউণ্টারে টিকিট-বিক্রেতার নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততাটুকু উপভোগ করলে, কিন্তু এততেও পনেরো মিনিটের বেশি কাটলো না।

কি ভেবে অবশেষে সে সোরাবজির দোকানে এসে উঠলো।

বললে, 'একটু বসবো।'

বিলিতি পোষাক, হাতে সিগরেটের টিন, তায় খদ্দের—এতে আর কোনো কথা আছে?

নোয়ানো চেয়ার নয় যে গা ঢেলে একটু চোখ বুজবে। পিঠ খাড়া রেখে পড়বার মতোও কাগজ তার হাতে নেই। অতএব একটার পর একটা সিগরেটই পুড়তে লাগলো।

পার্শি ম্যানেজার বললে, 'আপনার খাবারটা একটু আগেই না-হয় তৈরি করে' দিই, আপনার খিদে পেয়েছে।'

ক্ষুন্নিবৃত্তির চেয়ে কালক্ষেপনই এখন বরেনের প্রধান সমস্যা।

দেখলো কাঁচের আলমারিতে থরে-থরে মদের বোতল সাজানো। কোথায় কবে সে শুনেছিলো কে-একজন নাকি শুধু সময় কাটানোর জন্যেই মদ ধরেছিলো। নিজেকে উত্তেজিত বা নিস্তেজ করতে নয়, অবিমিশ্র সময় কাটাতে। কিন্তু ও-দ্রব্য সে কোনোদিন ছোঁয় নি, সুযোগ হয়নি বলে'ই ছোঁয় নি। আজ মনে হলো সময় একটা ব্যাধি, আর মদ সেই সময়ের পরিত্রাতা। কিন্তু মদ খেলে কতটুকু সে খাবে ও কতটুকু খেলে কি-রকম সে ব্যবহার করবে কিছুই তার জানা নেই। তার সাহস হ'লো না, কিন্তু তার মাত্রা যদি সে কোনো সুযোগে আগে জেনে রাখতো তা হ'লে সময়কে সে ভয় পেতো না, এই পৈশাচিক সময়।

তার চেয়ে ধোঁয়া-ওড়ানো গরম ভাত এসেছে আর মুর্গির ঝোল। দশ মিনিটো তার লাগবার কথা নয়, কিন্তু খাওয়াটাকে রবারের মতো সে টেনে লম্বা করতে লাগলো। সাড়ে-এগারোটা, বারোটা, স'-বারোটা— বরেন শেষ জল খেলো এইবার। তার পর দুটো সিগরেট খেয়ে বিল চুকিয়ে সে যখন বাইরে এলো, একটা-ও তখনো বাজে নি।

চড়চড় করছে রোদ, ঘামে কলারটা নেতিয়ে পড়ছে, তবু বরেন কাঁকর-বিছানো খোলা প্ল্যাটফর্মে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিতে লাগলো। প্রতি টহলে তিন মিনিট করে'। এ ভাবে তেত্রিশ মিনিট কাটতেই সে অনুভব করলে তার ট্রাউজার উরুর সঙ্গে লেপটে বসেছে। ওপারের প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিলো, মরিয়া হ'য়ে বরেন তাতে উঠে বসলো, নিরিবিলি একটা সেকেণ্ড ক্লাসে।

শুনলো ট্রেনটা নাকি এখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়াবে।

পাখা খুলে দিয়ে বরেন পা ছড়িয়ে বসলো, পোষাকের উপর আর তার মায়া নেই। সাহেব না-জানি এখন কী করছেন! বরেন কোনো ছবিই মনে আনতে পারলো না। কিন্তু প্রায়ান্ধকার বিষণ্ণ একটি ঘরে

ঠাণ্ডা শীতল-পাটির উপর শিথিলায়িত সুষমায় কে শুয়ে আছে বারে-বারে মন শুধু তারই আঁকাবাঁকা ছবি আঁকতে লাগলো।

একটা কাজ করলে মন্দ হয় না, উমাকে সে একটা প্রিপেড্ টেলিগ্রাম করুক, সে কেমন আছে, কী করছে, একা-একা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? উত্তরের আশায় আরো দু'ঘণ্টা সে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু টেলিগ্রাম হাতে এসে পড়তেই, খোলবার আর অবকাশ হ'বে না, উমা অর্দ্ধেক মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে, তাকে ততটুকু যন্ত্রণা দিতেও মন সায় দেয় না। তা ছাড়া বাজে একটা ন্যাকামিতে কতগুলি টাকা-খরচ।

তার চেয়ে এ আড়াই ঘণ্টা সময় সে একটা গাড়ি ভাড়া করে' সহর দেখতে বেরুলেই তো পারে। সহর বলতে তো খোলা কতগুলি ড্রেন, টিনের কতগুলি খোপরি আর ধুলোর কতগুলি ঝাপটা। সহরের খুরে দণ্ডবৎ।

বরং চোখ বুজে ঈশ্বরের নাম করলে কাজ হয়।

হঠাৎ গাড়িতে টান পড়তেই বরেন লাফিয়ে উঠলো, ট্রেন চলতে সুরু করেছে। রসিকতাটা মন্দ হয় নি, বরেন ঝট করে' নেমে পড়লো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো ছটো। ঈশ্বরের নামের গুণ আছে বলতে হবে।

ওয়েটিঙ-রুমের দিকে অগ্রসর হ'য়ে বরেন দেখলো মশারিটা অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু থাকলেই হয়তো ভালো ছিলো, কেননা রাশীকৃত এই খাবারের ঠোঙা, মাংসের হাড়, পানের ছিবড়ে আর ময়লা ন্যাকড়ার ফালি দেখতে হতো না। তবে চোখ বুজলেই সমস্ত পৃথিবী ব্রহ্মময়— বরেন ইজিচেয়ার খালি পেয়ে পা তুলে দিয়ে লম্বা শুয়ে পড়লো।

একে কাল সমস্ত রাত্রির অনিদ্রা, তায় এই প্রতীক্ষার ক্লান্তি, ভাতের পচানি ধরেছে রক্তে, বরেন বিভোর ঘুমিয়ে পড়লো।

সর্বনাশ, ঘুম ভেঙে ঝাপসা চোখে বাইরে চেয়ে বরেনের কেমন মনে হলো বেলা ঝিমিয়ে এসেছে। কী হবে! ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। চলছে তো ঘড়িটা? হ্যাঁ, চলছে। ঈশ্বরের সে আর বৃথাই নাম করে নি এতক্ষণ।

একটা গাড়ি নিয়ে সাহেবের কুঠির দিকে সে রওনা হ'লো।' একে বলে পাঙচ্যুয়ালিটি, সময়ানুবর্তিতা। বরেন নিজেকে একটু-বা গর্বিত মনে করলো। কিন্তু কুঠির কাছে আসতেই বরেন তন্ন-তন্ন করে' পকেট হাতড়াতে লাগলো—কী সর্বনাশ, ভিজিটিঙ-কার্ড তো সে সঙ্গে আনে নি। কী হ'বে! কলম আছে, কার্ড নেই; যেন কাঠি আছে, দেয়াশলাইয়ের খোল নেই। ছি ছি ছি, ভিজিটিঙ-কার্ড ছাড়া সে দেখা করবে কি করে'? না, সেইটেই সম্মাননার হবে? এখন, কোথায়ই বা সে কার্ড পাবে, এই সঙ্কীর্ণ সময়ে? তখন কেন যে সে গাড়ি করে' সহর দেখতে বেরোয় নি, বরেন সহস্র জিহ্বায় নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। এখন কোথায় বা দোকান, কোন বা রাস্তা!

বরেন মরিয়ার মতো গাড়োয়ানকে বললে, 'আমাকে এক্ষুনি একবার এখানকার সব চেয়ে বড়ো মনিহারি দোকানে নিয়ে চলো। একটা জরুরি জিনিস কেনা হয় নি। বাজার এখান থেকে কত দূর?'

'মাইল দেড়েক।' গাড়োয়ান বললে।

'পনেরো মিনিটের মধ্যে আবার এখানে পৌঁছে দিতে পারবে? যদি পারো, পুরো এক টাকা বকশিস দেবো।'

'আধঘণ্টাটাক লাগবে, বাবু।'

বরেন অনাবশ্যক পা দোলাতে লাগলো, চুল টানতে লাগলো, আঙুল কামড়াতে লাগলো।

প্রথম যে-দোকানে গাড়োয়ান তাকে নিয়ে এলো, বরেন ভেবে

নিশ্চয়ই সেখানে তা পাওয়া যাবে না, আরো অনেক দোকান খুঁজতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য, পাওয়া গেলো। তবে তারা খুচরো বেচে না, ডজন কিনতে হ'বে। এত বদান্য হ'য়ে কোনো জিনিস বরেন কোনোদিন কেনে নি। টাকার চেঞ্জ পর্য্যন্ত সে আজ নিতে চায় না।

ফিরতি পয়সাগুলি এক থাবায় কুড়িয়ে নিয়ে সে গাড়িতে গিয়ে বসলো। কুড়ি মিনিট—কুড়ি মিনিটের মধ্যে সে ফিরে এসেছে। সময়ের কি এখন পাখা গজালো নাকি ?

ফটকের বাইরে গাড়ি দাঁড়ালো। হাতে ছিলো একটা অনর্দ্ধদগ্ধ সিগরেট, সেটা বিনাক্লেশে বাইরে ছুঁড়ে দিলো। সাহেব হ'লে কী হবে, বাপ-ঠাকুরদা তো বাঙালি ছিলেন, নিম্নস্থ লোকের ধূমপান করাটা সহ্য করতে পারবেন না নিশ্চয়। সে তো পরের কথা, সময়ের বাইরে সাহেব এখন দেখা করবেন কিনা কে জানে !

বারান্দায় উঠতেই, বেয়ারা এলো বেরিয়ে। দীর্ঘ সেলাম ঠুকে চেয়ারে আসন নিতে ইঙ্গিত করলে। ব্যাপারটা হয়তো নিরাশ হবার মতো কিছু নয়, বরেন কার্ডে ধরে'-ধরে' নাম ও পরিচয় লিখলে। পিতলের পাতে কার্ডটুকু গ্রহণ করে' বেয়ারা বললে, 'বসুন। সাহেব এখনো ঘুম থেকে ওঠেন নি।'

বেঁচেছে, বরেন মনে করলো।

কিন্তু সাড়ে চারটে বাজে, এখনো পর্যন্ত সাহেব ঘুমুচ্ছেন, ব্যাপারটা বরেন আয়ত্ত করতে পারলো না। জিগগেস করলো : 'শরীর ওঁর ভালো আছে তো ?'

'তা আছেন। ক'দিন থেকে বড্ড খাটনি পড়েছেন কিনা—'

'কখন উঠবেন বলতে পারো ?'

'ওঁর ঘুম যখন ভাঙবেন। আগে থেকে কি করে' তা বলা যায় !'

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে করুণ করে' বরেন বললে, 'পাঁচটা বারো মিনিটে আমার ফিরে যাবার ট্রেন, এখন প্রায় পৌনে-পাঁচ। যদি—'

'হল্লা করে' তো ওকে জাগানো যাবেন না। ঐ যে মেমসাব বেরিয়েছেন।' কণ্ঠস্বরে বেয়ারা চম্‌কে উঠলো।

মেমসাহেবের বয়েস থেকে মনে হয় সাহেব তেত্রিশ-চৌত্রিশের বড়ো বেশি ওঠেন নি, যদি অবিশ্যি বাঙালি ব্যবধানটা মানা যায়। মাথায় ঘোমটার নামান্তর বলে'ও কিছু নেই, আঁচলটা কায়ক্লেশে বুকের কিয়দংশ অবলম্বন করে' কাঁধের কাছে এসেই সমাপ্ত হয়েছে, শাড়িটা এমন সঙ্কীর্ণ করে' পরা যে শরীরকে মনে হয় যেন শরের মতো তীক্ষ্ণ, কিম্বা 'রেসে' ষ্টার্ট নেবার আগে উদ্যত একটা হুইপেট। মখমলের মতো সবুজ লনে ঘুরে-ঘুরে কখনো এ-ফুলটাকে একটু আদর করছেন, কখনো ও-ডালটাকে ধরে' একটু নাড়া দিচ্ছেন, কখনো-বা শুকনো একটা মাটির ঢেলা গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন জুতোর ডগায়, কখনো বা নিচু হ'য়ে উড়ন্ত একটা কুটো তুলে নিচ্ছেন আঙুলে করে'।

বরেন সকাতরে বেয়ারাকে বললে, 'মেমসাবকে একটু বলবে, চারটের সময় আমার দেখা করার কথা, পাঁচটা বারোর ট্রেনে আমাকে বাড়ি ফিরে না গেলেই নয়—দয়া করে' তাড়াতাড়ি একটু দেখা করিয়ে দিতে পারেন?'

বেয়ারার কোনো অভিমত প্রকাশ করবার আগেই মাঠের থেকে মিহি, মাজা গলায় এক ডাক এলো: 'ব্যেরা!'

'জী।' দীর্ঘ ঈ-কারটাকে দীর্ঘতর করতে-করতে বেয়ারা গেলো ছুটে।

বরেনের কিছু কানে এলো না অবিশ্যি, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলো সেই উদ্দিষ্ট হচ্ছে তাদের কথোপকথনে। সে কে, কী চায়, কেন এই অসময়ে, এই জাতীয় প্রশ্ন। বেয়ারাটা কী উত্তর দিচ্ছে ঈশ্বর বলতে

পারেন। টাইপরাইটার বা সেলাইয়ের কলের এজেণ্ট না ভাবলেই রক্ষে।

তা হ'লেও হয়তো ভালো ছিলো, ট্রেনটা সে ফস্‌কাতে দিতো না।

বেয়ারা এলো ফিরে এবং সমান রেখায় তারই কাছে এসে উপস্থিত হ'লো বলে' বরেন নিশ্চিন্ত বুঝতে পারলো মেমসাহেব বুঝি তারই প্রতি আতিথেয়তায় প্রসারিত হয়েছেন।

'কী বললেন ?' বরেন কৌতূহলী হ'য়ে জিগগেস কর্‌লো।

'বসতে বললেন।'

'সাহেবকে একটু খবর দেবার সুবিধে করা গেলো না ?'

জিহ্বাগ্র ও দাঁতের সঙ্ঘর্ষে একটা শব্দ করে' বেয়ারা বললে, 'বকুনি খাবার এত সাধ কা'র ?'

'বলেছ আমার ট্রেনের আর বেশি সময় নেই ?'

'বলেছি।'

'কী বললেন ?'

'তার উনি কী বলবেন ? রেল-কোম্পানির কাছে গিয়ে নালিশ করুন।'

'বলেছ, চারটেয় আমাকে সময় দেয়া হয়েছে।'

'সময় চলে' গিয়ে থাকে, সটান চলে' গেলেই তো হয়।' বেয়ারা অদৃশ্য হ'লো।

মেমসাহেবকেও আর দেখা যাচ্ছে না, বোধ হয় এতক্ষণে সাহেবের ঘুম ভাঙলো। কিম্বা তিনিই হয়তো সাদরে স্বামীর নিদ্রা ভাঙাচ্ছেন।

অন্তত উমা তো তাই করতো, যখন বরেনের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে, আর সে রয়েছে ঘুমিয়ে। গায়ে ঠেলা দিতো, চুল টেনে দিতো, তবু গোঁয়ারতুমি করলে জল ছিটিয়ে দিতো। তা সে ছুটির দিনে

মাধ্যাহ্নিক ভোজনের শেষেই হোক বা শীতের ভোররাত্রেই হোক। বাইরে ভদ্রলোক নিঃসঙ্গ, নিরবলম্বের মতো বসে' আছে চুপ করে', এ সে এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারতো না।

ফটকের মধ্য দিয়ে হঠাৎ একটা মোটর ঢুকলো, তার গর্জনের আভিজাত্যে আরোহীর পদমর্যাদা বোঝা যাচ্ছে। শূন্য থেকে তারার উদ্ভবের মতো মেমসাহেব কোথা থেকে আকস্মিক আবির্ভূত হ'লেন। সমস্ত শরীরে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাসির রেখা পড়েছে ছড়িয়ে, আস্কন্ধ অনাবৃত বাহুতে এসেছে লীলা, আপ্রান্ত পায়ে এসেছে তরঙ্গিমা। এককালে সিঙ্গ্‌ল্‌ করেছিলেন এখন আবার কি ভেবে বড় চুল রাখছেন, বেশি বাড়তে পায় নি এতদিনে, সেই স্বল্পমেয় চুলে শীর্ণ যে দু'টি বেণী তৈরি করেছেন তাতে এসেছে অস্ফুট চঞ্চলতা।

গাড়ি থেকে যিনি নামলেন তিনি একেবারে খাঁটি সাহেব, জিহ্বায় ও ত্বকে। হাফ-সার্ট ও সর্টস্‌, হাতে একটা র‍্যাকেট। ভীষণ তেজী ও তাজা, মোটর থেকে নামা ও দরজাটা বন্ধ করা থেকেই বোঝা যায়। আশ্চর্য সন্নিহিততায় সহাস্য গল্প করতে-করতে তাঁরা দু'জনে টেনিস-কোর্টের দিকে এগোতে লাগলেন, একটা ছায়াঘন বৃক্ষান্তরালে বেতের দু'খানি চেয়ার বাহিত হ'লো, চেয়ার দুটোয় একটা য়্যাকিউট য়্যাঙ্গ্‌ল্‌ বানিয়ে তাঁরা বসলেন পাশাপাশিও নয় মুখোমুখিও নয়,—সে এক অদ্ভুত নৈকট্য। বরেন ঘড়িতে দেখলো, পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিট। দিশি সাহেব আরও কিছুকাল ঘুমিয়ে থাকুন।

কার্ডটা ফেলে রেখে দৌড়ে গিয়ে তার গাড়িতে উঠতে ইচ্ছে করলো, এখনো সে মরি-বাঁচি করে' ট্রেনটা ধরতে পারে। পাঁচটা ছ' মিনিট—এখনো। কিন্তু সাহেব যখন জানতে পাবেন—সে এসেছিলো অথচ দেখা করেনি, তখন এ-আক্রোশটা ক্রুর একটা ডিনামাইটের মতো তার গৃহভিত্তির

তলা দিয়ে সঞ্চালিত হ'বে। তুমি যতোই কেন না কাজের দেয়াল গড়ো, দৃঢ় আর উত্তুঙ্গ, কিছুতেই কিছু হবে না—যদি না তার উপরে ছাদ থাকে, তোমার প্রভুর করুণাচ্ছায়া। তা ছাড়া এতগুলি অর্থব্যয় করে' এসেছে, এতখানি কুৎসিত ক্লান্তি, এতখানি মরণাধিক প্রতীক্ষা। কবে আবার এ শুভযাত্রার সুযোগ ঘটবে জানা নেই। শেষ পর্যন্ত দেখে যাওয়াই সমীচীন হবে—শেষ পর্যন্ত।

গাড়ি এইবারে ছাড়লো, ঘড়ির দিকে চেয়ে বরেন ভাবলে।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন হোমরা-চোমরা এসে উপস্থিত হয়েছেন, টেনিস সুরু হ'য়ে গেছে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় টেনিস-খেলাটা এখন মাত্র ব্যায়াম হিসেবে প্রচলিত, চিনির ওজন হ্রাস করতে ও মেয়েদের মাংসলতাকে মার্জিত করতে। অন্তত এইটেই দৃশ্যমান উদ্দেশ্য। আরো দু'জন মহিলাও সমবেত হয়েছেন। মেমসাহেব তাঁর টেনিসের সাড়ি পরে' এলেন দৈর্ঘ্যে খাটো ও প্রস্থে শিথিল, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় সাড়ি বদলাবেন বলে'ই এ-বিবাহ তাঁর গরীয়ান মনে হয়েছিলো, ও পুরুষের সমকক্ষতা করতেন পাবেন বলে'। অন্য মেয়ের মতো লোফা সার্ভিস করছেন না, দস্তুরমতো বাহু উঁচিয়ে, দ্রুত একটা নক্ষত্রপাতের মতো। তাতে সমস্ত শরীরে তির্যক রেখার যে একটা ত্বরিত বিচ্ছুরণ হয় সেটাই সবাইকে দেখাবার।

ঘড়িতে তখন পাঁচটা-সতেরো, বেয়ারা এসে বললো, 'সাহেব এসেছেন বাথরুম থেকে। চা খাচ্ছেন।'

'ঘুম থেকে উঠলেন কখন?' বরেন হাঁ করে' রইলো।

'আধঘণ্টাটেক আগে।'

'কার্ডটা তখুনিই পৌঁচেছিলো তাঁর হাতে?'

'তখুনিই পৌঁচেছিলেন। কিন্তু মুখ-হাত ধুতে হন তো।'

কিন্তু এ কার সঙ্গে সে তর্ক করছে ? কতক্ষণ পরেই আপিস-রুম হ'তে তলব হ'লো বেয়ারার। বেয়ারা এসে চোখের ইসারা করে' বললে, 'চলুন।'

এতক্ষণে সেই স্বর্ণক্ষণ এসে উপস্থিত হ'লো। বরেন তার চেহারা ও ও বেশভূষার কথা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না। ইচ্ছে করে'ই এতক্ষণ সে কোনো আয়নাতে মুখ দেখে নি, তার টাই আর কলারের অবস্থা, তার পোষাকের ধূলিরুক্ষতা, তার মুখের মালিন্য। সে আরেকটা নতুনতরো দুঃস্বপ্ন হতো। প্রথম সন্দর্শনটাই নাকি প্রধান মূল্যনিরূপক, বরেন ভাবলে এবং নিজেরো অলক্ষ্যে জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একটু চাটলো, টাইয়ের গেরোটাকে একটু অনুভব করলো, কোটটা টানলো, ট্রাউজারের ক্রিজ একটু আঙুলে করে' তুলে ধরলো আর রুমাল বা'র করে' ঘাড় ও মুখ বারকতক রগড়ালো।

সাহেব তাকে খুব হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। লজ্জিত বিনয়ের মুখ করে' বললেন, 'অত্যন্ত দুঃখিত, তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।'

বরেন ঢোঁক গিলে বললে, 'সেটা কিছু নয়।'

'কেমন দেখছ জায়গাটাকে ?' সাহেব জিগগেস করলেন।

'ভাল্লো।'

'ফাইল ?'

'ভারি।'

'তোমার সহকর্মীরা ?'

'চমৎকার।'

'তোমাদের ওখানে একটা ক্লাব আছে, নয় ? টেনিস খেল ?'

বরেন মিথ্যে করে' বললে, 'খেলি।'

সাহেব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, বিনীত হাস্তে বললেন, 'এখন একটু আমাকে খেলতে যেতে হবে, গুডবাই।'

করমর্দন করে' বরেন বেরিয়ে এলো, টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে গাড়ির দিকে অগ্রসর হলো, দুর্বল অস্যমান পদক্ষেপে।

মনে-মনে ভাবলো সাহেব তাঁর বৈকালিক বেশবাস কেমন সজ্ক্ষিপ্ত করে' এনেছেন, পায়ে টেনিস-সু'র পরেই একেবারে হাঁটুর ওপারে সর্টসের প্রান্ত, গায়ে কলার-ওলা একটা গেঞ্জি, আশ্চর্য, এ হেন কদাকার সর্টস উচ্চাঙ্গ সভ্যসমাজে নির্বিবাদে চলে' গেছে, ওটা পরে' তবু দাঁড়ানো যায়, লোকে বসে কি করে'—কেউ-কেউ আবার পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসে। অথচ তার যে এই পোষাক, ড্রাইক্লিনিং করবার মতো মফস্বলে কোনই বন্দোবস্ত নেই—কেন দরকার ছিলো তার এত সব বিস্তৃত আতিশয্যের ?

এখন বরেন কী করে? পরের ট্রেন সেই সাড়ে-ন'টা, ঘড়িতে এখনো ছ'টা বাজে নি। সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে, মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে, ভিতর থেকে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ঠেলে-ঠেলে উঠছে। স্নান নেই, নিদ্রা নেই, অনর্গল সিগরেট খেয়ে-খেয়ে মুখটা বিস্বাদ, দুপুরের সমস্ত ধুলো আর তাপ গায়ের উপর স্তর বেঁধে আছে, তার উপর বাড়ি পৌছুতে বারোটা—গাড়ির মধ্যে উঠে বরেন আহত একটা পশুর গলায় করুণ ককিয়ে উঠলো।

বললে, 'চলো।'

গাড়োয়ান জিগগেস করলে : 'কোথায় ?'

'ষ্টেশনে।'

পুরোপুরি ভাড়া মায় বকশিস নিয়ে গাড়োয়ান বিদায় হ'লো।

ষ্টেশনটা এখন পরিত্যক্ত, কাছাকাছি কোনো ট্রেন নেই। ষ্টেশনের

নির্জনতাটা পরিহাসচ্ছলেই তার কাছে ভারি সুন্দর মনে হ'লো। যেন কোথায় তার সঙ্গে একটা সঙ্গতি আছে।

সোরাবজিতে গিয়ে সে একের পর এক তিন পেয়ালা চা খেলো, নতুন এক টিন সিগরেট কিনলো ও সাইডিং-এ কোথায় তার গাড়ি পড়ে' আছে সন্ধান নিয়ে তার নির্দিষ্ট কামরাটায় গিয়ে উঠে বসলো।

আলো বা পাখা কিছুই সাড়া দিলো না। বার্থের উপর কয়লার গুড়ো ও ধুলো দু' আঙুল স্তূপ করা আছে, একখানা রুমালে তাদের সম্মার্জন অসম্ভব। বরেন প্রথম টাইটা খুলে ফেললো. কলারের বোতামটা উৎপাটন করলো, গলায় হাত বুলোলো বার কতক, কোট খুললো, সার্ট খুললো, জুতোর ফিতেটা প্রায় টেনে ছিঁড়ে ফেললো, মোজা, বীভৎস মোজাটা টেনে কুঁচকে মুড়ে ঢলঢলে করে' দিলো। তার পর ট্রাউজারের পা দুটো গুটোতে-গুটোতে সে হাঁটুর উপর তুলে আনলো। সার্ট দিয়ে বার্থের ধুলো ঝাড়লো। আর জুতো আর কোটে মিলিয়ে বালিস বানিয়ে চিৎ হ'য়ে অন্ধকারে সে শুয়ে পড়লো।

হায়, এখন কিনা তার চোখে আর ঘুম আসছে না।

সন্ধে হ'য়ে আসছে, আরেকটু পরেই উমা পেট্রোম্যাক্স জ্বালাবে। এখন সে বাথরুমে নিশ্চয় গা ধুচ্ছে, তার পরিমিত স্নেহস্নাত সাড়িটিতে তাকে আজ যেন কী অপরূপ দেখাবে! তার কপালে সিঁদুর আঁকলো নিশ্চয়, সন্ধে দিলো, চা খেলো, তার পর ছোট একটি পান খেয়ে ঠোঁট রাঙালো, বাইরের ঘরের জানলা দিয়ে খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে গেছে, তাই সে মেলে বসেছে হয়তো টেবিলে। সাড়ির চওড়া-পাড়টা ঘাড়ের উপর থেকে কেমন বহুল কোমলতায় লতিয়ে এসেছে।

কী শান্তি এই উমার স্মৃতিতে, তন্দ্রায় বরেনের চোখ জড়িয়ে এলো। কতক্ষণ পড়ে' ছিলো নিঝুম হ'য়ে, কিসের একটা ধাক্কা লাগতেই সে

জেগে উঠে দেখলো সাইডিং' থেকে গাড়িটা প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাড়ে-আটটা।

আস্তে-আস্তে ছাড়বার সময়ও এলো। সময় শেষ পর্যন্ত আসে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ বরেনের সমস্ত দেহ-মন অব্যক্ত আর্তনাদে শিউরে-শিউরে উঠলো। সাড়ে ন'টা বেজেছে, এখনো বরেন বাড়ি ফিরলো না। জানলায় দীর্ঘ চোখে দিগন্ত পর্যন্ত উমা তাকিয়ে আছে, বরেনের এতটুকু কোথাও আভাস নেই। কাসেম গাড়োয়ান অন্য সোয়ারি নিয়ে ফিরলো, চাপরাসি এসে মুখ কাঁচুমাচু করে' বললে, 'বাবু আসেন নি।'

কী করে' কাটাবে উমা একাকী এই মধ্যরাত্রি? ভয় আর নিরুপায় দুশ্চিন্তা, এ নিয়ে সে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পেট্রোম্যাক্সে আর তেল নেই, নিবে গেছে এতক্ষণে। জানলাগুলো খুলে রাখতেও ভয় হচ্ছে, অথচ বারে-বারে জানলা দিয়ে বাইরে না তাকালেও নয়! মশারিটা চাকর বিছানা পেতে কখন টাঙিয়ে রেখে গিয়েছিলো, সেটা সে ক্ষিপ্র হাতে তুলে ফেললো, কেমন তার দম আট্‌কে আসছে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে বসেছে কিনা তা কে জানে।

হঠাৎ বরেনের মনে পড়ে' গেলো উমা বলেছিলো, ঠিক কি, আমাকেই তুমি এসে হয়তো আর দেখতে পাবে না।

যদি সত্যি না পায়! কোথায় যাবে সে? কেন, যেখানে খুসি সে চলে' যেতে পারে। একা-একা? বেশ তো, আর কারু সঙ্গেই না হয় গেলো। আর কারু সঙ্গে! সে কে? তা কি জানি! এখানে থাকবেই বা কেন; কিসের প্রলোভনে, এই নিষ্ফল একাকীত্বের অরণ্যে। বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করো না, নইলে আঘাতটা প্রচণ্ডতরো হবে কি করে'? বেশ, নিজে থেকেই যদি না যায়, ধরো কারা দল বেঁধে মুখে

কাপড় গুঁজে নিয়েও তো যেতে পারে অনায়াসে! জোর করে’, ছিনিয়ে? মোকদ্দমায় যে যাই বলুক, হ্যাঁ, জোর করে’ই ধরো নিয়ে গেলো, বাধা কোথায়? যে অজ পাড়াগাঁয়ে আছ, যে কোনো রাতে ঘটে’ যেতে পারে, তার উপর আজকের মতো রাত! কাছাকাছি এমন প্রতিবেশীও নেই যে ছুটে আসবে, আর আসবেই বা কেন, নিজেকে বিপদে নিয়ে ফেলার চাইতে পরের কেলেঙ্কারিটা রসালো করে’ উপভোগ করায় বেশি রোমাঞ্চ। নিদেনপক্ষে ঘরে একটা চোরও আসতে পারে, হয়তো তার হাতের কঙ্কণ ধরে’ টান দিলো। চোর কি করে’ আসবে? চোর আবার কী করে’ আসে। হয়তো হাত ধরে’ টান দিতেই প্রবল আর্তনাদ করে’ সে মূর্চ্ছিত হ’য়ে পড়লো। চোরের তখন পাল তুলে পরিষ্কার বেয়ে যাওয়া। চাকর-ঠাকুর আছে কী করতে? ওরাই যে চুরি করতে নামবে না তার ঠিক কী! খবরের কাগজে পড়ো না চাকরের কীর্তি-কলাপ? অন্তত এমনি একটা অশরীরী ভয়ও তো পেতে পারে? মনে নেই যখন প্রথম এ-বাড়িতে ঢোকো, কেউ-কেউ বলেছিলো এটাতে ভূতের আমাগোনা আছে, ভাড়া কম বলে’ ইতিকথা গ্রাহ্য করো নি। কিন্তু ধরো আজ যদি তার আবির্ভাব হয়! ভূত—ভূত আবার আছে নাকি পৃথিবীতে? অন্তত মনে তো আছে। আশঙ্কাকুল মনে সে-মূর্তি কল্পনা করে’ নিতে কতক্ষণ? রজ্জুতেও তো সর্পভ্রম হয়—এবং সে-যন্ত্রণা দংশনের মতোই জ্বালান্তক হ’তে পারে। অত অপার্থিবতাই বা কেন? জানো, সে আত্মহত্যা করতে পারে? আত্মহত্যা? হ্যাঁ, সিলিঙের কড়ার সঙ্গে গলায় আঁচল বেঁধে। কিন্তু কেন সে আত্মহত্যা করতে যাবে, কোন দুঃখে? মানুষ বুঝি দুঃখেই আত্মহত্যা করে, তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি। আত্মহত্যা হচ্ছে মস্তিকের একটা ব্যাধি, সাময়িক উন্মত্ততা। তুমি আসছ না, দুপুরে তোমাকে নিয়ে হয়তো একটা

বীভৎস দুঃস্বপ্ন দেখেছে, ট্রেন ধরতে না পেলে অনায়াসে তুমি একটা টেলিগ্রাম করে' দিতে পারতে যে রাতের ট্রেনে আসছ—তাই সে হঠাৎ চিন্তায় বিকল হ'য়ে পড়লো, মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলী কেমন-বা অবশ তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে এলো, গলায় দড়ি দেয়ার অনেক হাঙ্গাম দেখে বাথরুমে গিয়ে সে কণ্ঠনালীতে একটা ব্লেড বসালো। বরেন চীৎকার করে' উঠলো। কিন্তু বিকেলে তার করলে সেটা রাত্রিতে উমা পেতো না, পেতো পরদিন আটটার পরে, কেননা বিকেল পাঁচটার পর ওখানে টেলিগ্রাম বিলি হয় না। তা কি সে জানে? সাড়ে ন'টার ট্রেনে যারা এখানে ফিরেছে তাদের কাউকে দিয়েও তো সে একটা তাকে খবর পাঠাতে পারতো যে সে রাতের ট্রেনে আসছে। বা, তখন তো সে সাহেবের কুঠিতে। তা কি আর সে জানে? মনের কোথায় কি একটু অসামঞ্জস্য ঘটলেই লোকে অনায়াসে আত্মহত্যা করতে পারে, আর উমা তো নিতান্ত মেয়ে, সূক্ষ্ম কতোগুলি স্নায়ুর সমষ্টি। বাড়ি গিয়ে তাকে দেখতে পাও কিনা এবং দেখলে কী অবস্থায় দেখ তার কিছুই ঠিক নেই।

ষ্টেশনে নেমে দেখলো, চাপরাসিটা নিতে আসে নি। অন্ধকার একটা আতঙ্কে তার বুকের মধ্যটা শিউরে উঠলো। গাড়ি ছিলো দু'-একখানা, কিন্তু কাসেমের নয়। সব যেন কেমন তার অদ্ভুত, অস্বাভাবিক লাগছে। গাড়োয়ান তাকে চিনলো কিনা বোঝা গেলো না, চিনলে এমন কালো গম্ভীর মুখ করে' থাকাটা ঘোরতর সন্দেহের।

বাড়ির কাছাকাছি আসবার আগেই দূর থেকে সে দেখতে পেলো তার বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। এটা সাঙ্ঘাতিক অস্বাভাবিক—এত রাতে বাইরের ঘরে আলো জ্বলবে কেন? বাড়িতে ডাক্তার এলো নাকি, তবে কি সত্যিই শেষকালে উমা ব্লেড দিয়ে গলা কেটেছে? আরো এগিয়ে আসতেই দেখলো বাইরের ঘরের দরজাটা হাট করে'

খোলা। এটা আরো আশ্চর্য। যেখানে সমস্ত সহর ঘুমে অন্ধকার ও অন্ধকারে অবরুদ্ধ, সেখানে তার ঘরের দরজা খোলা আর সেখানে বেশ উচ্চ শিখায় আলো জ্বলছে! বরেনের হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো, বুকের ভিতরটা শূন্য লাগতে লাগলো, চোখে সে পথ খুঁজে পেলো না।

নিশি-পাওয়ার মতো বরেন নিঃশব্দে তার ঘরের রোয়াকে উঠে এলো, খোলা দরজার পাশ ঘেঁসে আস্তে মুখ বাড়ালে। দেখলে, টেবলের উপর হ্যারিকেন জ্বলছে ও পাশে ক্যানভাসের এক ইজি-চেয়ারে আধাবয়সী এক ভদ্রলোক চাদর দিয়ে গা-হাত-পা ঢেকে দিব্যি ঘুম যাচ্ছেন। বরেন আরো লক্ষ্য করে' দেখলো, এ-ঘর থেকে যে দুটো দরজা তাঁর অন্তঃপুরের দিকে মুখ করে' আছে তারা দুটোই সবল অর্গলাবদ্ধ। কিন্তু ব্যাপার কী!

বরেন সবেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। চেঁচিয়ে উঠলো: 'কে? কে আপনি?'

ভদ্রলোক ধড়মড় করে' জেগে উঠলেন, ঘুমে-জড়ানো ক্লান্ত গলায় বললেন, 'এই যে, আপনি, আপনি এসেছেন এতক্ষণে। বাবাঃ!' ভদ্রলোক দুই হাতে মশা তাড়াতে লাগলেন।

'কী চান আপনি এত রাত্রে?' বরেন ধমক দিয়ে উঠলো।

'এত রাত্রে নয়, এসেছি আমি বেলা দুটোয়। সেই বামুনখালি থেকে, নৌকায়। শুনলুম সদরে গেছেন, সাড়ে ন'টার গাড়িতে ফিরবেন। ন'টা থেকে ঠায় এই বসে' আছি। ভাবলুম জরুরি দেখাটা আজই সেরে যেতে হবে।'

'এই কি আপনার দেখা করবার সময় নাকি?' বরেন উচ্চতর পরদায় আরোহণ করলে: 'ভদ্রলোকের বাড়িতে বাইরের ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাত সাড়ে-বারোটা পর্যন্ত বসে' থাকাটা কোন দিশি ভদ্রতা? জানেন আপনাকে আমি পুলিশে দিতে পারি?'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে গেলেন, চেয়ার থেকে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি আর বেশিক্ষণ বসবো না, মাত্র পাঁচ-মিনিটে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে পারবো। আমাদের সেই বামুনখালি ইউনিয়ানের—'

তখনো উমাকে সম্ভাষণ করা হয় নি, অর্গলাবদ্ধ ঘরের স্তব্ধতা তখনো অব্যাহত রয়েছে। তাই অস্থির, অসম্ভব অস্থির গলায় সে বললে, 'এখন আমার পাঁচ সেকেণ্ড সময়েরো অপব্যবহার করবার সময় নেই। যান, কাল ভোরে আসবেন, কিম্বা আর যে কোনোদিন আপনার খুসি।'

ভদ্রলোক আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

'আপনার তো বয়েস হয়েছে, এতদিনে কাণ্ডজ্ঞান একটা হয়েছে বলে'ও তো আশা করা যায়। সটান গাড়ি থেকে নেমেই, বিশ্রাম পর্যন্ত না করে', দুপুর-রাতে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে আপনার বক্তব্য শুনবে এমন কাকে আপনি আশা করতে পারেন?'

এর অবিশ্যি উপযুক্ত জবাব নেই, ভদ্রলোক লাঠি ভর দিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিকে চেয়ে দেখবারো বরেনের অবকাশ নেই।

বন্ধ দরজায় সবেগে সে ঘন-ঘন ঘা মারতে লাগলো: 'উমা, উমা!'

ঝি উঠে দরজা খুলে দিলো।

ঘরে সেই স্বাভাবিক শান্তি বিরাজ করছে, আবহাওয়ায় কোথাও একটু আঁচড় পড়ে নি। ঝি নিচে শুয়েছিলো, বরেনকে দেখেই অন্তর্ধান করেছে অন্তরালে, 'খাটের উপর পরিপাটি বিছানা করে' উমা রয়েছে ঘুমিয়ে, আলো জ্বলছে নিচে, নেটের মশারির মধ্যে থেকে তাকে দেখাচ্ছে ঠিক এখন রূপকথার রাজকুমারীর মতো।

বরেন ডাকলো : 'উমা !'

উমা চোখ মেললো, নির্লিপ্ত গলায় বললে, 'এসেছ ?'

'হ্যাঁ। কেমন আছ, উমা ?'

'কেমন আবার থাকবো ?' মশারির বাইরে মুখ নিয়ে এসে স্নিগ্ধহাস্তে বললে, 'ভালো আছি।'

'আমার জন্যে খুব ব্যস্ত হও নি তো ?'

'বিশেষ নয়। সাড়ে ন'টায় যখন আস নি, ভাবলুম বারোটার ফ্লায়ারে আসবে। চেহারার এ কী ছিরি করেছ ?'

'আর বোলো না সে-কথা। একেবারে হায়রানি করে' মেরেছে।' বরেন খাটের শিয়রের কাছে একটা চেয়ারে বসে' পড়লো।

বালিসে চিবুক ডুবিয়ে উমা উপুড় হয়ে শুয়ে অনুচ্চ গলায় জিগগেস করলো : 'বাইরের ঘরে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'লো ? কে উনি ?'

জুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে বরেন বললে, 'কে জানে, কোনো ইউনিয়ানবোর্ডের মেম্বার-টেম্বার হবে বোধ হয়। কতই তো আসছে হরদম।'

'কেন, তোমার সঙ্গে আলাপ হ'লো না ?'

'হ'লো বৈ কি।'

'কতক্ষণ এসেছ তা হ'লে ?'

'এই মিনিট দুই।'

'বলো কি, এরি মধ্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেলো, দুপুর দুটোয় যিনি এসেছেন, বিকেলে যিনি এসে তোমার খোঁজ নিয়ে গেলেন, আর সাড়ে-ন'টায় ফিরবে বলে' যিনি ন'টা থেকে তীর্থকাকের মতো বসে' ছিলেন এখানে ?'

'কেন, কে উনি ?' বরেন সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করলে।

'সে কি ? নামটাও তাঁর জিগগেস করো নি নাকি ?' বিস্ময়ে উমার সমস্ত মুখ সাদা হ'য়ে গেলো।

'কেন, নামে তাঁর কোনো বিশেষত্ব আছে নাকি ?'

'আছে। নাম তাঁর নিশিকান্ত সারখেল।'

'কি বল্‌লে, নিশিকান্ত ? সারখেল ?' বরেন স্মৃতির অন্ধকার ঘাঁটতে লাগলো : 'হ্যাঁ, ভয়ানক চেনা মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে কি গো ?' উমা উঠে বসলো উত্তেজনায় : 'তুমি তাঁকে দস্তুরমতো আজ এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছ—বিকেল পাঁচটায়। এই দেখ সেই চিঠি।' বালিসের তলা থেকে উমা সেই চিঠি বার করে' দেখালো।

'হ্যাঁ, এই চিঠি বটে।' বরেন আদ্যোপান্ত আবার পড়লে : 'তুমি এ পেলে কি করে' ?'

'বোনাফাইডিস্ সপ্রমাণ করবার জন্যে ভদ্রলোক এই চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবেই তাঁকে বাইরের ঘরে অবারিত আশ্রয় দিয়েছি। কি, এইবার মনে পড়লো ?'

'হ্যাঁ, দিন পনেরো আগে এটা লিখেছিলাম। মাঝখানে একদম মনে ছিলো না।'

'কে এই নিশিকান্ত ?'

'একজন গ্রাম্য তালুকদার। সম্প্রতি কতগুলি স্থানীয় অত্যাচারে পীড়িত হ'য়ে আমার কাছে কতগুলি নালিশ করেছিলেন। আমি কিছু তার প্রতিকার করতে পারি কি না দেখবার জন্যে তাঁকে আজ লিখেছিলাম আসতে।'

'সেটা তোমার কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ঘটনা,' উমা তার কণ্ঠস্বরে একটু বিদ্রূপ মেশালো : 'তাই তারিখটাকে তুমি অনায়াসে

ভুলে যেতে দিয়েছিলে। কিন্তু এই একটু আশ্বাসের আভাস পেয়ে বাতগ্রস্ত ভদ্রলোক কী অমানুষিক কষ্ট করেছেন তার তুমি কিছু খবর রাখো? সমস্ত দিন আজ তাঁর স্নানাহার হয় নি, বাড়িতে বড়ো ছেলেটির তাঁর টাইফয়েড, অবস্থা ভালো নয়, তবু তোমার চিঠির সম্মান রাখতে সমস্ত বিপদ ও কষ্ট তিনি অস্বীকার করেছেন। তুমি তাঁকে কী বললে?'

'বললুম, রাত দুপুর পর্যন্ত কারুর বাড়িতে প্রতীক্ষা করে' বসে' থাকাটা ভদ্রতা নয়।'

'চলে' গেলেন তারপর?'

'তাড়িয়ে দিলে লোকে আর কী করতে পারে?' বরেন উঠে পড়লো চেয়ার ছেড়ে: 'নাও, নাও, ওঠো, খেতে দাও, খিদেয় আর ঘুমে আমার সমস্ত শরীর ছিঁড়ে পড়ছে। অপরিচিত আগন্তুকের কথা না ভেবে এবার তোমার নিজের স্বামীটির দিকে তাকাও।'

# উপান্ত

কোলকাতার বৃষ্টির একটা আলাদা চেহারা আছে। সব যেন হঠাৎ কেমন নিরানন্দ, নিরর্থক মনে হয়।

ট্র্যামে করে' ধর্মতলা যাচ্ছিলুম, সকালবেলা। মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের কাছে এসে দাঁড়াতে দেখলুম, সেটা আর এমন কী দেখবার, পিছল ফুটপাতে জুতোটা হঠাৎ হড়্‌কে যাওয়াতে বুড়ো-মতন একটি ভদ্রলোক, গায়ে তাঁর গলাবন্ধ জিনের একটা কোট, পায়ে কেড্‌স্, ও-দুটো বস্তুর কোনটাতেই লেশমাত্র শুভ্রতা নেই—কাদা-জল ঘেঁটে মাটি থেকে তাঁর হাতের বাজারটা একেক করে' কুড়িয়ে নিচ্ছেন, ক'টি কাঁচকলা, ক'টি যজ্ঞিডুমুর, ক'টি উচ্ছে, ক'টি গাঁদালপাতা। ঘড়িতে চেয়ে দেখলুম, সাড়ে ন'টা প্রায় বাজে, ভদ্রলোক কখনই বা বাড়ি যাবে, কখনই বা আপিস দৌড়ুবে। হঠাৎ খেয়াল হ'লো সেটা এম্পারার্‌স্ বার্থ-ডে'র ছুটি, আপিস-আদালত বন্ধ। যেন খানিকটা আরাম পেলুম, ভদ্রলোককে জিনিসগুলি আস্তে-আস্তে দিলুম কুড়িয়ে নিতে। ট্র্যামটা ছেড়ে দিলো। বিচিত্রবিস্তীর্ণ রাজধানীতে সেটা আর কিছু মনে করে' রাখবার জিনিস নয়।

রাজধানীতে নয়, কিন্তু আমাদের এই মফস্বলে সেটা প্রায় চোখ কপালে তুলে দেখবার জিনিস।

কিছুকাল মফস্বলে ছেড়ে বাইরে ছিলুম, অর্থাৎ কোলকাতায়, মাকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে। কাল রাত্রেই আমার ফিরে যাবার কথা।

এমন নয় যে আমি না থাকার দরুন আদালতের সমস্ত মোকদ্দমা এক ডাকে খারিজ হ'য়ে যাচ্ছে বা ডিক্রিজারিতে ক্রোকী পরোয়ানা বেরুতে পাচ্ছে না। কিন্তু মাসখানেকেরো বেশি বাড়িছাড়া, কার বিরুদ্ধে কী ঘোঁট পাকলো, কোন বাড়িতে কী স্ক্যাণ্ডেল উঠলো, নতুন 'আর-কে মিসট্রেস এলো গার্ল-স্কুলে, কিছুরই কোনো খবর রাখি না। তারপর খেলার মাঠ, নদীর পাড়, নরেশ পাট্টাদারের দোকান, গেজেটেড অফিসারদের ক্লাব, সমস্ত কিছুর থেকেই বঞ্চিত, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছি। কতক্ষণে নিজের জুতোতে গিয়ে পা সেঁধোব তারি জন্য আইঢাই করছিলুম, তাই ট্রেনে এসে উঠতেই গায়ে যেন বাতাস দিলো।

খানিকটা কৌতুকের সঙ্গে চমকে উঠলুম, যখন দেখলুম মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিটের সেই ভদ্রলোক আমারই গাড়িতে এসে উঠেছেন, একশো এগারো নম্বর গাড়িতে। চিনতে পারতুম না যদি না তাঁর গায়ে সেই গলাবন্ধ কোট থাকতো ও বর্ষার দিনেও পায়ে থাকতো কেড্‌স্, ডালা-ভাঙা একটা সুটকেস, নারকোলের দড়ি দিয়ে বাঁধা, পেট-মোটা এলামেলের একটা কুঁজো, ভিজে একখানা গামছা, আর খেরোর একটা বালিশ, অড়টা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পারেনি। কাপড়ের ঝুলটা যেখানে এসে ঠেকেছে সেখানটাকে আমরা হাঁটু বলি। বেঞ্চির উপর দেয়ালের ধারে মোটা একগাছ লাঠি শোয়ানো, সমস্ত কিছুর কাছে ঐটেই যেন কেমন অসঙ্গত, একটু বা অসাধারণ লাগছে।

ভিজে গামছা দিয়ে ঘাড় ও মাথা মুছে ভদ্রলোক জিগগেস করলেন, কোথায় যাচ্ছি।

জায়গাটার নাম করলুম। ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। কেমন ফ্যাকাসে মুখ করে' আমার দিকে খানিক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

বললেন, 'রাত্তিরে ঘোড়ার গাড়ি দু'এক আনা সস্তায় যায়, না?'

'তা যায় মাঝে-মাঝে। এ ট্রেনে বিশেষ প্যাসেঞ্জার থাকে না কিনা। তা, আপনি কোন পাড়ায় যাবেন?'

তার আগে, আমি কী করি সেটা জিগগেস করে নেয়া ভদ্রলোকের সমীচীন মনে হ'লো। বলতে লজ্জা করে, কথাটা বলতেই যেন কেমন শোনায় আমি কিছু লেখাপড়া করিনি, আমার পয়সা-কড়ি কিছু নেই, আমি নিতান্তই অপদার্থ—তবু সাহস করে' বললুম, 'ওকালতি।'

আগে যদি বা ভদ্রলোকের মুখ ফ্যাকাসে ছিলো, এখন একেবারে শুকিয়ে চুপসে কালো হ'য়ে গেলো। কুঁজোর মুখ থেকে গ্লাস বার করে' এক গলা জল খেলেন। নির্লিপ্ত হ'য়ে বাইরের দিকে এমন ভাবে চেয়ে রইলেন যেন উকিলের মতো দুর্জন সংসারে আর দু'জন হ'তে নেই।

আমিও জিগগেস করতে পারতুম ওঁরই বা কাজের কী নমুনা। কিন্তু জবাবে যদি উনি বলে' বসেন, আমি একজন উকিলের মুহুরি, তখন, বলতে কি, আমারই অত্যন্ত লজ্জা করবে।

গাড়ি ছাড়তেই ভদ্রলোক ল্যাভেটরি থেকে ঘুরে এলেন ও পরমুহূর্তেই তাঁর আবার প্রচণ্ড পিপাসা পেলো। বললেন, 'বয়েল্‌ড্‌ ওয়াটার, খাবেন একটু?'

বললুম, 'তেষ্টা পায়নি।'

'তেষ্টা না পেলেও খাওয়া উচিত। যত পারবেন খালি জল খাবেন। জল খেলে শরীর ভারি স্নিগ্ধ, ভারি ঠাণ্ডা থাকে। আর আমারই খুব তেষ্টা পাচ্ছে মনে করছেন নাকি? ও একটা অভ্যাস, হ্যাবিট।'

গাড়িতে বেশি লোক ছিলো না, এ-লাইনে একটা য়্যাক্‌সিডেন্ট হ'য়ে যাবার পর থেকে ইঞ্জিনের পিছনের গাড়িটা একদম প্রায় খালিই থাকে। তাই শোবার জায়গার ভাবনা ছিলো না। ভদ্রলোক তারি আয়োজন করতে লাগলেন। সুটকেস থেকে একটা সুজনি বেরুলো,

আর উপাধান হিসাবে কেবল বালিসটাকেই ব্যবহার করলেন না, সুটকেসটাকেও শিরোধার্য করলেন। বললেন, 'নিচু বালিসে আমি শুতে পারি না।'

কিন্তু শুলেই আর মানুষের ঘুম আসে না। তাই ভদ্রলোক একসময় উঠে বসে' দারুণ বিরক্ত মুখে জিগগেস করলেন, যেন আমারই ভীষণ দোষ, কেন না, এ ট্রেন আমারই দেশে যাচ্ছে : 'আচ্ছা মশাই, গাড়ি চলছে, তবু গাড়ির মধ্যে এত মশা কেন বলতে পারেন ?'

'সাইডিংএ কোন জঙ্গলের ধারে পড়ে' ছিলো, টেনে এনে জুড়ে দিয়েছে।'

'দেখুন দিকি কী কাণ্ড! এমন জানলে এক শিশি তেল নিয়ে আসতুম যে।'

'তেল ?'

'হাতে পায়ে মেখে নিতুম ভালো করে', কামড়াতে পারতো না। শেষকালে কি ম্যালেরিয়ায় মারা যাবো নাকি ?' বলে' ভদ্রলোক নিচে চলে' গিয়ে সুজনিটাকে আদ্যোপান্ত উপরে তুলে দিলেন।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছে ভদ্রলোকের জন্যে আর অপেক্ষা করলুম না, একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি আসতেই টের পেলুম পেছনে খট-খট করে' আরেকটা গাড়ি আসছে। সেটা এসে দাঁড়ালো আমাদেরই পাশের বাড়িতে। আর, কাউকে বলে' দিতে হ'বে না, সে-গাড়ি থেকে নামলেন সেই ভদ্রলোক, সুজনি গায়ে দিয়ে।

নিচে আমার খুড়তুতো ভাই শুতো, সে উঠে দরজা খুলে দিলো।

জিগগেস করলুম : 'পাশের বাড়িতে কারা এসেছে রে ?'

খুড়তুতো ভাই যখন পরিচয় দিলো, তখন সহস্র রসনায় নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উঠলুম : এ আমি করেছি কী ?

## ডবল্ ডেকার

অন্তত দু'টো জিনিস আমার করা উচিত ছিলো। প্রথমতো বাঁধা-রেট্ থেকে দু'-এক আনা সস্তা করে' তাঁকে একটা গাড়ি ঠিক করে' দেয়া; দ্বিতীয়তো কোনো ষ্টেশনে নেমে ষ্টেশন-মাষ্টারের থেকে চেয়ে এক শিশি তেল জোগানো।

শুনলুম পীতাম্বরবাবু এখানকার নতুন সবজজ। মাসখানেক হ'লো এসেছেন।

তেলের পরিমাণ এক শিশি থেকে মনে-মনে এক পিপেতে নিয়ে গেলুম। আর, গাড়ির যদি তাঁর দরকার, ইচ্ছে করলে আমিই তো তাঁর বাহন হ'তে পারি।

সকালবেলাই তাঁকে গিয়ে প্রণাম করলুম, যদি বার-লাইব্রেরিতে গিয়ে না গল্প করেন তবে বলতে পারি, একেবারে তাঁর পা ছুঁয়ে। পা ছুঁয়ে, কেন না পায়ে তখন তাঁর খড়ম ছিলো। বললুম, 'কালকে ট্রেনে আপনাকে চিনতে পারিনি।'

'চিনতে না পেরে ভালোই করেছিলে হে!' পীতাম্বরবাবু হাসলেন: একটু ইনকগ্নিটো আসছিলুম। কোলকাতাটা কাছে হ'য়ে হয়েছে বিপদ, ছুটি পেলেই ছুটতে হয়। বোনটা পড়েছে অপাত্রে, একটু দেখে-শুনে দিয়ে-থুয়ে না এলে আর চলে না। এর চেয়ে দূরে কোথাও হ'লতো, মনকে চোখ ঠারতে পারতুম, চোখের ওপর তো কিছু দেখছি না। বোসো হে, বোসো, তোমাকে তুমি বলছি বলে' কিছু মনে কোরো না। পাশের বাড়িতে থাকো, তুমি আমার ছোট ভাইর মতো।'

দেখলুম ভদ্রলোকের ভিতরটাতে স্বাদ আছে। আদালতের দু'খানি চেয়ার ও একখানি টেবিলে তাঁর বসবার ঘর। দেয়ালে আমলা-আর্দালি-পরিবৃত পুরোনো দিনের কয়েকখানি ফোটো, প্রুফের-কাগজে-ছাপা বাঙলা একখানা ক্যালেণ্ডার, যাতে একাদশী পূর্ণিমা চাঁদের ছবি এঁকে

বোঝানো আছে। আর রাশীকৃত ঝুল, মাকড়সার জাল, চড়ুই পাখির বাসা।

বললুম, 'এ-বাড়িতে আগে ইলেকট্রিক কানেকসান ছিলো না ?'

'কাট অফ করে' দিয়েছি। ও-আলো আমার বড্ড চোখে লাগে। তা ছাড়া রাত্তিরে আমি কোনো কাজ করি না। কিন্তু, ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে আমাকে একটা খুব ভালো দেখে ধোপা জোগাড় করে' দিতে পারো ?'

'কেন, পান নি ধোপা ?'

'ব্যাটাছেলেরা সাড়ে তিন টাকার কম কিছুতেই শ' নেবে না।'

অন্যায়রূপে ন্যায় বলে'ই মনে হচ্ছিলো, কিন্তু বললুম, 'বলেন কী ?'

'আগে যেখানে ছিলুম তিনটাকা ছ' আনা ছিলো, তা-ও রুমাল গেঞ্জি মোজা বালিসের অড় সব ফাউ নিতো। এখানে এসে আমি কি গুণগার দেবো নাকি ?'

'না, আমি দেবো জোগাড় করে।'

'আর ছাখ, একটা মাষ্টার। ছোট ছেলে-মেয়ে ছুটোকে একটু পড়াবে। ছু' টাকা ছু' টাকা, চার টাকাই যথেষ্ট, কি বলো ?'

'ঢের।'

'আর শোনো, ছু'খানা আমাকে তক্তপোস জোগাড় করে' দিতে পারো ? দোতলা বাড়ি, ভেবেছিলুম মেঝেতেই শোয়া যাবে। কিন্তু গৃহিণীর শুনছি কোমরে বাত নেমেছে।'

লক্ষ্য করে' দেখলুম প্রশ্নটা জোগাড় করা, ক্রয় করা নয়। তবু সোৎসাহে বলে' উঠলুম : 'অনায়াসে।'

বলতে কি, প্রতিবেশিতার সুযোগ নিয়ে পীতাম্বরবাবুর সঙ্গে মিশে গেলুম। আমাকেও তাঁর প্রয়োজন ছিলো, সাংসারিক অর্থে, অর্থাৎ কোথায় কী জিনিস পাওয়া যায়, অর্থাৎ কোথায় কি জিনিস সস্তায়

পাওয়া যায় তাই আমাকে অহর্নিশ সন্ধান দিতে হ'তো। চার পয়সার পাঁউরুটি তিন পয়সায় কিনতে না পেলে তাঁর চা-ই খাওয়া হ'তো না। মনিহারি কোনো জিনিসই তিনি কিনতেন না এখানে, কেননা কোলকাতার চেয়ে দাম বেশি।' দু'পয়সা দিয়ে দৈনিক একখানা বসুমতী কিনতেন, বলতেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়ি এমন সময় কোথায়? হপ্তায় দু'দিন করে' তাঁর নাপিত বরাদ্দ ছিলো, পাইকিরি হিসেবে মাসে চার আনা—এইটেই তাঁর প্রকাণ্ড অপব্যয়, কেননা একবার দাড়ি রাখবার জন্যে কোন জজ তাঁকে মৌলবিসাহেব বলে' ভুল করেছিলেন বলে' তাঁকে এই উৎপাত মেনে নিতে হয়েছে। গায়ে মাখবার সাবানের বদলে সংসারে তাঁর বেসন চলতো, ঘরের ফতুয়াটাকেই তিনি বাইরের সার্টে আশ্চর্য রূপান্তরিত করতে পারতেন। দু'বেলা গুনে' দু'টি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠিতে তাঁর রান্না আর আলো জ্বালানো, কেননা তাঁর মতে এক কণিকা আগুন ও এক অতিকায় লঙ্কাকাণ্ডে কিছুমাত্র তফাৎ নেই। সম্প্রতি আদেশ হয়েছে কিছু তাঁকে ঘিকচ ধানের মুড়ি জোগাড় করে' দিতে হ'বে, ঢাকায় তিনি যা খেতেন।

জুনিয়ার উকিল, আপিল-আদালতে আমার গতিবিধি ছিলো না, তাই পীতাম্বরবাবু আমার সঙ্গে নিরাপদে মিশতে পারতেন। কিন্তু দুষ্ট লোক, মানে যারা আমার প্রতিপক্ষ, কানাঘুসো করতো, আমার উদ্দেশ্য নাকি একটা রিসিভারি, কিম্বা একটা কমিশন, বড়ো জোর একটা গার্জিয়ানি। নিদেনপক্ষে মক্কেল দেখিয়ে বেড়ানো, আমি একটা কে। তাই নাকি আমি ওঁর বর্তমানতম দু' বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আদর করি, রুমাল দিয়ে নাকের সিকনি মুছে দিই।

সেদিন কোর্টে যাবার পথে রাস্তায় ওঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো, ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছেন।

যদি বলি, প্রথমেই মনে হ'লো চাঁদা করে' ওঁকে একটা ছাতা কিনে দি, তবে নিশ্চয়ই আমাকে বেয়াদব মনে করবেন। কিন্তু যা থাকে কপালে, কনটেম্প্‌ট্‌-এর ভয় না করে' বলে' ফেললুম, 'কেড্‌স্‌ পরে' কোর্টে যাচ্ছেন ?'

উনি হেসে উঠলেন, ভোলানাথের মতো। বললেন, 'নিচেটা কে দেখতে আসছে ? ওপরের দিকেই যতো জাব্বা-জোব্বা হয়েছে, নিচেটা একেবারে ফাঁকা, স্বাধীন। এই ত্মাখ, মোজা পর্যন্ত পরি না। ব্লাড-প্রেসারের রুগি, শেষকালে কি মাথার শির ছিঁড়ে মরে' যাবো ?'

'তবু একটা সু হ'লে—'

'আজকালকার ছেলে কেবল মলাট চিনেছ, বইয়ের ভেতরটা আর পড়তে চাও না। চামড়ার জুতোর ঘসা লেগে পায়ে কি শেষকালে কার্বাঙ্কল হবে ?'

'কিন্তু এতটা রাস্তা, আপনার একটা গাড়ি করা উচিত।'

'খাওয়ার পর না হেঁটেই তো বাঙালি ছেলেদের ডিসপেপসিয়া হচ্ছে।'

'কিন্তু কী চড়া রোদ দেখছেন !'

'ইস, এইটুকু বয়সেই যে একেবারে ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছো যাচ্ছ। বলি, কামাচ্ছ কত আজকাল ?'

হেসে উঠলুম। বললুম, 'আপনার গাড়ি হ'লে চড়তে পেতুম মাঝে-মাঝে। কাজকর্ম নেই, খামোকা এতটা পথ রোজ-রোজ হেঁটে যেতে আর পা সরে না।'

উনি চারপাশে একটু তাকিয়ে নিয়ে অন্তরঙ্গের মতো, খানিকটা নিম্নস্বরে বললেন, 'আরে ভাই, সেই তো হয়েছে মুস্কিল। আগে যেখানে ছিলুম, সবাই এক পাড়াতেই ছিলুম, সেয়ারে গাড়ি মিলতো। এখন একজন এখানে, আর একজন ওইখানে।'

কালীবাড়ির সংস্কার হচ্ছিলো। হিন্দুসভার চাঁই দু'জন উকিল পীতাম্বরবাবুর কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিলেন।

পীতাম্বরবাবু ধম্‌কে উঠলেন: 'আপনাদের কালীবাড়ী, তা আমার কি!

একজন বললে, 'আপনি তো হিন্দু!'

'তা অন্য জাত যখন নয়, তখন হিন্দুই বলতে হবে বৈ কি।'

'সেই দিক থেকে—'

'আর এই দিকে আমার দেশের বাড়িটা যে বেমেরামত হয়ে পড়ে' আছে তার আপনারা কী করছেন? আপনাদের কালীবাড়ি, আপনারা বুঝবেন। আমরা বিদেশী লোক, এতে আমাদের টানাটানি কেন?'

এর ক'দিন পরে আমি দলবল নিয়ে চাঁদার খাতা নিয়ে ওঁর দ্বারস্থ হলুম। বললুম, 'এদেরকে আপনি ফেরাতে পারবেন না। এ দু'জন সাইক্লে করে' ইণ্ডিয়া টুর করতে যাচ্ছে, চাঁদা চাই।'

আমিই পুরোভাগে ছিলুম বলে' হয়তো উনি সরাসরি তাড়াতে পারলেন না। কী একটা অবিবেচনার কাজ করেছি এমনি ভাব দেখিয়ে বললেন, 'আজকে মাসের কত তারিখ তা খেয়াল আছে?'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললুম, 'সাতুই।'

'উকিলের কী! সাতুই যা, সাতাশেও তাই। কিন্তু আমরা যারা বাঁধা মাইনে পাই সাত তারিখে তাদের কী থাকে শুনি!'

'যায় কোথায়?' মুচকে একটু হাসলুম।

'যেখানে যাবার, সেখানেই যায়। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, বাজার-খরচ ছাড়া এক পয়সাও নেই।'

না-থাকাটাকেও যে এমন সহজে বলা যায় দলের কেউ তার রসাস্বাদ করতে পারলো না। রাস্তায় বেরিয়ে এসে একজন বললে, 'হাড়-কৃপণ।'

অথচ সেইটে চারিত্রিক অর্থে কোনই দোষ নয়, বরং সামাজিক অর্থে মহাগুণ। একদল যেমন তাঁর নাম শুনে অন্ত ভক্ষ্যঃ ধনুর্গুণেরো সম্ভাবনা রাখতো না তেমনি আরেকদল তাঁর মাঝে একজন নিরহঙ্কার, নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর সন্ধান পেতো। সমতল জীবন ও উত্তুঙ্গ চিন্তার তিনি পরাকাষ্ঠা। আইন কখনোই প্রগলভ নয়, আইন গভীর। আর যা ন্যায়, তা প্রচারে নয়, উপলব্ধিতে। বলা বাহুল্য, আমি ছিলুম শেষের দলে, যদিও আজ পর্যন্ত একটাও গার্জিয়ানি পাইনি।

একদিন বললুম তাই মুখ ফুটে।

'উপায় নেই, ভাই।' উনি কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে যখন মেলামেশা আছে তখন তোমারই পক্ষে আমাকে বেশি করে' অপক্ষপাতী হ'তে হবে।'

দল বদলাবো কিনা ভাবছিলুম, একদিন তিনি চুপি-চুপি আমাকে জিগগেস করলেন, 'একটি পাত্র জোগাড় করে' দিতে পারো?'

পীতাম্বরবাবু সমস্ত জীবন ধরে' ইস্যু ধার্য করেছেন, দু'বছরের যে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আমি আদর করি সেটি তাঁর একাদশতম। তাই ভিড়ের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে বললুম, 'কার?'

'আমার তৃতীয় মেয়ের। এই সতেরোয় পা দিলো। আর বলো কেন, ভাবিয়ে তুলেছে।'

একটু কেমন মজা পেলুম। বললুম, 'টাকা দেবেন তো?'

'সেই তো হয়েছে বিপদ। যে মাছ তুমি চৌদ্দ পয়সায় পাও, সেই মাছই আমার বেলায় চৌদ্দ আনা দাম হাঁকে।' উনি আমার দিকে করুণ করে' তাকালেন: 'তোমরা আজকালকার ছেলে, তোমরাও যদি পেলফের কথা বলো তো দেশ দাঁড়ায় কোথায়?'

'আজকালকার ছেলেদেরই তো টাকার বেশি দরকার।'

'তা দিতে হবে বৈকি, কিন্তু কাকে দিই ?'

সেইদিন পীতাম্বরবাবুর বাড়িতে প্রথম চা খেলুম। আর পেয়ালা নিয়ে যে ঘরে এলো সে মেয়ে। চকিতে চেয়ে দেখলুম স্নেহাধিক্যে পীতাম্বরবাবু তাঁর বয়েসটা একটু কমিয়ে বলেছেন। দেখলুম পীতাম্বরবাবুকে ছাতা কিনে দেবার আগে এ মেয়েটিকেই একখানা শাড়ি কিনে দেয়া উচিত। জানি, এ মেয়ে-দেখানো নয়, তবু এ তো তাঁর মেয়েকেই দেখানো। সাধারণ দৈনন্দিন গৃহচর্যায় মেয়েরা আর কেউ পেখম মেলে থাকে না, কিন্তু তাই বলে' এমন ময়লা মোটা সেমিজ পরে' থাকে এ বললে কল্পনার উপরে উৎপীড়ন করা হবে।

মেয়েটি আমাকে সহজে নিশ্বাস ফেলতে দিলে, নিশ্বাসপতনের আগেই দ্রুত অন্তর্ধান করে'। চা-টাও যে কালো হবে তাতে বিস্ময় ছিলো না, তবু পেয়ালার কিনারে ধীরে ঠোঁট নামিয়ে এনে বললুম, 'ইস্কুল শেষ হয়েছে ?'

পীতাম্বরবাবু এমন ভাবে তাকালেন যেন তাঁর মাথায় বাড়ি দিয়েছি।

বললেন, 'পাগল হয়েছ ! আবার ইস্কুল !'

কোথায় তাঁকে বিঁধছে বোঝবার জন্যে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

'দ্বিতীয় মেয়েটা ভারি ব্রাইট ছিলো, বি-এ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলুম, ফ্রি-লাভ করতে চাইলো, বাধা দিলুম না। শেষকালে বিয়ে বসলো গিয়ে একটা পাঞ্জাবীর সঙ্গে। আখেরে লাভ হলো কী? পৃথিবীতে আরো কয়েকটা মোটর-ড্রাইভারের সংখ্যা বাড়লো, উনি টি-বি স্যানাটোরিয়ামে স্থানান্তরিত হলেন, আর আমি প্রতি মাসে তার জের টেনে-টেনে ক্ষয় হ'য়ে গেলুম। বাজারের হিসেবটা একটু রাখতে পারে, স্বামীকে দুটো মামুলি চিঠি লিখতে পারে, আত্মহত্যা করতে হ'লে লিখে যেতে পারে, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়, তা হ'লেই যথেষ্ট।'

বললুম, 'লেখাপড়ার জৌলুস একটু না থাকলে চাকুরে ছেলেদের যে আজকাল মন ওঠে না। স্ত্রী-জিনিসটা ক্রমশই আজকাল বাইরেকার উপকরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ যেমন আমার মোটর, এ যেমন আমার ড্রয়িং-রুম, তেমনি এ আমার স্ত্রী!'

'রেখে দাও তোমার চাকুরে ছেলে। বড়ো মেয়েটাকে দিয়েছিলুম না একটা ইঞ্জিনিয়ারের হাতে! কী লাভ হ'লো? ব্রিজের ওপর থেকে পড়ে' গিয়ে ছাতু হ'য়ে গেলো। কতগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বড়ো মেয়ে এখানে এসে ১৪৪-আর্টিকেলে প্রায় তামাদি হ'তে বসেছেন।' বলে' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেললেন।

বললুম 'একটা আপিল ডিসমিস করে' আরেকটা আপিল আপনি এলাউ করেন না? তেমনি একজন বিগড়েছে বলে' আরেকজনকেও আপনি বিগড়ে দেবেন?'

মেয়েটিকে যদি না দেখতুম তবে নিশ্চয়ই তার পক্ষ নিতে পারতুম না। বিবেচনা করে' দেখলুম পরনের সাড়িটা মোটা ও অপরিচ্ছন্ন হ'লেই কোনো-কোনো মেয়েকে বুঝি ভারি সুন্দর দেখায়।

'কেবল বাজে-খরচ। ছেলের জন্যে হ'লে বরং ইনভেসটমেণ্ট বলতে পারো।'

'আপনার বড়ো ছেলে নেই?'

'আছে বৈ কি। ঐ জ্যোৎস্নারই ঠিক ওপরে।'

'কী করে?'

'ফিল্‌ম্‌। মাঝে-মাঝে এখানে যে আসে টের পাও না?'

'কই, দেখি নি তো।'

'রাতের ট্রেনে আসে, ভোরের ট্রেনে চলে' যায়। মনি-অর্ডার যেতে দেরি হ'লেই চলে' আসে, এবং যে-মূর্তি ধরে' আসে, তক্ষুনি-তক্ষুনি তাকে

টাকা না ফেলে দিয়ে উপায় নেই। মানের চেয়ে টাকা তো আর বড়ো নয়।' বলে' উনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করলেন। বললেন, 'এখন কেবল একদৃষ্টে বিলেতের দিকে চেয়ে আছি।'

'সেখানে কে?'

'আমার ছোট ভাই, মা এইটুকু রেখে মারা গিয়েছিলেন। কোলে-পিঠে করে' মানুষ করেছি। আর সে একটা মানুষের মতো মানুষ হ'য়ে উঠেছে। ম্যাট্রিক থেকে বি-এ পর্যন্ত ফার্স্ট, বিলেতে পাঠিয়েছি আই-সি-এস হ'য়ে আসতে। হয়তো শেষ পর্যন্ত ওর জজিয়তিতে চাকরি করতে পাবো না, কিন্তু থাক্।'

এতক্ষণ পরে, লক্ষ্য করে' দেখলুম চোখ তাঁর সজল হ'য়ে উঠেছে। কথাটাকে চাপা দিয়ে পুরোনো কথায় ফিরে গিয়ে বললেন, 'কুড়িয়ে-কাচিয়ে কিছু টাকা দেবো, মেয়েটাকে চালান দিতে পারলে বাঁচি।'

হাসলুম। বললুম, 'কুড়িয়ে-কাচিয়ে কেন, নাড়া দিলেই তো ঝরঝরিয়ে ঝরে' পড়বে।'

'তোমাদের এই সব মফস্বলের লোন-কোম্পানিরা কিছু তার রেখেছে নাকি? জীবনের সমস্ত পুঁজি-পাটা লোপাট করে' দিয়েছে।'

অন্যের অর্থনাশে দরিদ্র আমরা মনে-মনে খুসি হই: আমি নাই বা ধনী হলুম, কিন্তু ধনী আমার দরিদ্রতার সমতলে নেমে আসুক এই আমাদের মনোবাঞ্ছা। তাই সেদিন যখন শুনলুম তিনি নিম্ন-আদালতের দিকে যাচ্ছেন সবাইর চাঁদার হার সমান করতে, তখন তাঁর প্রতি ঘৃণা না হ'য়ে করুণা হ'লো।

বললুম, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'ও-পাড়া।'

'এই বৃষ্টিতে?'

'আর বলো না! কোথায় কী পার্টি-ফার্টি হ'বে, তাই আমাদের দিতে হ'বে চাঁদা। ওরা পাছে না বেশি দিয়ে ফেলে, তারি একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। সব্বাইর সমান থাকলে কেউ কিছু বলতে পারবে না।'

ক্ষীণ প্রতিবাদ করে' বললুম, 'আপনি সিনিয়র, দিলেনই না-হয় কিছু বেশি।'

'ঐ তো তোমাদের দোষ, আয় দেখ, ব্যয় দেখ না। তোমার পাঁচ টাকা আছে, চার টাকা খরচ করলে; আমার পঞ্চাশ টাকা আছে, উনপঞ্চাশ টাকা খরচ করলুম, মোটমাট দাঁড়ালো কত? য়্যাকাউন্ট কমিশনটা কি তোমাকে সাধে দিই নি?' বলে' পীতাম্বরবাবু হেসে উঠলেন।

কিন্তু আমি হেসে উঠতে পারলুম না, যখন একদিন রাত্রে, যদিও সেটা শুক্লপক্ষ নয়, জ্যোৎস্না আমারই ঘরে এসে দাঁড়ালো। পাশের বাড়ি বলতে মফস্বলের বাড়ি, সেটা মনে রাখবেন, কেননা দু'বাড়ির মাঝখানে সেখানে শুধু একটা দেয়ালের ব্যবধান থাকে না, থাকে খানিকটা পোড়ো জমি, আগাছার ভিড় বা জঞ্জালের স্তূপ, আর সেদিক যদি না মাড়ান তবে তো আপনাকে রশি দেড়েক রাস্তাই পেরিয়ে আসতে হবে। জ্যোৎস্না যে কি করে' এলো ততোটা ভেবে দেখবার পর্যন্ত অবকাশ ছিলো না, তার আসাটা এমন আকস্মিক, এত চমৎকার। কৃপণ আইনও যে কল্পনাময় সাহিত্য হ'তে পারে আমি তারি একটা পরিচ্ছেদ পড়ছিলুম বিলিতি এক বইয়ে, কিন্তু চোখের সামনেই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখতে পাবো ভাবি নি।

জ্যোৎস্না মুখ নিচু করে' বললে, 'মা পাঠিয়ে দিলেন'।'

তার এখানকার বেশবাসেও তার অবিশ্যি সমর্থন ছিলো না। তবু বললুম, 'এত রাত্রে?'

'হ্যাঁ।' জ্যোৎস্না আরো মুখ নামালো। সে নয় যেন ঘরের শূন্যতা আমাকে বললে, 'ক'টা টাকার দরকার।'

এতটা নিশ্চয়ই আশা করি নি। বললুম, 'কত ?'

'কুড়ি টাকা। না পারেন, যা পারেন।'

দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালুম। মাসটা তখনো একেবারে অতলে তলিয়ে যায়নি, কিন্তু ভেবে অবাক লাগলো। মোটে দশ টাকার দু' টুকরো নোট !

তার কণ্ঠস্বরে'টের পেলুম জ্যোৎস্না ঈষৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে : 'যদি থাকে তো দিন, আমার দাঁড়াবার সময় নেই।'

অটুট কুড়িটা টাকা আমার কাছে থাকবার কোনো কথা নয় ; কিন্তু বিপন্ন একটি মেয়ে রাত করে' ঘরে এসে ক'টা টাকা চাইছে, হাত শূন্য বলে' তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এমন অসমর্থ পুরুষের কথা আমি কল্পনা করিতে পারি না। বললুম, 'বোসো, এনে দিচ্ছি।'

দেখলুম জ্যোৎস্না বসলো না। কায়াহীন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

খানিকবাদে ফিরে এলুম। খানিকবাদে, কিন্তু জ্যোৎস্নার মনে হচ্ছিলো, আমি যেন কত দূর দেশে কত যুগ কোথায় চলে' গিয়েছি।

আমাকে ফিরতে দেখে সে যেন পায়ের নিচে মাটি পেলো। বললে, 'পেয়েছেন ?'

'যদি বলি, পাই নি ?'

'তা হ'লে', জ্যোৎস্না একমুহূর্ত শূন্য, স্তব্ধ হ'য়ে রইলো : 'তা হ'লে মিছিমিছি আমাকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলেন কেন ? যা হয়, বলুন স্পষ্ট করে'। না পাওয়া গেলে অন্য ব্যবস্থা করতে হ'বে।'

মনে-মনে হাসলুম। বললুম, 'অন্য ব্যবস্থার পথও কিছু আছে নাকি ?'

'কিছু না থাকে, মা'র হাতে গয়না তো আছে।'

বললুম, 'পেয়েছি টাকা। কিন্তু, কেন, কী দরকার আমাকে বলবে?'

'দাদা এসেছেন।' জ্যোৎস্নার চোখ কান্নায় উথলে উঠলো।

একটি কথাতেই সকল কথা বুঝে নিলুম আগাগোড়া।

জ্যোৎস্না হাত বাড়িয়ে দিলো, পরমসুন্দর কুণ্ঠিত একখানি হাত। বললে, 'দিন। বেশি দেরি হ'লে চেঁচামেচি সুরু করবে। বাবার শরীরটা ভালো নেই, এই সবে একটু ঘুমিয়েছেন। তা ছাড়া', জ্যোৎস্না একটা ঢোঁক গিললো: 'তা ছাড়া আজ দুপুরে দেশের বাড়ি থেকে মেজকাকার চিঠি এসেছে, ডিক্রিজারিতে ভিটে-মাটি নিলেমে ওঠবার জোগাড়, তাই বাবা আজ দুপুরে দু'শো দশ টাকা তাঁকে মনি-অর্ডার করেছেন। মাস-মাস বরাদ্দ টাকা তো নেনই, তার ওপর আবার ধার করেন। বাবার এত দুঃখ আমি দেখতে পারি না। এর চেয়ে আমি যদি ওঁর ছেলে হ'য়ে জন্মাতুম—'

এর চেয়ে সেটা তবে বিশেষ রমণীয় হ'তো কিনা সন্দেহ। বললুম, 'নাও। সঙ্গে একটা আলো দেবো?'

'দরকার নেই।' জ্যোৎস্না চোখের পাতা থেকে ঘুমের মতো অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

এর পর কতদিন পীতাম্বরবাবুর বাড়ি যাই নি, কেমন লজ্জা করতো। পীতাম্বরবাবু হয়তো কিছু সন্দেহ করবেন না, কিন্তু আর কেউ হয়তো ভাববে, আমার মন কী ছোট, সামান্য ক'টা টাকার জন্যে পাতের কাছে বেরালের মতো ঘুরঘুর করছি।

তারপর আরো বহুদিন যাওয়া হলো না, যখন মাসের ঠিক দোসরা তারিখ সকাল বেলা পীতাম্বরবাবুর অর্ডার্লি আমাকে একখানা খাম দিলো। খুলে দেখলুম কুড়ি টাকা।

জিগগেস করবার প্রয়োজন ছিলো না, তবু করলুম : 'কে দিলো ?'

'বাবু।'

বুঝলুম, ব্যাপারটা যেন কিছু গম্ভীর, কিছু-বা ব্যথিত। নিজেরই ভারি লজ্জা করতে লাগলো জ্যোৎস্না এই সামান্য কথাটা তার বাবাকে বলতে গেল কেন ? সংসারে টাকাই বুঝি কেবল শোধ করা যায়, নইলে আমার ঘরে তার সেই চলে' আসার যে আকস্মিকতা আর তারি যে বিদ্যুন্ময় আনন্দ, সেই আনন্দের ঋণ আমি কী করে' শোধ করবো শুনি ? টাকা না দিয়ে আমি যদি তাকে আর-কিছু দিতুম, তবে কি সে তা বলতো গিয়ে তার বাবাকে ?

টাকাটা ফিরে পাবার জন্যে আমি অনেকটি সুদীর্ঘ রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করতে পারতুম, কিন্তু পীতাম্বরবাবুর আকস্মিক অমিতব্যয়িতায় সমস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল।

এর পর আর সে-বাড়ি গিয়ে কী করে' মুখ দেখাই !

গেজেটেড অফিসারদের ছাড়া আমাদেরো একটা পাঁচমিশেলি ক্লাব ছিলো, প্রাকৃতজনের ক্লাব। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অবিশ্যি প্রথম ক্লাবটায় যেতুম ; উদ্দেশ্য বাইরের লোকদের একটু দেখানো আমরা ঠিক ফটো না হ'লেও তার ফ্রেম, সিঁড়ি না হ'লেও তার রেলিং। চৌরঙ্গিতে কুঁড়ে ঘর বাঁধলেও লোকে বলতে বাধ্য লোকটা চৌরঙ্গিতে থাকে। কিন্তু যেই যাই বলুক, নিজেদের আড্ডায় না যেতে পারলে পেট গরম হ'য়ে রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখতুম। কেননা নিছক পরের নিন্দে করতে না পেলে পেট ফেঁপে দুঃস্বপ্ন দেখবারই কথা। সমাজে যে বড়ো, মইয়ের উঁচু ধাপে যে আসীন, বলতে কি, তার নিন্দেটাই সব চেয়ে বেশি কর্ণরোচক। তাই সেখানে আর-আর গণনীয়দের সঙ্গে পীতাম্বরবাবুকেও সবাই চপের কিমার মতো কুচি-কুচি করে' ফেলতো। যেমন একবার

নাকি উনি বাইরের ঘরের আলো জ্বালিয়ে রেখে কোথায় নেমন্তন্ন খেতে বেরিয়েছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো লণ্ঠনের পলতেটা ডুবিয়ে দিয়ে আসেন নি, তক্ষুনি তাঁকে ফিরতে হ'লো, কিন্তু এতখানি পথ অনাবশ্যক তাঁকে ফের অতিক্রম করতে হ'লো বলে' তিনি জুতোজোড়া বগলে করে' নিলেন, কেননা জুতোর এই অকারণ শক্তিহ্রাস তাঁর মাসিক বাজেটে লেখা ছিলো না। বলা বাহুল্য, এইখানে, ঠিক এই পীতাম্বরবাবুর জায়গায় আমি থেমে পড়তুম। মনে হ'তো কে যেন আমার কোমল একটি বেদনার জায়গায় রূঢ় হস্তক্ষেপ করছে। লোকে কেবল আয়ই দেখে, ব্যয় দেখে না—কঠোর এই একটা ইকনমিক্‌সের কথা নশ্বর জীবনের সার ফিলজফির মতো আমি স্মরণ করতুম। একের থেকে এক বাদ দিলেও শূন্য। মোটমাট সেই সুশুভ্র শূন্যতা। লোকে যাকে কৃপণতা বলতো সে যে অজস্রতা, সেটা চিত্তের দারিদ্র্য না হ'য়ে যে কত বড়ো ঐশ্বর্য এ-কথা হয়তো আমিও ভালো বুঝতে পারিনি।

রবিবার, সন্ধেসন্ধি নরেশ পাট্টাদারের দোকানে বসে' মফস্বলি আড্ডা দিচ্ছিলুম, সবাইর সঙ্গে আমিও লক্ষ্য করলুম একটা ছ্যাকড়া গাড়ি করে' একটি যুবতী মেমসাহেব কোথায় চলেছে। বলতে পারেন, এখানে ট্যাক্সি না থাকলে ভদ্রমহিলা কী করতে পারে, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ির অসঙ্গতিটাই এখানে দেখবার নয়, দেখবার হচ্ছে তার পোষাক, তার পোষাকের অসঙ্গতি। পরনে তার ভারতীয় সাড়ি, খাটো করে' গ্রাম্য কায়দায় পরা, কোথায় অকারণ সঙ্কুচিত ও সঙ্ক্ষিপ্ত হ'তে গিয়ে আঁচলটা আর ঘোমটার বেড় পায়নি; কিন্তু তারো চেয়ে আশ্চর্য ছিলো মাথায় তার সিঁদুর, হাতে তার শাঁখা, হয়তো-বা পায়ে আলতা, গাড়ির ভিতরে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। এমনি তার দেশের পোষাকে থাকলে, একা-একা যেমনি সে যাচ্ছিলো, নিঃসন্দেহ ভাবতে পারতুম কোলকাতা থেকে অর্ডার

আসছে; কিন্তু তার এই উৎকট ভারতীয়তা দেখে মনে কেমন খটকা লাগলো। সঙ্গী নেই, জিনিস-পত্র নেই, বিদেশবিভুঁয়ে এসে ভদ্রমহিলা না বিপদে পড়ে!

তাকে ঠিক অনুসরণ করা বলে না, কৌতূহলী হওয়া বলে। হেঁটে যাচ্ছিলুম, তাই এক সময় পাশের গলি দিয়ে গাড়িটা অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। এ-গলি ও-গলি ঘুরে গাড়িটার যখন সন্ধান পেলুম তখন পীতাম্বর-বাবুর বাড়ির কাছে এসে পৌঁচেছে।

রাস্তা থেকেই শুনছিলুম পীতাম্বরবাবুর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠছেন: 'ওমা, এ কী সর্বনেশে কথা গো! এ বাড়ি নয়, এ বাড়ি নয়, ওকে চলে' যেতে বল্।'

জ্যোৎস্না উচ্চারণ-কুণ্ঠ অসাড় জিহ্বায় জড়িয়ে-জড়িয়ে বলছে: 'নট দিস হাউস প্লিজ।'

আরো কে যেন তাকে শাসিয়ে বলছে: 'সব জাত-জন্ম ছুঁয়ে-ছেনে একসা করে' দিলে যে গো।'

ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না, আমি ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লুম। দেখি দ্রাক্ষাবনবাসিনী মদিরেক্ষণা সে-যুবতী একটা চেয়ারে বসে' নারীবাহিনীর দিকে চেয়ে মৃদু-মৃদু হাসছে।

আমি তাকে জিগগেস করলুম, জজ সাহেবের সঙ্গে তার কোনো দরকার আছে কি-না।

সে বললে, 'হ্যাঁ, তিনি কোথায়? ভাটচারিয়া জিনিস-পত্র নিয়ে পিছে আসছে, আমি ব্রাদার-ইন-ল'কে দেখবার জন্যে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি।'

অন্তঃপুরিকাদের বুঝিয়ে বললুম, ব্যাপারটা আইনের একটা ধারা বা প্রকরণের মতোই জটিল। গ্রন্থি খোলবার জন্যে অন্তরালে আরো কিছুকাল তাদের অপেক্ষা করতে হবে।

এমন সময় ক'টা স্থটকেস-বোঝাই আরেকটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। আবার কে এলো তাঁর বাড়িতে, গৃহমুখবর্তী পীতাম্বরবাবু রাস্তার প্রায় মোড় থেকেই দৌড়ে এলেন। গাড়ির পা-দানির কাছেই তাঁর অবারোহীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।

'কে, স্থধীর ?' আনন্দে না আতঙ্কে পীতাম্বরবাবুর সমস্ত উপস্থিতিটা আড়ষ্ট হ'য়ে এলো : 'এ কী, কোত্থেকে ?'

স্থধীর ঘাসের উপরই দাদাকে প্রণাম করলো।

পীতাম্বরবাবু তার গায়ে হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন, 'শরীর ভালো আছে তো রে ?'

'আছে।'

'তবে হঠাৎ চলে' এলি কেন? দেশের জন্যে বুঝি মন পোড়ে, না ?'

'বোম্বে-কিনেমাতে একটা অফার পেয়েছি, তার জন্যে।'

সেখানটায় আলো ছিলো না, আলোতে ভাইয়ের মুখ ভালো করে' দেখবার জন্যে পীতাম্বরবাবু ঘরে এলেন।

'এই দাদা। দাদাকে প্রণাম করো, ডার্লিং।' স্থধীর ভারতীয়ভূতাকে শিস দিয়ে একটা ইঙ্গিত করলো।

ইস্কুলের ছাত্রের মতো নিল-ডাউন হ'য়ে মেমসাহেব পীতাম্বরবাবুর দু'পায়ে দুটো ঠোক্কর দিয়ে লম্বা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো।

পীতাম্বরবাবুর মনে হলো জ্যোৎস্নার মা-ও যদি ফ্রক পরে' এসে দাঁড়াতো, এমন কুৎসিত দেখতে হতো না। শূন্য, মূঢ় চোখে স্থধীরের দিকে চেয়ে পীতাম্বরবাবু বললেন, 'ইটি কে ?'

'বিয়ে করেছি।'

'আর কী করলে বিলেত গিয়ে ?'

'শেষ পর্যন্ত ফটোগ্রাফি শিখলুম।'

পীতাম্বরবাবু চারদিকে চেয়ে 'প্রেতায়িত শুভ্র গলায় বলে' উঠলেন : 'সঙ্গে ক্যামেরাটা নিয়ে এসেছ? রাত্তির করে' আমার এই মুখের চেহারাটা তুলে রাখতে পারবে?'

সুধীর ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে অভিনেতার ভঙ্গিতে দাড়ালো। বললে, 'পৃথিবীতে এখন কেবল আছে দু'টো জিনিস, এভিয়েশান আর ফটোগ্রাফি। ফিল্মই হচ্ছে গ্রেট, তা আর্টই বলুন আর বেইস প্যাশানই বলুন। সম্প্রতি বম্বে কিনেমার হ্যাণ্ডেল ঘোরাব আর মিসেস ভাটচারিয়া একটা হিরোয়িনের পার্ট করবে। ব্যালার্ড পিয়ারে পা দিতে না দিতেই এমপ্লয়মেণ্ট। ভাবলুম, দাদার সঙ্গে একবার দেখা করে' আসি।'

'ওঁর কী নাম বললে?'

'ওর ফিল্ম-নাম দময়ন্তী। ইণ্ডিয়ান থীম বলে' ওকে একটু অ্যাক্লাম্যাটাইজ করে' নিতে হচ্ছে।'

'অনেকদূর এগিয়ে গেছি', মেমসাহেব পীতাম্বরবাবুর ডান-হাতটা ধরে' একবার ঝেঁকে দিয়ে বললে, 'এখন আজকের রাতের জন্যে একটু বিশ্রাম, আর বম্বে যাবার প্যাসেজটা হ'লেই আমাদের চলে' যায়।'

মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটে' গেল। পীতাম্বরবাবু একটা চেয়ারে ভেঙে পড়লেন আর দুই হাতে মুখ ঢেকে অসহায় অবোধ শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত কেঁদে উঠলেন।

ভারতান্তরিতা মহিলাটি আঁচলে মুখ চেপে হেসে উঠলো : 'হাউ ফানি!'

কান্না ও কোলাহল শুনে অন্তঃপুরিকারা সদলবলে ছুটে এলো। পীতাম্বরবাবুর মূর্চ্ছার মতো হয়েছে। জল, বাতাস, ডাক্তার—অনেক রকম উত্তেজনার মধ্যে কেউ বিশেষ আগন্তুক-যুগলের দিকে মনোযোগ

দিতে পারলো না। পীতাম্বরবাবুকে উপরে নিয়ে এলুম। তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন দোতলা বাড়ি দেখে তাঁকে অনেক বড়লোক ঠাওরাতে পারে, কিন্তু তিনি কী করবেন, বাড়িতে যে লোক আর ধরে না। এখন হিসেব করে' দেখলুম বাড়িটা চারতলা হ'লেই বাড়ি হতো, নইলে সেটাকে বোলতার চাক বলতে হয়। পীতাম্বরবাবু অল্পেতেই সুস্থ হলেন। এবং পরে যে পরিচ্ছেদ সূচনা হবে সেটা নিতান্তই পারিবারিক, তাতে আমার স্থান নেই। তাই নিচে নেমে এলুম। দেখি গাড়ি দুটোকে বিদেয় দিয়ে ভাটচারিয়া-দম্পতি ঘরের মেঝেয় বাক্স বিছানা টাল করে' ফেলে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে' পা ছড়িয়ে দিয়ে আদ্ধেক চোখ বুজে ধূমপান করছেন। টেবিলের ওপর টর্চটা টেপা, দরজার দিকটায় আলো হ'য়ে তাদের কোনের দিকটায় নীলচে অন্ধকার।

আমাকে দেখে ভাটচারিয়া বললে, 'কেমন দেখলেন ?'

'সামলে নিয়েছেন এ-যাত্রা।'

'কথা বলা যাবে ?' ভাটচারিয়া গলা নামিয়ে জিগগেস করলে।

'ভাইয়ের সঙ্গে এটাই তো বোধহয় কথা বলার সময়।'

'মিহি, মোলায়েম কথা নয়। টাকার কথা। বেশি নয়, স্রাথ বম্বের রেল ভাড়া আর দু'হপ্তার হোটেল চার্জ পেলেই আমরা চলে যাই।' মেমসাহেব বললে।

'সত্যি-সত্যি টাকার কথায় বুড়োর বড্ড লাগবে, না ?' ভাটচারিয়া আমাকে একটু মানবচরিত্র বোঝাবার চেষ্টা করলো। বললে, 'আমি দূর থেকে অনেক কিছু ভেবে এসেছিলাম ; একটা মস্ত সবজজ, ভেবেছিলুম ষ্টাইল আছে। কিন্তু এ-তো দেখছি একটা আস্তাকুঁড়, এখানে সামান্য একটা রাত্রিবাস করি তার স্পেস নেই শেষকালে উপোস করে' রাত জেগে মারা পড়বো নাকি ? শুনুন মশাই, দাদাকে গিয়ে সোজাসুজি

বলতে পারেন, আপাততো শ'চারেক টাকা পেলেই আমরা চলে' যাই।'

'মেইক ইট ফাইভ হানড্রেড। ওয়ান্স ফর অল্।' মেমসাহেব বললে।

'আর দেখুন, কোত্থেকে একটা গাড়ি যদি এনে দেন।'

কর্ণপাত করলুম না। রাস্তার নেমে যেতে-যেতে শুনলুম রোয়াকে দাড়িয়ে মেমসাহেব সহরের অন্ধকারে গাড়ি ডাকছে: 'গ্যারি! গ্যারি! পাহারালা!'

আর ততোধিক তীব্র স্বরে ভাটচারিয়া চীৎকার করছে: 'ব্যেরা! চাপরাসি! ঠাকুর! শিগগির একটা গাড়ি নিয়ে এসো। গাড়ি না এনে দিলে ষ্টেশনে আমরা যাই কি করে' ?'

বুঝলুম, পীতাম্বরবাবু যখন সুস্থ হয়েছেন তখন এবার সবাইর মনোযোগটা ওদের প্রতি ধাবিত হোক।

পরদিন যে কোর্ট ছিলো মনে হ'তো না, যদি না ছাতা মাথায় দিয়ে গলাবন্ধ কালো কোটটি গায়ে দিয়ে পীতাম্বরবাবুকে উত্তরমুখো যেতে দেখতুম।

বললুম, 'কেমন আছেন ?'

দুর্ব্বল একটু হেসে বললেন, 'বড্ড সেরে গেছি।'

'আজকে আবার কোর্ট করছেন কেন ?'

'মনটাকে ভুলিয়ে রাখতে। একা-একা ভারি ক্লান্ত লাগে।'

ভয়ে-ভয়ে বললুম, 'ওরা কোথায় ?'

'কালকেই চলে' গেছে।'

'কখন ?'

'শেষরাত্রের ট্রেনে।'

'এতক্ষণ ছিলো কোথায় ?'

'কেন, নিচের ঘরে।'

'নটার ট্রেনেই ভাগিয়ে দিলেন না কেন?'

পীতাম্বরবাবু বোধহয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস লুকোলেন। বললেন, 'এদ্দিন পর এলো, একটু না খাইয়ে ছেড়ে দিতে মন কি সরে?'

'কী খেলো?'

'ডাল-ভাত যা রেঁধেছিলো। জোৎস্নার কাছে শুনলুম বৌটাও নাকি সব খেয়েছে আঙুল ডুবিয়ে-ডুবিয়ে। তবেই বোঝো, কেমন ওদের খিদে পেয়েছিলো!'

'শুলো কোথায়?'

'নিচেই একটা তক্তপোস পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সারারাত ওরা ঘুমোয়নি, ব্যাঞ্জো না কি-একটা বাজনা বাজিয়েছে।'

'আর কান পেতে তাই আপনি শুনলেন? পুলিশ ডাকিয়ে হাজতে পাঠিয়ে দিলেন না কেন?'

'রাত পোহাতেই ওরা ভালোছেলের মতো চলে' গেল।' কথাটা বলতে পীতাম্বরবাবু যেন যথেষ্ট আরাম পাচ্ছেন না।

'ভালোছেলের মতো?'

'হ্যাঁ,' পীতাম্বরবাবু বিবর্ণ একটু হাস্‌লেন: 'টাকা পেলে সবাই ডাকাতও ভালোছেলে হ'য়ে ওঠে।'

'টাকা? এর পর আবার টাকা দিয়েছেন নাকি?'

'কী আর করা, দেখলুম ওর হাত একেবারে খালি।'

'কত দিলেন?'

'পাঁচ শো। ওর বউ বললে এর কমে চলবে না আপাততো। যে লাইনে নেমেছে, অন্তত ষ্টার্ট হিসেবে টাকাটা নেহাৎ বেশি নয় জানি। কিন্তু—' কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

'এত টাকা পেলেন কোথা এ-সময়?' তিক্ত, অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলুম।

'তোমাকে ধন্যবাদ আশু, প্রশ্নটা যে করতে পারলে। চেয়ে-চিন্তেই হোক, ধার-ধোর করেই হোক, বা গয়না-গাটি বেচে-কিনেই হোক কী করে' টাকাটা সংগ্রহ করেছি সেটা অবান্তর প্রশ্ন। আসল কথা হচ্ছে এই, টাকা থেকেই বা কী হ'বে!' বলে' পীতাম্বরবাবু আমাকে কানে-কানে বলার মতো করে' বললেন, 'ইজ ইকুয়েল টু জিরো আশু, ইজ ইকুয়েল টু জিরো।'

# সাপ

অপরাধের মধ্যে, স্ত্রীকে সেদিন বলছিলুম : নূতন জায়গা, বিশ্রী বৃষ্টি নেমেছে, গায়ে একটা গরম জামা দাও, এখুনি আবার হয়তো খুক-খুক করে' কাশতে সুরু করে' দেবে, তখন কোথায় পাবো ডাক্তার, কোথায় বা পাবো ঠাকুর।

বলা-কওয়া নেই অমনি আমার ঘরের বাইরের বারান্দায় হাওয়ার ঝাপটা-লাগা গাছের ডাল থেকে বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোঁটার মতো কতোগুলি হাসির টুকরো ঝরে' পড়লো।

আয়নায় দাঁড়িয়ে আপিসের কাপড় ছাড়ছিলুম, সেই হাসির শব্দে আয়নাটা যেন রোদ লেগে ঝকঝক করে' উঠেছে। এমনি যেন একটু পায়চারি করছি, যতোদূর সম্ভব ভদ্রতার ভান করে' স্ত্রীর দৃষ্টি বাঁচিয়ে জানলা দিয়ে একবার মুখ বাড়ালুম—ব্যাপার কী! এই বোবা বাড়ির মধ্যে কে এই হঠাৎ এমন করে' হেসে উঠলো।

পায়ের নিচে যে জুতো দুটো যে এত সজাগ তার হুঁস ছিল না। জুতোর আওয়াজ শুনেই সে পালিয়েছে কাঠবিড়ালীর মতো। তার পলায়নের শেষ প্রান্তে শুধু তার অনাবৃত বাহুর একটা ঝলক ও অনাবৃত কাঁধের একটি উচ্ছলতা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পেলুম না। সেটা তার লজ্জা নয়, দেখলুম, সেটা তার ঔদ্ধত্য।

যাই হোক, চোখের কোনোরকম ছলনা করবার দরকার ছিল না, মেয়েটি নিতান্ত কিশোরী।

সেটা আমি দেখেছি তার এই পলায়নের পরিচ্ছন্নতায়, তার এই এলোমেলো, উদাসীন আত্মবিস্মৃতিতে।

গরম ব্লাউজ এঁটে স্ত্রী তখন রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন, দরজার আড়ালে প্রতিরুদ্ধ সেই হাসির শব্দ রাশি-রাশি হ'য়ে ফের ছিটিয়ে পড়তে লাগলো।

খবরের কাগজ টেনে নিয়ে গোড়াতেই মফস্বলের খবর পড়ছিলুম, হাসির শব্দে কান দুটো খাড়া হ'য়ে উঠলো।

—তুমি কী ভীষণ ভীতু, দিদি, কলোর্মিমালিনী স্রোতলেখার মতো চঞ্চল সেই মেয়েটি হাসতে-হাসতে বললে,—একটু কী বৃষ্টি পড়েছে, অমনি গায়ের ওপর একেবারে একটা বস্তা চাপিয়ে বসেছ?

—কী করবো ভাই বলো, গাম্ভীর্যে স্ত্রীর গলা মোটা, ঘোলাটে হ'য়ে উঠেছে: তোমাদের যা একখানা দেশ, গায়ে একটু হাওয়া লাগলেই সর্বনাশ। বাড়ির ভিৎ ফুঁড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়ার মতো ঠাণ্ডা উঠছে, দেয়ালে হাত রাখছি, যেন জমানো খানিকটা বরফ। সেদিন আবার এমন একটা ড্যাম্প গরম পড়লো যে চাপা সর্দি হ'য়ে গেলো, সারাদিন মাথা তুলতে পারি নে। এমন দেশেও লোকে চাকরি করতে আসে।

—তার জন্যে তুমি অমনি একটা জুজুবুড়ি সাজবে, দিদি? মেয়েটি অসঙ্কোচে বলে' উঠলো: এই চেয়ে ভাখো দিকি আমার দিকে, আমার এই প্রায় সাড়ে তিন গণ্ডা বয়েস পুরতে চললো, কই গায়ে একটা কোনদিন সেমিজ দিয়েছি বলে'ও তো মনে পড়ে না। বাঘা-বাঘা শীত ছোট ভাইটার ছেঁড়া একখানা দোলাই জড়িয়ে কাটিয়ে দিলুম, কই কেউ

বলুক দেখি কোনোদিন একটা হ্যাঁচ্চো করেছি! তোমরা হচ্ছ বড়লোক —তোমাদের কথা আলাদা। বাক্সে-তোরঙ্গে জিনিসগুলো তো শুধু-শুধু জড়ো করে' রাখা যায় না, কী বলো, ভগবান যখন দিয়েছেন, বাইরের লোকদের একটু দেখাতে হ'বে তো! বলে' মেয়েটি ফের সুর-ফেরতায় হেসে উঠলো।

—তার জন্যে নয়, খানিকটা উপেক্ষার সুরে স্ত্রী বললেন,—আমার টনসিল আছে কিনা, তাই সব সময়ে একটু সাবধান থাকি।

—টনসিল! গলার স্বরে টের পেলুম মেয়েটি বিস্ময়ে একেবারে জমে' উঠেছে: সে আবার কি জিনিস!

—এই যে গলার দু'পাশে দু'টো গ্ল্যাণ্ড আছে মানুষের—

—আমার আছে? মেয়েটি যেন কৃতার্থ হ'য়ে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই যেন মুখ ম্লান করে' বললে,—কই, কোথায় কিছু টের পাচ্ছি না তো! মেয়েছেলেদেরো আছে?

—ঠাণ্ডা লেগে যখন একদিন ফুলে' উঠবে তখনই টের পাবে। স্ত্রী করুণা কণ্ঠে বললেন,—তখন গলার ভেতর দিয়ে ছুরি না চালিয়ে আর উপায় থাকবে না।

—রক্ষে করো। এমন একটা ভয়ের ব্যাপারেও কিনা মেয়েটি গলা ছেড়ে হেসে উঠলো: ছেলেবেলায় সেই একবার কান ফোঁড়ানো ছাড়া গায়ে আমার কোনোদিন একটা সূঁচ বেঁধে নি। অস্তর করবার পয়সা কোথায়?

চায়ের জল ততোক্ষণ গরম হ'য়ে পটের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে—বাইরের বারান্দায় আমাদের চা খাবার টেবিল—বলতে বাধা নেই, পেয়ালায় ভাপ ফোটবার আগেই নিঃশব্দ তৎপরতার সঙ্গে বেরিয়ে এলুম, ঘরের মধ্যে এসে স্ত্রীকে পরিবেষণ করবার সুযোগ দিলুম না।

এতো দ্রুত বিদ্যুৎও, হয়তো নিরুদ্দেশ হয় না। বিচ্ছুরিত হাসির একটি দীর্ঘ রেখা রেখে মেয়েটি শূন্যের উপর দিয়ে মিলিয়ে গেলো।

যেন গভীর বিরক্ত হয়েছি এমনি মুখ করে' বললুম,—কে ওই মেয়েটা ?

—পেসাদি—আমাদের বাড়িউলির মেয়ে। এই যে ঐ দরজাটা খুলে দিলেই ওদের বাড়ি।

—পেসাদি ?

নামটা কেমন যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলুম না।

ধারালো ঠোঁটে স্ত্রী নিঃশব্দে একটু হাসলেন: একেবারে বুনো। গায়ে এখনো কাঁচা মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমি ওকে সেদিন জিগ্গেস করলুম,—'তোমার ভালো নাম কি, পেসাদি ?' ও যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো, বললে,—'ভালো নাম ? ভালো নাম আবার কী! মা আমাকে পেসাদি বলে' ডাকে।'

স্ত্রীর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে সায় দিয়ে বললুম,—তোমার সঙ্গে দেখছি যে ওর বড্ড ভাব। তোমার চেয়ে তো ওকে বয়সে অনেক ছোট বলে' মনে হ'লো। মানে, এই গলার আওয়াজে আর-কি।

—হ্যাঁ, ঐ গলার আওয়াজেই। আমার সাধ্যি নেই অমন ডাকাতে গলায় হেসে উঠতে পারি।

—কিন্তু ঐ যে বললে শুনলুম চৌদ্দ না পনেরো মোটে বয়েস, মানে, ঐটুকু মেয়ের সঙ্গে সমান-সমান তুমি মেশো কী করে' ?

—ঐ শুনতেই ঐটুকুন। দেখতে প্রায় একটা য়্যামাজন—virago। যদি একবার তুমি দেখ! স্ত্রী সামান্য একটু হেসে তৎক্ষণাৎ সেই হাসি সংশোধন করলেন: দরকার নেই দেখে। এতো মস্ত মেয়ে, কিন্তু সভ্যতার কোন ধার ধারে না। এই বয়েসে আমি বেথুনে থার্ড ক্লাশে

মোটে পড়ি, ছিলুম নড়বড়ে ক'খানা হাড়ের একটুখানি একটা পুতুল, কোদাল যে কোদাল—কিছুই তখন জানতুম না, কিন্তু এরা—কী তোমাকে বলবো ? চায়ের পেয়ালায় মুখ ঢেকে স্ত্রী লজ্জা লুকোলেন ।

গলায় শুকনো একটা নির্মমতার ঝাঁজ এনে বল্লুম,—তবে একে বাড়ির মধ্যে প্রশ্রয় দাও কেন ?

—কী আর করা যায় ! যে দণ্ডকারণ্যে নিয়ে এসেছ ! তবু হাতের কাছে সব সময়ে আরেকটা হাত পাচ্ছি, সেইটেই বা কী কম লাভ ! চাকরটার দেখা নেই, দরকার হ'লো, ও-ই এসে কুয়ো থেকে ঝপাঝপ জল তুলে দিলো, মশলা পিষে দিলো, কিল মেরে-মেরে নারকেলের ছিবড়ে ছাড়ালো ! তোমাকে কী বলবো, মেয়েটার গায়ে যেন বাঘের শক্তি । সেদিন নিজেই ও দু'হাতে ধরে' ঐ ভারি ট্রাঙ্কটা একা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে নিয়ে গেলো স্বচ্ছন্দে। আমি তো তখন থরথর করে' কাঁপছি ।

—ওকে দিয়ে তা হ'লে তুমি কাজ করিয়ে নিচ্ছ ?

—বা রে, আমি কি ওকে কিছু বলি নাকি কখনো ? ও নিজে থেকেই সব কাজে এসে হাত দেবে। কোনো-কোনো বিষয়ে আমি যে ওর কাছে হেরে আছি সেইটে প্রমাণ না করতে পারলে ওর স্বস্তি নেই। সেদিন দোষের মধ্যে ওকে আমি একবার শুধু বলেছিলুম ঐ গাছটাতে কী ভীষণ পেয়ারা হয়েছে ! আর কথা নেই, উঁচু খোঁপা বেঁধে কোমরে কাপড় জড়িয়ে পেসাদি তক্ষুনি তরতর করে' গাছে উঠে গেলো, তোমাকে বলবো কি, সেই একেবারে মগ-ডালে। সাহস, দুর্দান্ত সাহস মেয়েটার ! আর কী রাক্ষুসে স্বাস্থ্য ! সেই দিন একনাগাড়ে বসে' এগারোটা বীজে-কলা খেলো। আমি হ'লে তো—হেভ্‌ন্‌স্‌ !

বললুম,—একেবারে ইডিয়ট দেখছি।

মেয়েদের অলক্ষ্যে গাল দিচ্ছি মনে করে' স্ত্রী ঈষৎ উত্তপ্ত হ'য়ে

উঠলেন : কিন্তু পারো তুমি কখনো গাছে চড়তে ? কী করে' নারকোল ছুলতে হয় বলো দিকি, বুদ্ধিমান ? তোমাকে ট্রাঙ্কটা সরাতে বললে চারটে তুমি কুলি নিয়ে আসতে। যদি বলতুম, এই এক বাটি দুধ খেয়ে ফেল তো, তার আগে তুমি আরেকটা লাইফ-ইনসিয়োর না করিয়ে তা মুখে তুলতে না।

এক ঘর এগিয়ে এসে বললুম,—মেয়েটার তা হ'লে একটা জীবন আছে বলো।

—বলে' ! সেদিন পান সাজতে বসেছি সুপুরি নেই, পেসাদি আমাকে চুপি-চুপি এসে বললে,—'তুমি যদি কাউকে কিছু না বলো তো আমি ঐ গাছ বেয়ে তোমাকে দুটো পাকা সুপুরি পেড়ে এনে দি।' তোমাকে বলতে কি, এখানে এসে এই আমি প্রথম সুপুরি-গাছ দেখলুম। গাছের চেহারা দেখে আমার চক্ষু তখন চড়ক-গাছ। তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে' বললুম,—'মাপ করো পেসাদি, একবেলা আর পান না খেলে আমার এমন কিছু বদহজম হবে না।' আমার ভয় দেখে মেয়েটা তো হেসেই কুটপাট, বললে,—'কিছু ভয় নেই দিদি, পায়ে শুধু একটা গামছা জড়িয়ে নিলেই চলে' যাবে।' সাঙ্ঘাতিক মেয়ে।

—উঠলো ?

—পাগল ! উঠতে দিলে তো ! এগুলি, বুঝলে না, এগুলি হচ্ছে ওর বাড়াবাড়ি, প্রতিযোগিতায় আমাকে শুধু পরাস্ত করার মতলোব। ওর মতো আমার সাহস নেই, শক্তি নেই—এই কেবল প্রমাণ করবার জন্যে অস্থির ! এক জায়গায় তো আমাকে ওর ছাড়িয়ে যাওয়া চাই, আমার পয়সা আছে বা চেহারা আছে বা বিদ্যে আছে—না থাক, কিন্তু ওর মতো তো আর গাছে চড়তে পারি না ! শুধু কেবল এই বাহাদুরি নেবার চেষ্টা, নইলে, ভাবো, ইচ্ছে করলে কি ও আর আমাকে ওর বাড়ি থেকে দুটো সুপুরি এনে দিতে পারতো না ?

—তোমাদের আবার চেহারা আছে নাকি ?

—নেই ? বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎশিখার মতো স্ত্রীর দৃষ্টি স্ফুরিত হ'য়ে উঠলো।

—রূপ আছে, কিন্তু চেহারা কোথায় ? চায়ে বোধহয় আরেকটু চিনি লাগবে। যাই বলো, তোমার কড়া করে' ভাজা মোহনভোগটা আজ একেবারে রাজভোগ হয়েছে। ও! তোমার জন্যে আজ আবার লাইব্রেরির বই বদল করে' আনতে হবে, না ? সেই ডিটেকটিভ-উপন্যাসটাই তো ? কী বলো ?

—থাক্।

এমন সময় পাঁচিলের ওপার থেকে পচা নীল ডোবার মধ্যে ভারি জলের খানিকটা ঝুটোপুটি শুনতে পেলুম। হাত-পা ছুঁড়ে রাশি-রাশি জল নিয়ে যেন কে অগাধ খেলা করছে।

ওপার থেকে নিটোল গলায় ডাক এলো : দিদি ভাই।

গলা শুনে চমকে উঠলুম। স্ত্রী অনায়াসেই বুঝতে পেরেছেন এ গলা কা'র!

বারান্দা পেরিয়ে উঁচু রোয়াকটাতে গিয়ে তিনি উঠলেন, তারই ওপারে পুকুরের ঢাল নেমে গেছে।

—এ কী কাণ্ড! ভর সন্ধেয় তুমি জলে নেমেছ কী বলে' ?

—বা রে, গা ধোবো না ?

—গা ধোবে তো, এই নোংরা পচা পানা-পুকুরে! ওটা তো ম্যালেরিয়ার ডিপো।

—তাতে পুকুরই নষ্ট, আমার কী ? পেসাদি অজস্র হেসে উঠলো।

এখান থেকে তার খোঁপার চূড়ার খানিকটা অংশ ছাড়া কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু লুকিয়ে-লুকিয়ে আমি যেন সেই খোঁপার মধ্যে দুর্দম একটা স্পর্ধা দেখছিলুম।

—তোমার কিছু নয় তো, আমাকে ডেকে আনবার কী হয়েছে ? স্ত্রীকে এখন বিশেষ সন্দেহ মনে হ'লো না।

—বা রে, তোমরা নাকি এই লম্বা-ডাঁটওয়ালা ফুলগুলি দিয়ে তরকারি রেঁধে খাও, তাই, ত্যাখো না তোমার জন্যে কতো রাজ্যের এই ফুল তুলে এনেছি।

পাঁচিলের উপর গোল-গোল মধুর দুই মণিবন্ধ দেখতে পেলুম। কোথাও এতটুকু কুণ্ঠা নেই।

স্ত্রী অবিশ্যি তা গ্রহণ করলেন। বললেন,—কী করেছ তুমি ? এতো ফুল দিয়ে কী হ'বে ?

—খাবে। পেসাদি কাকে যেন শুনিয়ে-শুনিয়ে হাসলো।

—তা তো খাবো, কিন্তু তুমিও যে তোমার শরীরটাকে খাচ্ছ, স্ত্রী স্নেহে একটু ভর্ৎসনা করলেন : জ্বরে যদি না পড়েছ তো কী বলেছি। ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আর তোমাকে হি-হি করে' হাসতে হবে না, বাড়ি চলে' যাও শিগগির। মাগো, এমন জলেও কেউ নাইতে নামে।

পেসাদি তেমনি যেন শুনিয়ে-শুনিয়ে বললে,—এখানে কেউ আছে ?

—কেন ?

—তা হ'লে এই পাঁচিল টপকেই সটান উঠে আসতুম। ঘাটের পথ দিয়ে গেলে খানিকটা ঘুর হয়।

বলা বাহুল্য, স্ত্রী ততোক্ষণে গম্ভীর হ'য়ে উঠেছেন : হ্যাঁ, উনি চা খাচ্ছেন বসে'।

—সর্বনাশ ! পেসাদি এক লাফে পুকুরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বসে'-বসে' তার ক্ষিপ্ত পায়ে জলের সেই ক্ষুব্ধতা শুনতে লাগলুম।

সকালবেলা টেবিলে বসে' সাক্ষীর জবানবন্দি পড়ছি। কত কষ্ট

করে' কতো হাতে-পায়ে ধরে' রেলভাড়া দিয়ে হোটেলে খাইয়ে সাক্ষী জোগাড় করে' এনেছে—সেই সব সাক্ষী জেরার জাঁতাকলে পড়ে' কেমন অবলীলায় সব মিথ্যে কথা বলে' গেলো—তারই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির কথা ভাবছিলুম, রান্নাঘরে পেসাদির গলা শোনা গেলো।

—বাড়ির চারপাশে এ-সব কী ছড়িয়েছ, দিদি-ভাই ?

—ব্লিচিং-পাউডার। স্ত্রী অন্যমনস্কের মতো বললেন।

—সে আবার কী জিনিস ?

—সে তুমি বুঝবে না। একরকম জার্মিসাইড। ওর গন্ধে বীজাণু মরে' যায়।

—কিন্তু এদিকে আমাদের যে মরবার জোগাড় করলে দেখতে পাচ্ছি। পেসাদি হেসে উঠলো।

—কী করবো বলো, তোমাদের দেশের মেথরানিগুলি হয়েছে নবাব-জাদির মেয়ে, আজ দু'দিন ধরে' ঐ কাঁচা নর্দমাটা সাফ হচ্ছে না।

—সাফ হচ্ছে না তো আমাকে বললে না কেন ? পেসাদি যেন কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিলো : দু'হাতে আমি সব মুক্ত করে' দিতুম। তোমার এই গন্ধের চেয়ে নর্দমার গন্ধটাও যেন ভালো ছিলো। পেসাদির হাসির সেই নির্মলতায় তার প্রখর, পরিচ্ছন্ন দাঁত ক'টি যেন আমি দেখতে পেলুম : আমি তবে আছি কী করতে ?

স্ত্রী কিছু উত্তর করলেন না।

কিন্তু পেসাদির কথা চাই। ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে এসে বললে,—উনুনে ওটা কী বসিয়েছ ?

—হাঁড়িতে জল ফুটছে।

—ভাত, ভাত হবে বুঝি ?

—না, খাবার জল গরম করছি।

—খাবার জল গরম হচ্ছে কি গো ? হাসবে না কাঁদবে পেসাদি কিছু ঠাহর করতে পারলো না : তোমরা গরম জল খাও ?

—উপায় কী তা ছাড়া ? চারদিকে যা-সব ব্যারাম-পীড়ার কথা শুনতে পাই। ঐ তো ষষ্ঠিতলার কাছে সারখেলদের বাড়িতে কলেরা লেগেছে শুনলুম। স্ত্রী ভয়ে শিউরে উঠলেন : আর তোমাদের দেশের জলের যা চেহারা ! নীল একখানা স'র ভাসছে।

—তা তো হ'লো, পেসাদির গলা কখনো এমন গম্ভীর শোনায় নি : কিন্তু আমার যে ভীষণ এখন তেষ্টা পেয়ে গেলো, দিদি, কী হবে ?

—কী আবার হবে, বাড়ি গিয়ে জল খেয়ে এসো।

—তুমি কী নিষ্ঠুর বলো তো ! একজন তোমার কাছে এসে এক গ্লাশ জল চাইছে, তুমি তা দেবে না ? আর জন্মে তুমি যে মাছ-রাঙা হবে, দিদি।

—গরম জল খেতে চাও তো এক গ্লাশ দিতে পারি।

—গরম জল কখনে মানুষে খায় ? পেসাদি অস্থির হ'য়ে উঠলো : এই তো বালতি ভরতি অনেক জল রয়েছে।

স্ত্রী অপ্রতিভ হ'য়ে উঠলেন : ও ধোরো না, ও পুকুরের জল।

—আমি এখানে নদীর জল কোথায় পাবো ? তেষ্টায় গলা আমার কাঠ হ'য়ে এলো। এই বলে' পেসাদি বালতির জলে ঘটি ডোবালে।

স্ত্রী বিস্ময়ে একেবারে পাথর হ'য়ে গেলেন : ও-জল তুমি খাবে নাকি ?

—তেষ্টা পেলে জল লোকে না খেয়ে মাথায় ঢালে নাকি তোমাদের দেশে ? খাবোই তো, একশোবার খাবো—আর ত্যাখো, কী তেষ্টা, পুরো বালতিটাই না খেয়ে ফেলি।

জল খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার সেই খল্‌খল্‌ হাসি।

সেদিন কাজ সেরে সকাল-সকালই বেরিয়ে পড়েছিলুম। বাড়ি

ঢোকবার আগে পদক্ষেপগুলো হ্রস্ব করে' নিলুম—জানতুম এ সময়টায় আমার স্ত্রী পেসাদির সঙ্গে বসে' তাস খেলেন।

সেদিনো দেখলুম ঘরের দাওয়ায় তাঁরা দেখা-বিন্তির তাস ছড়িয়ে বসেছেন। কিন্তু কোথা থেকে কী অলৌকিক আভাস পেয়ে হাতের ঠেলায় তাসগুলি ছত্রখান করে' দিয়ে পেসাদি ছুটে পালিয়েছে।

দাওয়ায় উঠতে স্ত্রী ধম্‌কে উঠলেন: কী চমৎকার রঙ পেয়েছিলুম এবার। অসময়ে এসে সমস্ত তুমি মাটি করে' দিলে।

রাগবার আমারো যথেষ্ট কারণ ছিলো। বললুম,—কী কেবল যার-তার সঙ্গে রোজ-রোজ তাস পেট' !

ক্ষুণ্ণমনে তাসগুলো কুড়িয়ে নিতে-নিতে- স্ত্রী বললেন,—দিন নইলে কাটে কি করে' ? গল্প করবার জন্যে দুপুরবেলায় তো একটা লোক চাই।

—কিন্তু কী গল্প তুমি করতে পারো একটা পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতের সঙ্গে ?

স্ত্রী আমার সম্বন্ধে বেশ সুস্থ বোধ করছিলেন নিশ্চয়। বললেন,—পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতরা যা গল্প করতে পারে। সেই গল্প মাঝে-মাঝে অসহ্য হয় বলে'ই তো তাস নিয়ে বসতে হয়।

—সে আর কি গল্প ?

—বোঝো না কী গল্প ? স্ত্রী আমার দিকে চেয়ে সূক্ষ্ম একটি ভ্রুকুটি করলেন: বর—বর ছাড়া আর ওরা কী জানে ?

—বর ! ও-মেয়ের বিয়ে হয়েছে নাকি ?

—বিয়ে হয় নি তো তোমার জন্যে বসে' আছে !

বিস্ময়ে স্ত্রীর কথাটা একেবারেই গায়ে মাখলুম না। বললুম,—বিয়ে হয়েছে, কী বলছো, তারপরেও ওর দস্যুতা ?

স্ত্রী হাসলেন: দেবীচৌধুরাণীরো তো বিয়ে হয়েছিলো।

—বলো কী? তারপরেও ও গাছে ওঠে?

—শুধু তাই? সেদিন আঁচলে করে' আমার কাছে একটা সাপ নিয়ে এসেছিলো।

—কি, কী বললে? মুহূর্তে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আতঙ্কে কিলবিল করে' উঠলো।

ভাগ্যিস সেটা দিনের বেলা।

ভাতের সঙ্গে নেবু খাওয়াটা আমার বহুকালের বদ-অভ্যাস। কিন্তু সেদিন রাতে খেতে বসে' ভাতের কিনারে নেবুর চিলতেটুকু দেখতে পেলুম না।

—নেবু, নেবু কোথায়?

অপরাধীর মুখে স্ত্রী বললেন,—সব ছানা কাটতে খরচ হ'য়ে গেছে।

—তোমার একটুও যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে! দু'পয়সায় না কুলোয় চার পয়সার আনাতে পারো না? এখন এত সব আমি গিলি কি করে'?

স্ত্রী বললেন,—ঘাটের পারে নেবু-গাছে ঝাঁক বেঁধে নেবু ফলে' আছে, চাকরটাকে বলবো?

—তোমার কী বুদ্ধি! সামান্য দু'টো নেবুর জন্যে ওকে আমি ওখানে মরতে পাঠাই!

সূর্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গে আমার দরজায় খিল পড়ে। হঠাৎ শব্দ শুনে দু'জনেই চমকে উঠলুম, সেই খিলে কে হাত দিয়েছে।

কালি-পড়া জাপানী লণ্ঠনে তাকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু স্ত্রী তাকে অনায়াসে চিনতে পারলেন। অলক্ষ্যে দু' পা এগিয়ে গিয়ে বললেন,—এ কী, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

দরজাটা খুলে গেলো। পেসাদি বাইরে বেরিয়ে যেতে-যেতে নিটোল, নির্ভীক গলায় বল্‌লে,—নেবু নিয়ে আসছি।

ভাত ফেলে হাঁ-হাঁ করে' উঠলুম : ওকে ওখানে যেতে দিয়ো না, খবরদার যেতে দিয়ো না। ওখানে সাপ আছে, আমি স্বচক্ষে দেখছি, কালো লম্বা লিকলিকে সাপ। ফণা ধরে' আমারি টর্চের আলোর দিকে চেয়ে ছিলো। যেতে বারণ করে' দাও।

আমার এই নির্লজ্জ ভয়ের উত্তরে পেসাদি নির্লজ্জতরো উচ্চকণ্ঠে অনর্গল হেসে উঠলো।

রাতের বেলা ভয়ের ঝোঁকে 'সাপ'-কথাটা উচ্চারণ করে' ফেলেছি, পায়ের চারদিকে আশে-পাশে অগণন সাপ দেখতে লাগলুম। মেঝেয়, দেয়ালে, আনাচে-কানাচে। যে-সময়ে যে-দিকে তাকাতে না পারছি, ঠিক সেইখানে। আর তারি মাঝে পরম নিশ্চিন্ত মনে পেসাদি ঘাটের অন্ধকারে একটার পর একটা নেবু ছিঁড়তে লাগলো।

—এই নাও। বলে' কোঁচড় উজাড় করে' নেবুগুলি মেঝের উপর ছড়িয়ে দিয়ে পেসাদি এক দৌড়ে তার বাড়ি গিয়ে হাজির।

শুধু সেই রাতে কেন, অনেক রাতেই আমি ঘুমুতে পারি নি। চারধার থেকে মশারিটা তোষকের তলায় একহাত করে' গোঁজা, তবু থেকে-থেকে ঘুমের মধ্যে চমকে উঠেছি এই বুঝি কোথা থেকে বিছানায় একটা সাপ উঠে এসেছে! তাড়াতাড়ি টর্চ টিপে ধরেছি, চাল বেয়ে কী-একটা কালো ছায়া যেন এঁকেবেঁকে তুলে উঠলো। ঘরের নর্দমার মুখ বন্ধ,—যেখানে যেটুকু একটা গর্ত আছে বা ফাটল—তাই বলে' জানলাটা তো আর বন্ধ করতে পারি নে—মনে হয় শিক বেয়ে কে লতিয়ে উঠলো বুঝি শিয়রের দিকে। সাপে ব্যাঙ ধরেছে সারা রাত ধরে' তারই একটানা আর্তনাদ শুনি। পিঠের দিকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে আছে মনে করে' এমন কি পাশ ফিরতে পারি নে।

আর, সন্ধের একটু আভাস দিয়েছে কি, না, প্রতি পদে ত্রাহি-ত্রাহি

বলতে-বলতে বাড়ির দিকে পা বাড়াই। বিধাতা শুধু সুমুখের দিকেই দু'টো চোখ দিয়েছেন, পেছনে তাকাবার জো নেই, ততোক্ষণে সামনেই হয়তো উৎক্ষিপ্ত ফণা দেখতে পাবো। দু' পাশের জঙ্গলে রাস্তাটা অন্ধকার হ'য়ে আছে, হাতে টর্চ আছে বটে, কিন্তু সামনে ওটা গাছের মরা ডাল না আর-কিছু, চিন্তা করে' দেখবারো সময় নেই। তাড়াতাড়ি যাবো না আস্তে যাবো সেইটেই হচ্ছে সমস্যা। গোখরো হচ্ছে নাকি সিংহের জাত, আঘাত না করলে কাটে না, আর কেউটে হচ্ছে বাঘের মতো, মানুষের গন্ধ পেয়েছে কি, ছুটে এসে ছুবলে দিয়েছে। আস্তে গেলে কেউটের ভয়, তাড়াতাড়ি গেলে গোখরোর। দাঁড়াতেও পারি নে, চলতেও পারি নে—সেই পথটুকু পেরোতে ভয়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে।

এমনি একদিন সন্ধের আগে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছিলুম; ঘরে তখনো লণ্ঠন হয়তো জ্বালা হয় নি, দেখি স্ত্রী কা'র সঙ্গে বসে' অঘোরে গল্প করছেন। আমার পায়ের শব্দে পালাবার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারলুম মেয়েটি কে। কিন্তু আজ তার পালানোর মাঝে গতির সেই ত্বরিত দীপ্তি নেই, কেমন একটা জড়ীভূত অনিচ্ছার বোঝা। উঠে যেতে হচ্ছে বলে' তার আর বিরক্তির অন্ত ছিলো না।

আশ্চর্য, স্পষ্ট সে-কথা মুখ ফুটে সে উচ্চারণ পর্যন্ত করলে। বললে,—কী গেরো! দু'দণ্ড ঠাণ্ডা হ'য়ে যে একটু গল্প করবো তার জো নেই, সন্ধে হ'তে-না-হ'তেই বাড়ি ফিরে এসেছেন!

—কী করা যায়! চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে যেতে-যেতে বললুম,—অন্ধকার হ'লেই পথে-ঘাটে যে-সব জিনিস এখুনি বেরুতে সুরু করবে নাম নিতে পর্যন্ত ভয় করে।

—কী, সাপের কথা বলছেন? সাপ? দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে

পেসাদি খিলখিল করে' হেসে উঠলো : শুধু অন্ধকারে কেন, দিনের বেলাতেও দেখা যায়। এই তো সেদিন চক্কোত্তিদের বাড়িতে এক বোষ্টম এসেছিলো ভিক্ষে করতে, বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে গান করছিলো, গানটা আর শেষ করতে পারলো না, গানের বুলি মুখে নিয়েই ঢলে' পড়লো। গান ছেড়ে মুখ দিয়ে তখন তার গ্যাঁজা উঠছে।

—বলবেন না বলবেন না, হঠাৎ পায়ের নিচে মেঝেটা যেন পিছল হয়ে উঠলো : সেই জন্যেই তো প্রাণ নিয়ে কোনোরকমে এসে নিজের কোটরে ঢুকি।

পেসাদি প্রগল্‌ভ হাসি দিয়ে তার প্রচুর লজ্জা নিবারণ করলে : কিন্তু এরি কোন কোটরে সাপ লুকিয়ে রয়েছেন তার ঠিক কী! পথটুকু পেরিয়ে এসেছেন বলে'ই এ-যাত্রা বেঁচে গেছেন মনে করবেন না। মাঝে-মাঝে ঘরের মধ্যেও আমরা সাপ দেখতে পাই!

—বলবেন না, বলবেন না, ভুলেও ও-নাম মুখে আনতে নেই।

কী নাম? পেসাদি ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠলো।

বুক দুরদুর করে' উঠলো, গলাটা শুকিয়ে এলো, হাত-পায়ের প্রান্তগুলি দুর্ব্বল, তবু নির্লিপ্তের মতো বললুম,—ঐ যে, যা বললেন, সাপ, সাপ আর-কি।

—সাপ না হাতি! গতির ঢেউয়ে হাসির কতোগুলি কঠিন নুড়ি ছড়িয়ে দিয়ে পেসাদি তার বাড়ির দিকে ছুটে গেলো।

বললুম,—হাতি হ'লে কোনো দুঃখ ছিল না, অন্তত চোখ মেলে তখন তাকে দেখা যেতো।

—এই সাপও আপনি একদিন দেখতে পাবেন।

মেরুদণ্ড বেয়ে তীক্ষ্ণ একটা ঠাণ্ডা সিরসির করে' উঠে গেলো, নিজের মৃদুতম নিশ্বাসের শব্দে পর্যন্ত চমকে উঠলুম।

পেসাদির কথাটা এক দিক থেকে ভীষণ সত্যি। ঘরেই যে সাপ আছে, বাস্তুসাপ, সেদিন বিছানায় শুতে যেতেই টের পাওয়া গেলো। দেখলুম মূর্তিমতী কালনাগিণী ফণা তুলে এক প্রান্তে অপেক্ষা করে' আছেন। তার দিকে এগোও আর তোমার সাধ্যি কী!

আমার ঘরের দক্ষিণের দরজা খুললেই নীল বিস্তীর্ণ একটি ডোবা, তারই গা বেয়ে পায়ে-চলা ফালি একটু রাস্তা—কী সাহস করে' সেই দক্ষিণের দরজাটা সেদিন খুলে রেখেছিলুম।

এতো অন্ধকারে হ্যারিকেনের শিখাটাকে কেমন অস্বাভাবিক লাগছে। ওটাকে নিবিয়ে দিয়ে কোনোরকমে ঘুমিয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচি। এই অসহ্য স্তব্ধতা তা হ'লে আর শুনতে হয় না। কোথাও এক কণা আলো নেই, এক বিন্দু শব্দ নেই, এক ফোঁটা নিশ্বাস নেই—আকাশের তলায় পৃথিবীকে যেন কে গোর দিয়ে রেখেছে! ঘুমিয়ে পড়লেই মৃত্যু—এমনি একটা আতঙ্ক মনে হয়, কিন্তু ঘুমোব যে, ঘড়ির দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিলো না—এতোক্ষণে কিনা মোটে আটটা বেজেছে!

হঠাৎ খোলা দরজার সামনে আলোর বাঁকা একটা রেখা যেন দুলে'-দুলে' উঠলো।

—কে?

—দিদি ভাই, কেত্তন শুনতে যাবে?

মশারির তলায়, বলতে লজ্জা নেই, স্ত্রী ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন। ঢোক গিলে বললুম,—উনি ঘুমোচ্ছেন।

পাছে অদ্ভুত অভদ্র শোনায় স্ত্রী ধড়মড় করে' উঠলেন: না, ঘুমোই নি, উঠে পড়েছি। কী বলছ ভাই, পেসাদি?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম,—তুমি তো উঠেছ, কিন্তু তিনি ঐ

অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি ? অদৃশ্যচারিণীকে লক্ষ্য করলুম : আপনিও উঠে আসুন। রাত্তিরবেলা বাইরে অমন করে' দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কখন কোত্থেকে—

পেসাদি আমার কথাটা গ্রাহ্যই করলে না। বললে,—ষষ্ঠিতলায় চমৎকার কেত্তন হচ্ছে, যাবে আমার সঙ্গে ?

স্ত্রী কক্‌খনো যেতেন না, তবু গোঁ ধরে' বললেন,—যাবো।

আমি সজোরে নিজেকে নিক্ষেপ করলুম : কক্‌খনো না। তুমি পাগল হয়েছ ? এই অন্ধকারে বুনো রাস্তা দিয়ে এতোটা পথ পায়ে হেঁটে—

পেসাদি নির্ভয়ে হেসে উঠলো : আমার কাছে আলো আছে।

—আলো তো আমারো বাড়িতে আছে। কিন্তু হ্যারিকেনের আলোয় ওটাকে কী বলে—ঐ যে—হ্যাঁ, ও দেখার চেয়ে দিনের আলোয় তারা দেখা সহজ।

—ভয় নেই, সঙ্গে আমি আছি। কোনটা কী সাপ দূর থেকে দেখলেই তা বলে' দিতে পারি।

—পৃথিবী কিনে নিতে পারেন। কর্কশতায় ঝাঁজিয়ে উঠলুম : যেতে হ'লে আপনি একাই যান।

পেসাদি শেষ পর্যন্ত দেখে যাবে। .বললে,—কেন, দিদিভাইর পায়ে তো জুতো আছে।

—আর তবে কী চাই, সেই জুতো পায়ে, গলাটা খাঁখরে নিলুম : সেই জুতো পায়ে ওটার মাথাটা মাড়িয়ে দিতে বলবেন বোধহয়।

—ভয় নেই, মাড়াতে হ'লে আমি শুধু-পায়ে মাড়িয়ে দিতে পারবো।

—দিন্ যতো খুসি, আমার একটিমাত্র স্ত্রী, তাকে নিয়ে টানাটানি করবেন না।

পেসাদির হাসি শুনে মনে হ'লো কথাটাকে অমন করে' না বললেও কিছু দোষ ছিল না।

কিন্তু বলে' যখন ফেলেছি, তখন আর চারা নেই। কাজেকাজেই স্ত্রীর উপরেই ধম্‌কে উঠলুম শেষ পর্যন্ত: তুমি শুয়ে পড়ো বলছি, কোলকাতায় তো কতো কেত্তন শুনেছ।

ভাবলুম পেসাদিকে হটিয়ে দেয়া গেছে। কিন্তু নির্বিচারে হটে' যাবার মেয়ে সে নয়।

—তুমি কতো কলমি-শাক খেতে ভালোবাসো, দিদিভাই। পেসাদি ডোবার দিকে মুখ করে' আমার দরজার কাছে এগিয়ে এলো: পুকুরে ঝোপ বেঁধে কী সুন্দর শাক হয়েছে! তোমাকে ভাই ক'গাছ তুলে এনে দি। বলে' পাড়ে হ্যারিকেনটা নামিয়ে রেখে পেসাদি পায়ের পাতা থেকে সাড়ির প্রান্তটা এক হাতে একটু তুলে ধরে' জলে নামতে লাগলো: হিঞ্চেও আছে, সেদ্ধ করে' বাবুকে তেল-নূন মেখে খেতে দিয়ো।

আলোর শিখাটা আরো একটু যে উস্কে দেবো তার পর্যন্ত খেয়াল রইলো না।

স্পষ্ট দেখলুম পেসাদি ডোবার মধ্যে প্রায় হাঁটু অবধি নেমে গেছে।

সেদিন সোমবার, সাতটায় রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে ভিতরে বারন্দায় দু'জনে আফ্‌টার-ডিনার আলোচনা করছি, একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে হাসতে-হাসতে পেসাদি একেবারে আমার চোখের সামনে এসে হাজির।

বিশ্বাস করতে পর্যন্ত সাহস হচ্ছিল না, এমন সহজ, নিষ্ঠুর তার উদ্‌ঘাটন। বুঝলুম, কী-একটা অসাধ্যসাধন সে আজ করে' এসেছে যে একেবারে নেপথ্য থেকে নির্বারিত রঙ্গমঞ্চে সে চলে' এসেছে। তাকে

যে একেবার দেখবো তারো যেন সময় দিতে সে প্রস্তুত নয়, তার পলায়নের মতোই এমন দ্রুত, এমন স্পষ্ট আজকের তার এই আবির্ভাব।

পেসাদির দিকে না তাকিয়ে, ভীরুতার একশেষ, স্ত্রীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলুম।

হাসতে-হাসতে পেসাদি আরো এক পা এগিয়ে এসে বললে,—আমি যদি এখন বলি, আমাকে একটা সাপে কামড়েছে, আপনাদের তা হ'লে কী হয়?

কী হয়!

স্ত্রী চীৎকার করে' উঠলেন: কী বলছ তুমি যা-তা?

—এই দ্যাখ, বুড়ো আঙুলের মাথায়। পেসাদি তার ডান পা'টি সামান্য একটুখানি তুলে লণ্ঠনের আলোতে তার বুড়ো আঙুলের ডগায় ছোট দু'টি দাঁতের দাগ দেখালো।

ভয়ে একেবারে মুছে গেলুম শরীর থেকে। আমতা-আমতা করে' বললুম,—আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

পেসাদ্দির ঠোঁটের উপর সাপেরই মতো চিক্কণ একটি হাসি খেলে গেলো। বললে,—মিথ্যে বলবো কেন? আমার পায়ের ওপর দিয়ে দস্তুরমতো একটা সাপ চলে' গেলো, স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, বুড়ো আঙুলটা মিঠে-মিঠে একটু জ্বালা করছে, আমি অমনি মিথ্যে বলতে যাবো?

—মিথ্যে নয় তো, অমনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছেন কী বলে'? প্রবলকণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলুম: তক্ষুনি পা-টা বেঁধে ফেলেছেন?

—বাঁধতে যাবো কী করতে? পেসাদি রাশি-রাশি হেসে উঠলো।

সেই হাসির আলোয় তার মুখের দিকে একবার চোখ পড়লো। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে বললুম,—বাঁধেননি মানে? শিগগির বেঁধে ফেলুন। কী

করছেন আপনি? এ কী সর্বনাশের কথা? সাপ নিয়ে আপনি ছেলেখেলা করতে চান?

আমার ব্যস্ততা দেখে তার হাসি আরো উৎসারিত হ'য়ে পড়লো।

—দড়ি, দড়ি, স্ত্রীকে বললুম,—শিগগির একটা দড়ি নিয়ে এসে পা-টা ওঁর জায়গায়-জায়গায় আঁট করে' বেঁধে দাও।

কিন্তু আমার স্ত্রীর তখন নড়ে' বসবার শক্তি নেই, কাজেকাজেই নিজেই ত্রস্ত হাতে গলার পৈতেটা ছিঁড়তে গেলুম।

পেসাদি অকরুণ হেসে বললে,—ভয় নেই, সাপটাকে আমি দেখেছি।

—দেখেছেন?

—হ্যাঁ, পেসাদির গলা এতটুকু টললো না; নিতান্তই জলঢোঁড়া সাপ।

—সে আবার কী?

—কেঁচোর মাসতুতো ভাই বলতে পারেন। পেসাদির গলা নিশ্চিন্ত, নিটোল: সোম-মঙ্গলবারে ও-সাপের বিষ থাকে না।

—সোম-মঙ্গলবারে বিষ থাকে না?

আমি তো একেবারে বসে' পড়েছি।

—না। আমাকে আরো একবার কামড়েছিলো। এমনি সোমবার। হেসে-খেলে শুয়ে-ঘুমিয়ে দিব্যি রাতটা কাটিয়ে দিলুম। কিচ্ছু হ'লো না।

—কিচ্ছু হ'লো না তো, সাপ আপনি চেনেন কী করে'?

—বা রে, সাপ চিনিনে? পেসাদি তখনো পাষাণের রেখায় হাসছে: সাপ-ব্যাঙ, বিছে-জোঁক, পোকা-মাকড়ের দেশে মানুষ, আমি সাপ চিনিনে বলছেন?

—তা আপনি চেনেন, পৈতেটা গলা থেকে খুলে ফেললুম,—কিন্তু পা-টা আপনি বেঁধে ফেলুন।

—আপনি পাগল হয়েছেন? পেসাদি পিছনে সরে' গেলো।

—পাগল, পাগল তো তুমি হয়েছ পেসাদি। স্ত্রী শীর্ণ, বিবর্ণ গলায় বললেন,—সাপের বিষের কাছে তুমি আর তোমার তেজ দেখিয়ো না।

—এ সাপের বিষ কোথায়, দিদি? পেসাদি মুক্ত কণ্ঠে আবার আরেক পশলা হাসি ছড়ালে।

—কী করে' বলা যায়? স্ত্রী অমানুষিক অস্থির হ'য়ে উঠলেন: অন্ধকারে ভুলও তো তোমার হ'তে পারে। হয়তো, কী দেখতে কী দেখেছ, ঐ মিড়মিড়ে আলোয় কতোটুকু আর তুমি দেখতে পারো? এখনো হাঁটুর কাছে বেঁধে ফ্যালো পা-টা।

—আমি কি তোমাদের মতো ভীতু, সাপের নাম শুনেই মুচ্ছো যাবো? মাছের মতো একটা ঘাই মেরে পেসাদি চলে' যাচ্ছিলো।

আমি রাগে অবশ হ'য়ে গেলুম। বললুম,—তা হ'লে মোটেই আপনাকে কামড়ায় নি, মিছিমিছি আমাদের তাব ভয় দেখাতে এসেছেন।

—কী করে' আপনাদের তা এখন দেখাই বলুন। পেসাদি যেন মুহূর্তে ম্লান হ'য়ে গেলো: তাকে তো এখানে আর ডেকে আনতে পারিনে।

—দরকারো নেই তাকে এখানে ডেকে এনে। আপনি পা-টা বেঁধে ফেলুন শিগগির।

—আপনি পাগল হয়েছেন! পেসাদি ফিরে দাঁড়ালো: শেষকালে বামুনের পৈতে দিয়ে আমি পা বাঁধবো!

—তা হোক্।

—বাপ রে বাপ! কী ভীতু আপনারা! পেসাদি হাসবার একটা অশরীরী চেষ্টা করলো: আপনাদেরকে মা ভাড়াটে রেখেছেন কী বলে'? আমি তো আজ বাদে কাল শ্বশুরবাড়ি চলে' যাবো, আমার বুড়ো মা একা এই ভাড়াটেদের ভরসাতেই তো থাকবেন বলছেন—তা, এই তো

ভাড়াটের নমুনা! পেসাদি হেসে উঠলো, কিন্তু হাসিটা এবার তার কেমন জমলো না।

এতক্ষণে গোলমাল শুনে পেসাদির মা ঘুম থেকে জাগতে পেরেছেন। জ্বরে-জ্বরে এখন ক'খানা হাড় তাঁর সম্বল, পাতা কবে ঝরে' গেছে, এখন কেবল শুক্‌নো ক'টা শিকড়। ঝড় এসে সব ঝরিয়ে দিয়ে গেছে, শিকড়টা আর উপড়ে তুলতে পারে নি।

—তুই ভালো করে' দেখেছিস তো মা, বুড়ি স্নেহে ক্ষীণ গলায় বললে,—জলঝোরা সাপই তো?

—হ্যাঁ মা, স্পষ্ট দেখেছি। মল্লিকের বউ আমার সঙ্গে ছিলো, সেও দেখেছে।

—তবে দেখিস, গোবর ছুঁসনে যেন, আমার পাশে এসে চুপ করে' শুয়ে থাক্। কাল থেকে মাসখানেক আলুনি খেতে হ'বে, পেসাদ।

—আলুনি খাবে না হাতি! কী না কী কোথায় কামড়েছে, না কিছু লেগেই বা আঙুলটা কেটে গেলো তার ঠিক নেই, তোমরা সবাই একেবারে হুলুস্থুল বাধিয়ে তুলেছ। কতো সাপ্ এমন পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিয়ে গেলুম!

পেসাদি একটা ঝিলিক দিয়েই হয়তো চলে' যাচ্ছিলো, কিন্তু কী মনে করে' ওদের রোয়াকে উঠবার সিঁড়ির ধাপে বসে' পড়লো।

আমার স্ত্রী ততোক্ষণে কোথা থেকে একগাছ পাকানো পাটের দড়ি সংগ্রহ করে' এনেছেন। হাসিমুখে এগিয়ে আসতে-আসতে বললেন,—তবু একটা বাঁধ দিয়ে দি, কিছুই যখন ভালো করে' বলা যায় না।

পেসাদি নিঃশব্দে হাসলো। তার শব্দহীন হাসি যে এমন বীভৎস তা আমি ভাবতেও পারতুম না। বললে,—এতেই এমনি তোমরা ভয়

পাচ্ছ, অথচ, জ্যান্ত এখনো একটা সাপ দেখলে না। সহরের লোকগুলো এমন ভয়কাতুরে! তার আবার এতো জাঁক!

পেসাদি বসবার ভঙ্গিটা আলস্যে একটু নমনীয় করে' আনলো।

হাসতে-হাসতে স্ত্রী তার পায়ের কাছে বসে' পড়লেন। যেন কী একটা ছেলেমানসি খেলা করছেন, আঙুলের অমনি একটা চপল ভঙ্গি করে' পেসাদির পায়ের কাপড়টা আলগোছে একটু তুলে যেন খামোকা তাকে ব্যাথা দেবার জন্যেই আঁট করে' একটা তিনি বাঁধ দিয়ে দিলেন। পেসাদিও, ছেলেমানুষ একটা আবদার করছে, এমনি ভাবে আর তখন উচ্চবাচ্য করলে না।

কিন্তু, শেষ প্যাঁচটা শুধু জড়ানো বাকি, পেসাদি হঠাৎ মরিয়ার মতো বোবা, অসহায় কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠলো: খুলে দাও শিগগির। কেন, কেন এই বাঁধন দিয়ে সাধ করে' বিষ ডেকে আনছো? বলেছি না, সোম-মঙ্গলবারে ও-সাপের বিষ থাকে না, কেন গর্ত খুঁড়ে সাপ বার করছ জিগগেস করি? খুলে দাও, খুলে দাও বলছি, আটকা পড়ে' আমার রক্ত যে এদিকে নীল হ'য়ে উঠলো!

ভয়ে এতোটুকু হ'য়ে স্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন।

—খুলে দিন, পেসাদি এবার আমার কাছে মিনতি জানালে: আমার কিচ্ছু হয়নি, কেন মিছিমিছি বিষ ডেকে আনছেন? আমি দিব্যি এমনি হেসে-খেলে বেড়াতুম, ঘুমিয়ে পড়তুম মায়ের পাশে, আমার কিচ্ছু হ'তো না, কেন জোর করে' এই বাঁধন এঁটে দিলেন? এ কী শত্রু ঘরে রেখেছিলুম বলুন তো? খুলে দিন গেরোটা, আমাকে হাত-পা ঝাড়া দিয়ে ভালো করে' উঠে দাঁড়াতে দিন। পেসাদি নিষ্প্রাণ, প্রেতায়িত গলায় বললে,—বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছেন কী হাঁ করে'? হাত বাড়িয়ে বাঁধনটা খুলে দিতে পারেন না?

আশ্চর্য, পেসাদির নিজের হাত উঠছে না, পা-টা যে তার কোথায় তাই যেন তার খেয়াল নেই।

—কী, গোবর ছুঁয়ে ফেললি নাকি, পোড়ারমুখি ? বিছানায় থেকে পেসাদির মা কাঁপতে-কাঁপতে উঠে এলো।

—ওদের বাঁধনটা খুলে দিতে বলো, মা, মানুষের গলায় এমন স্বর আমি কোনোদিন শুনি নি : আমাকে 'একলা পেয়ে জোর করে' দু'জনে ওরা আমার পা-টা বেঁধে দিলো। দিব্যি ভালো ছিলুম, মা, মিছিমিছি ওরা আমার গায়ে বিষ ডেকে আনলো। কোথাও কিছু না, এই বাঁধন—এই বাঁধন দিয়েই ওরা আমার গলায় ফাঁস জড়ালে। খুলে দিতে বলো, খুলে দিতে বলো।

তখন উপস্থিত আমি একা শুধু পুরুষ। কী যে করবো তা ভগবানেরো জানা নেই। বাইরে তাকানো যায় না এমন অন্ধকার, হাতে আমার একটা শুধু লণ্ঠন, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিতের মতো সরু রাস্তা। তবু আমাকে যেতে হ'বে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি খবর দেয়া দরকার। লোক চাই আশে-পাশে—কোথায় কী ওষুধ, কোথায় কে ওঝা, কিছুই তো আমার জানা নেই।

তাকিয়ে দেখবার সময় নেই কোনোদিকে, টর্চ না নিয়ে হাতের কাছে মিটমিটে একটা লণ্ঠন নিয়েই যে বেরিয়ে পড়েছি তার খেয়াল ছিল না, বেরিয়ে তো পড়লুম।

শুনতে পেলুম পিছন থেকে পেসাদি খুসি হ'য়ে বলছে : পাঠিয়েছি, এতোদিনে বাইরে, পাঠাতে পারলুম ঠেলা দিয়ে। মাগো, কী ভীতু লোককে ব্যসা দিয়েছ ! শেষকালে আমাকে পর্যন্ত ভয় পাইয়ে দিলে ! কী বিষের ছোঁয়াচ ছড়িয়ে দিয়েছে যে চারদিকে !

রাজ্যের লোক-জন নিয়ে যখন ফিরে এলুম, কোমর থেকে পেসাদির

কপাল পর্যন্ত তখনো গরম। দুই শক্ত হাতে আমার স্ত্রী তখন তাকে কোনোরকমে উঁচু করে' ধরে' রেখেছেন।

আমাকে চিনতে পেরে পেসাদি ঠোঁটের সূক্ষ্ম রেখায় নীরবে একটু হাসলো। জড়িয়ে-জড়িয়ে বললে—এবার আর কী! খুলে দিন বাঁধনটা।

একতাল শূন্যের মতো আমি নিষ্পলক দাঁড়িয়ে।

পেসাদি যেন চোখের কিনারা থেকে প্রখর ধমকে উঠলো : এখনো আপনার ভয়? খুলে দিন বলছি।

না, আর ভয় কা'কে। আস্তে-আস্তে বাঁধনটা খুলে দিলুম।

# ছুরি

আমি যে কেন এখনো বিয়ে করি নি তার একটা খুব সহজ কারণ আছে। কারণ আর কিছুই নয়, যতোই আয়ু যাচ্ছে পিছিয়ে, মেয়েরা ততোই যাচ্ছে এগিয়ে। আর আমি উন্নততম মুহূর্তে অগ্রসরতম মেয়ে চাই।

কাজে-কাজেই ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীতে বিয়েটা ঘটে' ওঠেনি। সমস্ত কুমারীত্বের উপর একাধিপত্য করছি এমনি একটা গর্বে মনে-মনে বিস্ফারিত ছিলুম। মানে যে-কাউকে যে-কোনো মুহূর্তে বিয়ে করতে পারি এই যে একটা দিগন্তবিস্তৃত সুখ এটা পুরাকালের বহুপত্নিত্বের চেয়েও রোমাঞ্চকর।

এই পর্যন্ত যতো জায়গায় বদলি হ'য়ে গেছি, কতো যে মেয়ে দেখে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। বলা বাহুল্য, আমার চাকরিটা মেয়ে দেখে বেড়ানোর পক্ষে ভারি অনুকূল ছিলো। আর সেটা এমন চাকরি, যেখানে আমার মতটাই প্রথম ও আমার মতটাই শেষ। তাই যেখানে পা দিয়েছি সেখানেই কন্যা-কণ্টকিত বাপের দল অনর্গল আমার দ্বারস্থ হয়েছেন। বিয়ে করবো না আমার এমন কোন নীচ প্রতিজ্ঞা ছিলো না। তাই বহু মেয়েই আমাকে দেখতে হয়েছে। এবং আশ্চর্য, সবাইকেই আমি অকায়ক্লেশে একে-একে পছন্দ করে' এসেছি।

প্রশস্ত রাস্তাটা যদি আমার মনঃপূত না হয় সেই জন্যে অনেক মেয়ে

অন্ধকার সঙ্কীর্ণ পথে আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চেয়েছে। অবিশ্যি তাদের মায়েদের মত নিয়ে। কিন্তু নির্ভুল বিয়েই যখন করবো তখন কাকে ভালোবাসলুম কি বাসলুম না, কবিত্ব করলুম কি করলুম না, বিপদ ঘটালুম কি ঘটালুম না, কিছুতেই কিছু যায় আসে না। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, বিয়ে যেই করলুম অমনি বিস্তীর্ণ পৃথিবী একটা তক্তপোষ হ'য়ে উঠলো আর প্রকাণ্ড আকাশটা হ'য়ে দাঁড়ালো একটা মশারি!

এই চমৎকার আছি—আমি আর আমার সাইকেল।

কিন্তু বিধাতার চক্রান্তে এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম, যেখানে পাট-শাক আর তামাক-পাতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। মাথার উপরে আকাশ নেই তা আমি বরং কল্পনা করতে পারতুম, কিন্তু দিনে-রাত্রে ঘূণাক্ষরেও একটি তরুণীর দেহ-রেখা দেখতে পাবো না এ একেবারে দুঃসহ দুর্দিনেও ধারণার অতীত ছিলো। জায়গাটা এমন বিশ্ববহির্ভূত যে মাইনর-ইস্কুলের উপরে মেয়েদের এখানে ক্লাশ নেই। এমন একটা কোনো হল্লা বা হুজুগ নেই যে সাড়ির দুটো চঞ্চল খসখসানি অন্তত শোনা যায়। ষ্টেশনে যেতে হ'লে ঘোড়ার গাড়িটা এদের কাঠের একটা সিন্দুক হ'য়ে উঠে। কারু বাড়ি থেকে কারু বাড়িতে বেড়াতে যাবার যে এদের রাস্তা সে আর-কারুরই বাড়ির ভিতর দিয়ে। এখানে এখনো এমন একটা ঝড় উঠলো না যে মেয়েরা ত্রস্ত হ'য়ে দ্রুত হাতে ঘরের জানলাগুলো বা বন্ধ করে' দেবে। এখানকার অফিসারগুলোও এমন প্রাদেশিক, সস্ত্রীক বেড়াতে বেরুবার পর্যন্ত কারু সাহস নেই। রোদ্দুরে হলদে-হ'য়ে-যাওয়া শুকনো মাঠের উপর দিয়ে কেবল সাইকেল চালিয়ে চলেছি।

এমন যে মহিমাময় সূর্যোদয়, জীবনে তা কখনো দেখিনি: তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে' মনে হয় নি। কিন্তু আজ তিন

মাস এই মহকুমায় এসেছি, সাইকেলে করে' কত চক্র আবর্তন করলুম, কিন্তু ঘাটে, জানলায় বা উঠানে এমন একটি মেয়ে দেখলুম না যাকে ক্ষণকালের জন্যেও তার ইহজন্মের ঘোরতর দুর্ভাগ্যের কথাটা মনে করিয়ে দিতে পারি। কেননা এমন মেয়ে দেখতেই আমার ভালো লাগবে যে সঙ্গোপনে একবার ভাববে, অন্তত আমি ভাববো সে ভাবছে, এর যদি মিসেস হ'তে পারতাম—এবং তখুনিই সচেতন হ'য়ে ভাববে, অন্তত আমি বুঝবো সে ভাবছে, এখনো তো তার সময় যায়নি! আমি যে হ'বো না, কিন্তু আমি যে হ'তে পারি—এই দর্পণের ভিতর দিয়ে একটি সাধারণ মেয়েকেও আমি আজ অপরূপ সুন্দর করে' দেখতে পারতুম, কিন্তু মুখোমুখি না হ'লে সেই বা ভাববে কী, আর আমিই বা বুঝবো কী!

লাল-ফিতে-বাঁধা ফাইলগুলো অনিদ্রাক্রান্ত রাত্রির কদর্য ক্লেদের মতো অসহ্য হ'য়ে উঠলো, বৈকালিক ক্লাবটা একটা পিঞ্জরাবদ্ধ চিড়িয়াখানা, সাইকেল-ঘূর্ণিত রাস্তাগুলি একটা ক্রমান্বিত কর্তব্য। এমন যে এখানে প্রসারিত প্রকৃতি, নীলে আর শ্যামলে, তাতে পর্যন্ত এতটুকু প্রাণ নেই। কেননা, আমি ভেবে দেখেছি, অনুচ্চারিত মনে কোনো রমণীর স্মৃতির সুষমা না থাকলে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ সম্ভোগ করা যায় না, সে নিতান্তই তখন একটা মানচিত্র হ'য়ে ওঠে।

এমনি যখন কচুরিপানাধ্বংস ও পাটচাষনিয়ন্ত্রণ নিয়ে ঘোরতর ব্যাপৃত আছি, হঠাৎ একটা অসম্ভব কাণ্ড ঘটে' গেলো। হ্যাঁ, সেটাকে ঘটনাই বলতে হয়। অবাক হ'য়ে ভাবলুম, এ আমি এতদিন ছিলুম কোথায়!

রেলোয়ে ষ্টেশনটা সহর থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। বসতিবিরল ক্ষেতের উপর দিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের সুরকির রাস্তাটা ষ্টেশন ছুঁয়ে লোকাল-বোর্ডের কাঁচা রাস্তা হ'য়ে গ্রামের মধ্যে চলে' গেছে। সেই সন্ধিস্থলের কাছাকাছি ছোট একটা মুদি-দোকান। দোকানটা এর আগে কোনোদিন

আমার চোখে পড়েছে কিনা মনে করতে পারলুম না, যদিও টুর শেষ করে' বহুদিন এরই পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরেছি। আজ হঠাৎ সেই দোকানটা চৌরঙ্গির শো-কেসের চেয়েও জাঁকালো মনে হ'লো।

নিচু আটচালায় বাঁশের মাচা বেঁধে এই দোকান—ভিতরের দিকে দরজা দেখে বোঝা যায় অন্তরালে দোকানির অন্তঃপুর আছে। মাচার উপরে কতগুলি মাটির গামলায় নানারকমের ডাল, নূন, শুকনো লঙ্কা, আদা-হলুদ থেকে এলাচ-সুপারি, জাপানি কিছু খেলনা, গৃহস্থালীর টুকিটাকি জিনিস, গ্রাম্য প্রসাধনের সস্তা সাজ-সরঞ্জাম। দোকানের লাগোয়া খানিকটা জমিতে ঘোড়ার একটা আস্তাবল, সন্ধের ট্রেনের সময় হ'য়ে এসেছে বলে' কোচোয়ান গাড়ি জুতছে।

দোকানে ভিড় দেখে হিসেব ক'র' দেখলুম আজ হাট-বার। পসারিরা সহরের বাজারে কেনা-বেচা করে' বাড়ি ফেরবার মুখে এখান থেকে কেউ রানি-মার্কা তেল, কেউ বা কড়াইয়ের ডাল কেউ বা এটা-সেটা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এত সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে না দেখে আমার উপায় ছিল না, যদিও দৃশ্যত সেখানে আমি নেমে পড়েছিলুম কাউকে দিয়ে একটা দেশলাই কেনাবার জন্যে।

'এই ছোঁড়া, শোন্।' রাস্তায় একটা ছোকরাকে ডাকলুম।

আমার ডাক শুনে গ্রামিক ক্রেতার দল ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো। নিরুপায় স্তব্ধ হ'য়ে গিয়ে এ ওর গা-টেপাটেপি করে' নিম্ন ভীত কণ্ঠে বলাবলি করতে লাগলো : 'সাহেব, বড়ো সাহেব।'

বড়ো ভালো লাগে নির্বোধ জনতার এই সভক্তি ভীতি দেখে। কিন্তু মাচার উপর বসে' কালো ফিতেয় কেশমূল দৃঢ় আবদ্ধ করে' যে মেয়েটি আনত আয়নার উপর ঝুঁকে পড়ে' ক্ষিপ্র আঙুলে বেণী বাঁধছে, তার ভঙ্গিতে এতটুকু একটু ত্বরা বা কুণ্ঠা এলো না। শুধু কটাক্ষকুটিল

কালো দু'টি আয়ত চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আবার কেশ-রচনায় মনোনিবেশ করলে।

ছোকরটা কাছে এলে তার হাতে একটা পয়সা দিলুম। বললুম, 'একটা দেশলাই নিয়ে আয় তো।' বলে' কেস থেকে একটা সিগরেট বের করে' বুড়ো আঙুলের নখের উপরে ঠুকতে লাগলুম।

মেয়েটি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হ'য়ে, মুখ না তুলে, তেমনি অনাড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছোকরাকে বললে, 'এ দুকানে দিশলাই নেই।'

ছেলেটা পয়সা ফিরিয়ে দিলো।

হঠাৎ মনে হ'লো, সাইকেলের শেকল বা ব্রেক কোথায় যেন কী বিগড়েছে। তাই এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে' ওটাকে মিথ্যে সজুত করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। দেখলুম এর মধ্যে মেয়েটি একবারো আয়নার থেকে চোখ তুললো না, অমনি নির্লিপ্ত বসে' বসে' হালকা হাসির ফোড়ন দিয়ে কারু-কারু সঙ্গে পরোক্ষে ফষ্টি-নষ্টি করছে। শুনলুম, স্পষ্ট শুনতে পেলুম, কোচোয়ানকে সম্বোধন করে' ও বললে, 'এই জামাল, সাহেবের কল খারাপ হ'য়ে গেছে, গাড়ি করে' কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে আয় না।' বলে'ই দীর্ঘপক্ষ্মজাল তুলে ও আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করলে।

এর পর আর সাইক্লে করে' ফেরা যায় না। তাই গম্ভীর মুখে কোচোয়ানকে উদ্দেশ করে' বললুম, 'এই, লাও গাড়ি।'

হুকুম শুনে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। সাইকেলটা নিজেই ছাদে তুলে দিলুম। গাড়িতে গিয়ে বসতেই সিগরেট ধরালুম। নিজের চার পাশে একটু নিভৃতি খুঁজে পেয়ে সন্তর্পণে তাকালুম মেয়েটি যদি একবার দেখে। কিন্তু তার অবজ্ঞাটা চমৎকার।

সেদিন কী ভাগ্যিস, ক্লাবে যেতে হ'লো না, আটটার আগেই ডিনার

খেয়ে বাইরে লনে, ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লুম। দুই চোখ ভরে' একসঙ্গে কত যে তারা দেখলুম, কত যে আশা আর ব্যর্থতা, তার ইয়ত্তা নেই। ভাবলুম, এ কী করে' সম্ভব হ'তে পারে।

মেয়েটি হিন্দুস্থানি, বয়েস আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে। গায়ে পীড়াদায়ক আঁট একটা কাঁচুলি, সাদার উপরে কালোর ছাপ-তোলা ফুরফুরে পাতলা একটা সাড়ি পরনে। রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডের থেকে সুরু করে' রৌদ্রঝলকিত নিষ্কাশিত তলোয়ারের সঙ্গে নারীদেহের বহু উপমা দেখেছি, কিন্তু ওর সেই ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিময় শরীর কথায় বোঝাতে পারি এমন কথা মানুষের ভাষায় তৈরি হয় নি। ওর সমস্ত অসাধারণত্ব ছিলো ওর দুই চোখে—সে কী আশ্চর্য চোখ—যেন গায়ের চামড়া ভেদ করে' হাড় পর্যন্ত এসে বিদ্ধ করে। সেই চোখে এতটুকু সুকোমল মোহ নেই, যেন বা কঠিন নিষ্ঠুর একটা বিদ্রূপ। যার দিকে তাকায় তাকেই যেন সে চোখ শাণিত সঙ্কেত করে: ধরা পড়ে' গেছ।

তারপর আরো দু'তিন দিন নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে দোকানের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে এটা-ওটা ফরমাজ করতে হয়েছে, কিন্তু ততোবারই মেয়েটি অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততায় গম্ভীর খবর পাঠিয়েছে—এ দোকানে তা পাওয়া যাবে না।

দোকানের ধারে ছোট পঙ্কিল একটা ডোবা ছিলো। সেদিন সটান পরে' হাণ্টার হাতে নিয়ে অনাবশ্যক প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলুম। দেখি, মেয়েটি একটা গুঁড়ির উপর বসে' এক পাঁজা বাসি-বাসন মাজছে। আস্কন্ধ অনাবৃত দুই বাহু, মাথার ঘোমটটা পিঠের উপর বিশৃঙ্খল, সমস্ত ভঙ্গিটা কেমন যেন অসহায়।

আমাকে দেখতে পেয়ে উচ্চ কলহাস্যে ও ডেকে উঠলো: 'এ লখ্না রে।'

ছ-সাত বছরের একটা ছেলে কোত্থেকে এলো ছুটে। তাকে চাপা গলায় কি-একটা ইসারা করতেই দুই হাতে মেয়েটির মাথায় সে পিঠের আঁচলটা অগোছাল করে' তুলে দিলো। বাহু দিয়ে টেনে-টেনে সেটাকে সুসঙ্গত করে' মেয়েটি তার বসায় একটা কাঠিন্য আনলে। ছেলেটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলে উদ্ধত প্রহরীর মতো। মনে-মনে প্রচণ্ড একটা মার খেলুম।

অথচ তার সাধারণ যা হাব-ভাব তাতে তার এই কঠিন গাম্ভীর্যের কোথাও কোনো সমর্থন পাওয়া যেতো না। তাকে যখন প্রথম দেখেছি, দেখেছি তরল হাসির ঢেউয়ে উছলে পিছলে পড়ছে, এর-ওর সঙ্গে হালকা চটুলতায় মুখর হ'য়ে উঠছে, ওর বসা ও দাঁড়ানো, ভেতরে চলে' যাওয়া ও দোকানে মাচার উপরে উঠে বসা ছোটখাটো সমস্ত ভঙ্গিতেই এমন একটা চাপল্য ছিলো যেটা সাদা চোখে ঠিক সুচারুসঙ্গত মনে হবার মতো হয়তো নয়, অথচ আমাকে দেখেই কিনা সে গাম্ভীর্যে নিটোল বা বিদ্রূপে ধারালো হ'য়ে ওঠে। হ'তে পারে, আমাকে সে ভয় করে; কিন্তু তার দোকান থেকে অপ্রাপ্য জিনিস কেনবার অনাবশ্যক ব্যস্ততা দেখে আমাকে আর তার ভয় করা উচিত ছিলো না। এবং, আমি যে কত বুড়ো অনুগ্রাহক এ-কথা তার অজানা নেই। সার্কেল-ইনস্পেকটারকে গোপনে ডেকে জিগগেস করলেই ওর এই দোকান সম্বন্ধে অনেক রোমহর্ষক ইতিহাস হয়তো শোনা যায়, অন্তত কতবার ও-দোকান সার্চ হয়েছে এবং কত রাতে ওখানে 'বি-এল' কেস-এর গোড়াপত্তন হয়েছে। এ-দোকান যে কিসের দোকান তা বুঝতে সামান্যতম কৌতূহলেরও হয়তো অবকাশ ছিলো না। দোকানের এই পরিবেশ, মেয়েটির এই সাজ-গোজ, ছলা-কলা, চাল-চলতি, সব চেয়ে তার এই অদ্ভুত একাকীত্ব—সব কিছুতেই সে অতিমাত্রায় স্পষ্ট ও

উদ্‌ঘাটিত। বলতে গেলে, এ-জানাটাই কিন্তু আমাকে সব চেয়ে বিঁধছে। অথচ তার দুই চোখের সেই অদৃশ্য রহস্যের সঙ্গে তার এই বিলসিত দেহসজ্জার কোনো সঙ্গতি খুঁজে পেতুম না। মনে হতো কোথাও একটা মস্ত বড়ো ভুল করে' বসেছি।

ভাবলুম, দূত পাঠাই। নির্জন রাতে অন্ধকার বাঙলোয় বসে' তাকে অভিসারিণী করে' তুলি। কিন্তু পাঠাই কা'কে? যে আজ আমার অনুচর, আমি বদলি হ'য়ে গেলে, সে-ই আবার আমার গুপ্তচর হ'য়ে উঠবে, অতএব কাউকে বিশ্বাস নেই। আমরা সব হারাতে পারি, খ্যাতি হারাতে পারিনে। কোনো ক্ষতিই ক্ষতি নয়, যদি খ্যাতি থাকে অব্যাহত। আর, এই খ্যাতি হচ্ছে আমাদের কাঁটার মুকুট। যতো সে শোভা ততো সে প্রতিবন্ধক।

অর্ডারলিকে বললুম, 'পায়ের রগে কেমন-একটা ব্যথা হয়েছে, সাইক্লে যেতে পারবো না। একটা গাড়ি চাই।'

অর্ডারলি জিগগেস করলে: 'ইষ্টিশান?'

'না, চালনায় যাবো। মাইল আষ্টেকের পথ। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের পাকা রাস্তা আছে।'

'নিয়ে আসি।'

'আর, শোনো।' তাকে বাধা দিলুম: 'জামালের গাড়িতে নতুন রং করেছে, নতুন টায়ার বসিয়েছে চাকায়। ওটা আনতে পারবে না?'

'পারবো।'

অর্ডারলি জামালের গাড়িই হাজির করলে। একটা পোর্টফোলিও নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে কাউকে নিলুম না।

জামালকে যদি ভিতরে বসিয়ে গল্প করি তবে গাড়ি চলে না, অতএব সহরের সীমানা পেরিয়ে যেতে আমিই কোচবাক্সে উঠে বসলুম। খুব

একটা মজা হচ্ছে এমনি একখানা ছেলেমানসি ভাব দেখিয়ে লাগামটা তুলে নিলুম। জামাল পাশে বসে' পরম আপ্যায়িত বোধ করতে লাগলো।

জিগগেস করলুম, 'গাড়িটা বুঝি তোমার ?'

জামাল কুণ্ঠিত হ'য়ে বললে, 'আমার নয়। গৌরীয়ার গাড়ি।'

'কে গৌরীয়া ? ঐ যার মুদি-দোকান ?'

'হুঁ। আমি ঠিকে খাটি। মাইনে পাই। পনেরো টাকা মাইনে।'

'বটে! ওর তো তা হ'লে অনেক পয়সা!'

'তা হয়েছে অল্প-বিস্তর। আগে ছাগলের দুধ বেচতো, কিছু-দিন ইষ্টিশানে ঝাড়াপোঁছারো নাকি কাজ করেছে।'

জিগগেস করলুম : 'ওর বাড়ি কোথায় ?'

'ফয়জাবাদ না মজঃফরপুরে।'

'এখানে এসেছে কেন ?'

'স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে'।'

'বলো কি, ওর বিয়ে হয়েছিলো নাকি ?'

'আজ ছ' বছর। স্বামী ওকে একদিন নাকি খুব মেরেছিলো উনুনে রান্না বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলে'। তাই সে রাগ করে' পালিয়ে এসেছে।'

'আর ফিরে যাবে না ?'

'তা একবার দেখুন না বলে'। মারতে আসবে।'

'ঠিকই তো। কেনই বা ফিরে যাবে বলো, যখন এখানে ওর কোনো দুঃখ নেই।' ঘোড়ার পিঠে টেনে একটা চাবুক কসলুম, বললুম, 'কিন্তু ওর স্বামী ওকে নিতে আসে না ?'

'পাছে সে আসে সেই জন্যে বালিসের তলায় ও প্রকাণ্ড একটা ছুরি নিয়ে শোয়।'

একটু ভয় পেলুম বোধহয়। বললুম, 'অন্যের বেলায় সে-ছুরি বুঝি তার চোখের তারায় ঝিল্‌কিয়ে ওঠে।'

কথাটা আস্বাদ করবার মতো জামালের ততো সূক্ষ্মতা ছিলো না। তাই ফের বললুম, 'ভেতরে তো ছোট্ট একটুখানি খোপরি, ঐখানে তোমাদের জায়গা হয় কি করে'?'

'কী সর্বনাশ', জামাল সর্বাঙ্গে শিউরে উঠলো : 'আমি থাকবো ও-ঘরে ? বলেন কি, বাবুসাব, আমি যে ওর চাকর, মাইনে খাই।'

অনুভব করলুম যুবক জামালের বলদৃপ্ত কঠিন শরীর যেন মুহূর্তে সঙ্কুচিত, পাংশু হ'য়ে উঠলো।

'তবে ওখানে থাকে কে ?'

'ওর দেশের বুড়ো এক ঝি আর ওর ঐ ছুরি।'

'আর কেউ না ?'

'আমি তো কখনো দেখি নি।' বলে' জামাল আমার হাত থেকে লাগাম তুলে নিলো। আমি পরাভূতের মতো গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলুম।

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতেই ঘোরতর মেঘ করে' এলো। কলেজ ছাড়বার পর সেই প্রথম সেদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরলুম। অমাবস্যা বলতে যেমন অন্ধকার, আমাকে বলতেও তেমনি হ্যাট-কোট বোঝাতো। চিতেবাঘ যদি তার দাগগুলো মুছে ফেলে, সে একটা শেয়াল হ'য়ে ওঠে, আমিও তেমনি টাই-ট্রাউজার ফেলে মফস্বলে শ্বশুরবাড়ি করতে আসা সহরের ফুলবাবুটি হ'য়ে উঠলুম। নিজেকে চিনতে নিজেরই অত্যন্ত দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, অন্যে পরে কা কথা!

ঈশ্বর সদয় ছিলেন, তাই তখুনিই বৃষ্টি নামলো যখন প্রায় দোকানটার কাছে এসে পড়েছি। বৃষ্টির থেকে ক্ষণিক পরিত্রাণ পাবার জন্যেই যেন আশ্রয়ের বাছ-বিচার না করে' দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

দেখলুম, আগেই দেখেছিলুম, ঝোলানো লণ্ঠনের আলোতে গৌরীয়া মাচার উপরে পা টান করে' বসে' সুর করে' কি পড়ছে। বুড়ো-মতন কে-একটা স্ত্রীলোক, বোধহয় ওর দেশের সেই ঝি হ'বে, মাটিতে বসে' তাই শুনছে গদ্‌গদ হ'য়ে।

আমাকে দেখে গৌরীয়া থামলো, কিন্তু, আশ্চর্য, একটুও চমৎকৃত হ'লো না। ঝি-কে শুধু বললে, 'মাচার তলা থেকে মোড়াটা বার করে' দে।'

মোড়া বার করে' দিলো। ছাতাটা মাচার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে ওয়াটার-প্রুফটা কোলে নিয়ে বসলুম। কিন্তু কী বলি ওকে? আমাকে দেখে কোথায় ও অভ্যর্থনায় অজস্র হ'য়ে উঠবে, তার বদলে এমন একখানা মুখ করে' রয়েছে যেন আমি মধু-উৎসবে উদ্যত একটা মৃত্যুদণ্ডের মতো এসে বসেছি। কোথায় বা তার সেই ছলনা, কোথায় বা তার সেই ছুরি!

ঝি-কে ও ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'তুই ভেতরে যা, বাবুর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

নামের আগে বা পিছে বাবু-শব্দটা যে মোটেই পছন্দ করি না বাঙালাভাষানভিজ্ঞ গৌরীয়ার তা জানবার কথা নয়, তবু মনে হ'লো ও-কথাটার মধ্যে ও যেন ইচ্ছে করে'ই একটু অবজ্ঞা মিশিয়েছে। তবু বৃষ্টিমুখর মুহূর্তে ক্ষণিক একটু নিভৃতির সূচনা হ'ল মনে করে' খুসি হলুম।

কিন্তু গৌরীয়ার কথা গৌরীয়াই জানে। রাস্তার দু'পাশের নালাগুলি জলে ভরতি হ'য়ে গেলো। গৌরীয়া একমনে রামায়ণের পৃষ্ঠা উলটোচ্ছে।

শেষকালে আমিই কথা কইলুম। বললুম, 'সত্যি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, বলবো?'

আনত চোখে কঠিন গলায় গৌরীয়া বললে, 'যদি অন্যায় না হয়, বলুন।'

না, সে কি কথা, অন্যায় আবার কী বলতে পারি আমি, তাই শুকনো

একটা ঢোঁক গিলে বললুম, 'এত রাতে, এখনো তোমার দোকান খুলে রেখেছ যে ?'

ও চোখ তুলে একটু হাসলো। বললে, 'খোলা না রাখলে বৃষ্টিতে ভিজে লোক এসে দাঁড়াবে কোথায় ?'

কথাটা ঠিক আমাকেই নিক্ষেপ করেছে দেখলুম।

ঠিক সেই সময়টাতে কে-একজন বৃষ্টিতে গান ভাঁজতে-ভাজতে দোকানে এসে দাঁড়ালো। দোকানে ঢুকে সেই গানটা সাড়ম্বর নৃত্যের ভঙ্গিতে রূপান্তরিত হ'তে যাচ্ছিলো, আমাকে দেখে লোকটা হঠাৎ জিভ কেটে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো।

তাকের উপর থেকে একটা শিশি টেনে এনে গৌরীয়া বললে, 'এই তোমার তেল', আরেকটা পুঁটলি বের করে' : 'এই তোমার নুন।' বলে'ই ঝিকে হাঁক দিলে। বললে, 'ঘরে একটা ছাতা আছে না ? ওকে দিয়ে দে, ক্রোশ তিনেক দূরে ওর গাঁ, ও বাড়ি চলে' যাক।'

ঝি ছাতাটা বার করে' আনলো। গৌরীয়া লোকটাকে বললে, 'শিগ্‌গির পালা।' এক্ষুনি আবার চেপে আসবে।'

গৌরীয়া আমার দিকে ব্যথিত চোখে তাকালো। বললে, 'আপনিও এবার বাড়ি যান, বাবুসাহেব। নইলে, এর পর আবার কোনো লোক যদি আসে, তবে তাকে তাড়াবার জন্যে আপনার ছাতাটাই তাকে দিয়ে দিতে হ'বে। সেটা ভালো হ'বে না। আপনি বাড়ি যান।'

কথার চেয়ে কথার সুরটি ভারি ভালো লাগলো। বললুম, 'বৃষ্টিটা না ধরা পর্যন্ত তোমার এখানে একটু বসতে দিতেও তোমার আপত্তি আছে ?'

'আছে।' গৌরীয়া নিষ্প্রাণ গলায় বললে, 'জায়গাটা ভালো নয়।'

'তাতে আমার কী ! বাইরে জল পড়ছে, তাই এখানে আমি একটু বসে' রয়েছি বই তো নয়।'

'কিন্তু গরিবের ঘরে মুক্তোর হার দেখলে লোকে তা চোরাই মাল বলে'ই সন্দেহ করে, বাবুসাহেব।' গৌরীয়ার সমস্ত ভঙ্গিটি বেদনায় যেন নম্র হ'য়ে এলো : 'তাতে গরিব আরো গরিব হয়, আর, তাতে মুক্তোরও সেই দাম থাকে না। আপনি বাড়ি যান।'

'বা, বিপদে পড়ে' তোমার এখানে এলে কেউ দাঁড়াতে পাবে না?'

'কিন্তু আমার ভয় হয় বাবুসাহেব, এখানে এসে না তুমি বিপদে পড়।' গৌরীয়া ঈষৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো : 'এখনো অনেক পসারীর সওদা নিয়ে যেতে বাকি। বৃষ্টির জন্যে পথে কোথাও নিশ্চয় আটকা পড়েছে। তোমাকে তারা এখানে দেখবে, শুকনো ছাতা আর শুকনো বর্ষাতি নিয়ে মোড়ার ওপর শুকনো মুখে বসে' আছে, এ আমি কিছুতেই দেখতে পাবো না। আমি ছোট আছি, কিন্তু তুমিও ছোট হ'বে এ দেখতে বুক আমার ফেটে যাবে, বাবুসাহেব।'

বলে'ই সে ঝি-কে ডাকলে; বললে, 'ডোঙাটা মাথায় করে' জামালকে ডেকে নিয়ে আয় তার বাড়ি থেকে। গাড়িটা বার করতে হ'বে। বাবুসাহেবকে পৌঁছে দিয়ে আসবে তাঁর কুঠি।'

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম, 'না, গাড়ি কেন? হেঁটেই চলে' যেতে পারবো।'

রেইন-কোটটা গায়ে চাপিয়ে রাস্তায় নেমে আসছি, পিছন থেকে গৌরীয়া বললে, 'নমস্কার।'

তাকালুম না পর্যন্ত। প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে এলুম। কুঠিতে গিয়ে কতক্ষণে যে এই ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে আবার পরিচিত সার্ট-ট্রাউজারে উপনীত হ'ব তারি জন্যে হাঁপিয়ে উঠলুম। মনে হ'লো একটা অতলান্ত অপমৃত্যু থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু সে কি ঈশ্বর?

শুধু ঐ দোকান, নয় এই সহরই আমাকে ছাড়তে হ'বে। ড্যালহৌসি

স্কোয়ারে তাই অনেক সই-সুপারিশ করে' মাস তিনেক পর বদলি পেলুম।

মাল-পত্র আগেই রওনা হ'য়ে গেছে; পরে আমি, একা; বলা বাহুল্য, জামালের গাড়িতে নয়। ষ্টেশনে ছোটখাটো একটা ভিড় হ'বে ও বহু লোকের সঙ্গে অনেক মুখস্ত-করা মামুলি কথা বলতে হ'বে, সেই ভয়ে ট্রেনের খুব সঙ্কীর্ণ সময় রেখেই আমি বেরুলুম।

গৌরীয়ার সেই দোকানের পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। দেখলুম, মাচার উপরে গৌরীয়া নেই। গামলাগুলি খালি, এ ক'দিনে দোকানের শ্রী অনেক কমে' গেছে মনে হ'লো। ভাবলুম, যাবার সময় ওকে একটিবার দেখে গেলে ভালো লাগতো।

দেখলুম, পাশের সেই পুকুরধারে শাখাবাহুল্যবর্জিত কি-একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সে আমার যাওয়া দেখছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই সে অল্প একটুখানি হাসলো। সেই অল্প-একটুখানি হাসা যে কী অপরূপ তা বুঝিয়ে বলি এমন শক্তি নেই। আজকের ভোরবেলাটির মতোই বিষাদে নির্মল, বিরহে সকরুণ সেই হাসি। দুঃখকে, ক্ষতিকে, অপরিসীম শূন্যতাকে সামান্য হাসি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হ'বে এমন যদি কোনো পরীক্ষা থাকে সংসারে, তবে সেই পরীক্ষায় গৌরীয়া ফুল-মার্ক পেয়েছে। একদৃষ্টে এতক্ষণ ধরে' ও কোনোদিন আমার দিকে তাকায় নি। আজ দেখলুম তাতে কত বিষাদ, কত স্নেহ, কত শান্তি।

গাড়িটা খানিক দূর চলে' এসেছে। বললুম, 'চললুম, গৌরীয়া।'

গৌরীয়া হয়তো শুনতে পেলো না, কিন্তু যাবার সময় কিছু একটা তাকে বলে' গেছি মনে করে' সে আঁচলে চোখ চেপে ধরলো।

এত দিনে মনে হ'লো বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছি।

# পুষ্পরাণী দে

পুতুল-দিকে আমার মনে হ'তো যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। বা, সম্পূর্ণ পারেন নি নেমে আসতে। শূন্যের উপর ভাসমান একটা আভা, যেন তাকে ধরা যাবে না, অথচ চোখের সামনে দীপ্তি পাচ্ছে।

পুতুল-দি আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়ো, আমি এই বোশেখে ষোলয় পা দিয়েছি। পুতুল-দির ভাই তপন আমার বন্ধু, আমরা ফার্ষ্ট ইয়ারে। সেই সুবাদে এ-বাড়ি আমার যাওয়া-আসা। ক্রমে-ক্রমে পুতুল-দির মাকে আমি মাসিমা বলতে শিখেছি এবং সেই শেকড় থেকে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়তে আমার দেরি হয় নি।

আমার বাড়িটাও বিশেষ দূরে নয়, আমার মতো বয়সে ইচ্ছে করলেই সেটুকু পথ সটান্ পায়ে আসা যায়, কিন্তু সেটাকে আমি সময়ের অপচয় বলে' মনে করতুম, যখন হাতের কাছেই বাস্-ট্রাম গিসগিস করছে। সময়কে আমরা নিরর্থক দিন-রাত্রির কোঠায় ফেলে আলাদা করেছি, একেকটি মুহূর্তে কোটি সূর্যের উদয় ও কোটি সূর্যের অবসান হ'তে পারে—তাই সকালবেলায় গিয়েছি বলে' সন্ধ্যায় যেতে পারবো না, বা সন্ধ্যায় এতোক্ষণ কাটিয়ে দিয়ে এলুম বলে' ফের চলে' আসতে পারবো না ঘুমন্ত মধ্যরাত্রে—এমন কোনো কৃত্রিম ও কৃপণ নিয়মের আমি ধার ধারতুম না। তবু মাঝে-মাঝে আমি সংযম অভ্যাস করতুম, যেতুম না কোনোদিন, এবং যেদিন যেতুম না সে-দিনটা আমার একটুও

ভালো লাগতো না, মফস্বলে বসে' খবরের কাগজ না পেলে যেমন লাগে।

ও-বাড়িতে আমার সমবয়সী মেয়ে দু'য়েকটি ছিলো, সমবয়সী মানে আমার চেয়ে ছোট, অর্থাৎ বয়েসে যাদের সঙ্গে ঠিক সমতা না থাকলেও সঙ্গতি রাখতে পারতুম অনায়াসে। কিন্তু, কেন কে জানে, ও সব প্রজাপতি-চপলতা আমাকে আকর্ষণ করতো না; একতলার সমস্তটা ও দোতলার অধিকাংশ ছেড়ে দিয়ে আমি কোণের ঘরটিতে এসে বসতুম, যেখানে শীতের রাতে স্বল্প, খাটো আঁচলে কুণ্ঠিত কাঁধ দু'টি ঢেকে পুতুল-দি স্তব্ধ হ'য়ে বসে' একমনে ফিলজফি পড়ছেন। হয়তো, আমার চেয়ে অনেক তিনি বড়ো, বয়েসে ও বুদ্ধিতে, এমন-কি দৈর্ঘ্যে ও আয়তনে, কোনো কালেই তাঁকে ধরা-ছোঁয়া যাবে না, অনন্তকাল তিনি আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার কল্পনাতীত ঊর্ধ্বে বিরাজ করবেন, হয়তো তারি জন্যেই তাঁর প্রতি আমার একটা গভীর মোহ ছিলো, প্রতিমার প্রতি পূজারীর যে-মোহ।

সন্ধে বেলা, দলে-দলে ছেলেমেয়েরা এখানে-সেখানে কেউ ক্যারম খেলছে, কেউ ক্রস-ওয়ার্ড পাজল্ করছে, কারা বা গ্রামোফোন দিয়েছে ঘুরিয়ে, ভবানীপুর বা বরানগর থেকে কোনো-কোনো আত্মীয় এসেছেন বেড়াতে, বাড়িময় অট্টহাসি আর হট্টগোল, ছবি চা করছে, মাসিমা সাবুর পাঁপর ভাজছেন, কিন্তু পুতুল-দির মুখে বিরক্তি নেই—নির্লিপ্ত, নিঃশব্দ তন্ময়তায় বই মুখে করে' বসে' আছেন। সমস্তর থেকে তিনি যেন কেমন খাপছাড়া, ছন্দে ধরা যাচ্ছে না এমন যেন একটা কবিতার ভাব, অথচ তাঁর এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কোথাও এতটুকু চেষ্টা নেই, রূঢ়তা নেই; একলা থাকাটাই যেন তাঁর মুক্তি।

আশ্চর্য, আমি তাঁকে কোনোদিন সাজতে দেখি নি, সাজা অর্থে, মেয়েদের যা বোঝায়। খোঁপাটা বাঁধতে পর্যন্ত তাঁর আলস্য। কলেজ

ও বাড়ির মধ্যে মাত্র তাঁর একটা পেটিকোটের ব্যবধান। দু'হাতে সোনার সূক্ষ্ম দু'গাছি কাকুতি ছাড়া সমস্ত গায়ে তাঁর একফোঁটা গয়না নেই, অথচ ও-দিকে ছবির কানবালাটা টন্‌সিলে এসে ঠেকেছে। পুরোনো হাতির দাঁতের মতো হলদেটে-সাদা মসৃণ তাঁর গায়ের রঙ কেমন তাই একটু বিষণ্ণ লাগতো। পোষাকটা যেন তাঁর মনে হ'তো অনাবশ্যক রূঢ়তা, বাড়ির সামনে বেড়া বেঁধে বাগান করার মতো। তাঁর সৌন্দর্যে যে ত্রুটি ছিলো না তা নয়, কিন্তু ভাষার আদিম যুগে নিরলঙ্কার গ্রাম্য কবিতায় যে সরল মাধুরী ছিলো, সেই সুষমাকে যেন তাঁর সমস্ত অসম্পূর্ণতা খুলে ধরেছে। তাঁর রিক্ত মণিবন্ধ, শূন্য কণ্ঠতট, বিশৃঙ্খল চুল, অনুচ্চারিত পোষাক—সব কিছু মিলে তাঁকে যেন আমার মাটির মানুষ বলে' মনে হ'তো না।

আমার ভারি ইচ্ছে করতো, পুতুল-দির খাওয়া দেখি। আমার কেবলই মনে হ'তো, নিশ্চয়ই তাঁর পেট ভরে না। রাত্রে যতোক্ষণে তিনি খান, ততোক্ষণ আমার পক্ষে বাড়ির বাইরে থাকা কল্পনার বাইরে; দিনের বেলা, বলতে কি, দিনের বেলায় ও-কথাটা আমার ততো মনে হয় নি। তবে এটা স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি ক্ষুধাকে যেন তিনি বড্ড বেশি সীমাবদ্ধ করে' রেখেছেন। কতদিন তাঁর ঘরে ঢুকে দেখেছি বৈকালিক চায়ের বাটিটা কালিয়ে কালো হ'য়ে এসেছে, পুতুল-দির খেয়াল নেই। তাঁর পড়ার ফাঁকে মাসিমা হয়তো অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর লুব্ধতা থেকে সঙ্গোপনে রক্ষা করে' কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছেন, পুতুল-দি অনায়াসে মুখ কুঁচকালেন। অথচ মাসিমার মুখেই শোনা গেলো কলেজ থেকে এসে অবধি পুতুল-দি দাঁতে কুটো কাটেন নি।

আর যাই হোক, আমি তাঁকে কক্ষনো ক্ষমা করতে পারতুম না, তিনি যখন সিনেমার উপর নিরুত্তেজ তাচ্ছিল্য দেখাতেন। যেন জীবনের

সমস্ত সম্পদ চুরি হ'য়ে গেলো, নিজেকে এমনি নিঃস্ব, ছোট মনে হ'তো। ছবি আর লীলা অবিশ্যি সিনেমা বলতে অজ্ঞান, ক্লদেৎ কোলবার্ট কি সাবান গায়ে মাখে তা পর্যন্ত তাদের মুখস্ত, অথচ এত কাছে থেকেও 'চিত্রা'-টা কোথায় তাঁর জানা নেই। তাঁকে ক্ষমা করতে পারতুম না। বরং কেমন যেন তাঁকে দূর, ধূসর, রহস্যময় মনে হ'তো।' ঘুম-ভাঙা মধ্যরাত্রে আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পেতুম একটি নীল একাকী তারা—মনে-মনে তাকে আমি প্রণাম করতুম, স্বপ্নে হাত বাড়িয়ে দিতুম আকাশে, অপার শূন্যতা আমার ভারি মধুময় লাগতো।

সেদিন তাঁর ঘরে বসে' পুতুল-দি পড়ছেন সন্ধেবেলা, আমি হঠাৎ নুয়ে পড়ে' তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে' বসলুম। টেবিলের নিচে মলিন, বিষণ্ণ দু'খানি পা, যেন মেঝের উপর নিতান্ত অসংলগ্ন অবস্থায় পড়ে' আছে।

পুতুল-দি চম্‌কে উঠলেন, ভারি ভালো লাগলো তাঁর এই চম্‌কে-ওঠা-টুকু। বললেন, 'এ কি ?'

লজ্জিত, রক্তিম গলায় বললুম, 'আজ আমার জন্মদিন, পুতুল-দি।'

'জন্মদিন ? এটা কি মাস খেয়াল রাখো ?'

'রাখি।'

'কি ?'

'আষাঢ়।'

'তোমার না বোশেখ মাসে জন্ম ?'

'ফিরতি বোশেখ আসতে এখনো অনেক দেরি। তাই বলে' আমি আর জন্মাবো না নাকি ?'

পুতুল-দি হেসে উঠলেন, আশ্চর্য, শব্দ করে'। একসঙ্গে তাঁর অনেকগুলি দাঁত দেখলুম। বললেন, 'এত ঘন-ঘন জন্মালে তুমি যে দেখতে-দেখতে বুড়ো হ'য়ে যাবে।'

'তাই তো আমি চাই। আমি যে ছোট, সে-ই তো আমার অভিশাপ।'

আরেক দিন, রাত্রির তখন কৈশোর, পুতুল-দি আমাকে বারান্দা থেকে ইসারায় কাছে ডেকে এনে চুপি-চুপি জিগগেস করলেন, 'আমার একটা কাজ করতে পারবে, অরুণ?'

সেই চুপি-চুপি-ডাকা আমি যেন এখনো শুনতে পাচ্ছি।

'পারবো।'

পুতুল-দি আমাকে একটা গলির নাম বললেন। 'চেনো?'

'চিনি।'

'না, তুমি চেনো না।'

'না-চিনলেও চিনি।' ব্যস্ত হ'য়ে বললুম, 'দু'টো পা থাকতে খুঁজে নিতে কতক্ষণ? বলো, কি করতে হ'বে?'

কানে-কানে বলার মতো করে' পুতুল-দি আরো অস্ফুট, আরো গাঢ় গলায় বললেন, 'আমার এই চিঠিটা নিয়ে যেতে পারবে,—কুড়ি-নম্বরের বাড়ি, ক্ষিতীশবাবুর কাছে, ক্ষিতীশচন্দ্র মহলানবিশ, পারবে?'

'একশো বার।'

ভাঁজ-করা পাতলা একটা কাগজের টুকরো পুতুল-দি আমার বুক-পকেটের মধ্যে সন্তর্পণে গুঁজে দিলেন।

এতদিন, সর্ব্বান্তঃকরণে, এ-ই যেন আশা করেছিলুম। এতদিনে পুতুল-দির প্রকৃতিস্থতা যেন খুঁজে পেলুম, তাঁর রহস্যের জটিল একটা গিঁট খুললো। এতদিনে যেন তিনি সঙ্গত, সম্পূর্ণ, সুসম্বদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। এই তাঁর ঔদাস্য আজ আরো মধুর, তাঁর নির্লিপ্ততা আরো সুন্দর বলে' মনে হ'লো।

বললুম, 'জবাব নিয়ে আসবো?'

বইয়ের দিকে কুণ্ঠিত চোখ নামিয়ে পুতুল-দি ধূসর গলায় বললেন, 'একদিন সময় করে' আসতে বোলো এখানে।'

অনেক দিন নিশ্চয় তিনি আসেন নি, এই ক্ষিতীশবাবু। কেন না আমি তো তাঁকে দেখি নি এখানে। কিম্বা যখন তিনি আসেন, আমার মত নিয়মহীনের পক্ষেও সেটা লজ্জাকর সময়, হয়তো বা নিশুতি মধ্যরাত্রে। নিঃশব্দ দুপুরবেলায়ো হ'তে পারে, যখন আমি মূর্খের মতো কলেজের প্রথম বেঞ্চিতে বসে' বইয়ের মার্জিনে প্রফেসারের নোট টুকছি। বিশেষ এ-বাড়িতেই বা তাঁদের দেখাশোনা হ'বে কেন? পুতুল-দিকে কতদিন শুনেছি বাস-এর আশ্রয় না নিয়ে সোজা পায়ে হেঁটেই বাড়ি চলে' এসেছেন। পায়ের তলায় পৃথিবী কখনোই সীমাবদ্ধ নয়, এবং ক্ষিতীশবাবুদের যে-গলিটার তিনি নাম করলেন তাতে কোনো বাস ঢুকতে পায় বলে' নিঃসন্দেহ হ'তে পাচ্ছি না।

কেমন না-জানি তাঁকে দেখতে, এই ক্ষিতীশবাবুকে। হয়তো বা নির্ধূম, ঊর্ধ্বগ দীপশিখার মতো। অনেক বলবান, অনেক উদ্ধত, হয়তো বা কোষমুক্ত তলোয়ারের মতো নির্মম। যাবার আগে পুতুল-দিকে লুকিয়ে একটু দেখলুম, তাঁর শরীরময় ক্লিষ্ট বিশীর্ণতাটি আজ বাঁশির সুরের মতো করুণ লাগলো। বুঝলুম তাঁর এই ঔদাসীন্য, এই অপার্থিব নিস্পৃহতা, কেন তাঁর পেলব গালের উপর বিষণ্ণ একটি আভা পড়েছে, চোখের পল্লবের নিচে কিসের তাঁর সেই সলজ্জ কোমলতা। এটুকু না হ'লে তাঁকে মানাতো না, মোমতাজের স্মৃতি না থাকলে তাজমহল একটা কী!—মৃত শ্বেত পাথর! জানি ক্ষিতীশবাবু নিশ্চয়ই একদিন আসবেন—পৌরাণিক নাটকে নায়ক যেমন হঠাৎ ষ্টেজে ঢুকে পড়ে' নায়িকাকে ঘোড়ার ওপর তুলে নিয়ে দ্রুত চম্পট দেয়, হয়তো বা তারো চেয়ে আকস্মিক। কিন্তু ঈশ্বর করুন, সেদিন যেন নেপথ্য থেকে পুতুল-দিকে আমি একবার দেখতে

পাই, কেমন করে' তাঁর সমস্ত শরীর অন্ধকার রাত্রির নদীর জলের মতো তারার আলোয় ঝলমল করে' ওঠে।

বুকটা পুড়ে যাচ্ছিলো পুতুল-দির সেই চিঠির উত্তাপে, কিন্তু, প্রতিজ্ঞা করে' বলতে পারি, সেই চিঠির একটি অক্ষরো আমি পড়ে' দেখি নি। অথচ তাতে এতটুকু নিষেধ ছিলো না, বাধা ছিলো না, ভাঁজ ভেঙে চিঠিটা বরং পকেটের মধ্যে ফুলে রয়েছে। মনে হয়েছিলো যা অত্যন্ত সত্য তাই অত্যন্ত সহজ; সামান্য 'তুমি একবার এসো'—তারি মধ্যে অনন্ত জীবনের কান্না। আমি সেই চিঠি পড়ি নি মানে প্রেমের মর্যাদা রেখেছি। আমাকে ছাড়া পুতুল-দি এ-চিঠি আর কাউকে দিতে পারতেন না, এমন অকপটে, এমন ভালোবেসে।

পানের দোকান থেকে দেয়াশলাই কিনে বাড়ির নম্বর চিনলুম। বাইরের ঘরে ঘাড়হীন মোটা একটা বয়স্ক লোক মেঝেতে খালি-গায়ে হুঁকো সাজছে। বললুম, 'এটা ক্ষিতীশবাবুর বাড়ি?'

'কেন?'

'বাবুকে ডেকে দাও শিগগির।'

'কে হে ছোকরা?' লোকটা ঘাড় ফেরাবার অমানুষিক চেষ্টা করলো: 'কি চাই তোমার?'

'তোমার সঙ্গে আমার কথা বলবার সময় নেই, বাবুকে ডেকে দাও এক্ষুনি। আমার বিশেষ দরকার।' বলে' কারু কোনো অপেক্ষা না করে' ঘন-ঘন দরজার কড়া নাড়তে লাগলুম।

লোকটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আমার হাতটা পাশবিক চেপে ধরলো। গর্জন করে' বললে, 'কী দরকার? আমিই ক্ষিতীশবাবু।'

সমস্ত শূন্যে ঈশ্বরের প্রবল অট্টহাস্য শুনতে পেলুম। গলায় কথা পেলুম না।

আমাকে আমূল ঝাঁকুনি দিয়ে ক্ষিতীশবাবু বললেন, 'কী নাম তোমার? কোন কলেজে পড়ো? গার্জিয়ান কে?'

'আমি—আমি কি জানি!' ভীত, পাংশু গলায় বললুম, 'আমাকে পুতুল-দি পাঠিয়েছেন।'

'কে পুতুল-দি? বাড়ি কোথায়?'

পুতুল-দির ঠিকানা বললুম।

ক্ষিতীশবাবু আমার হাত ছেড়ে দিলেন, ঘাড়টা যেন হঠাৎ একটু নড়ে' বসলো। বললেন, 'ও! পুষ্পরাণী? পুষ্পরাণী দে? কেন কি হয়েছে?

জানতুম, পুতুল-দির অমনি একটা জঘন্য নাম আছে, তার জন্যে পুতুল-দিই সব চেয়ে বেশি পীড়িত, কিন্তু কেউ এমন বর্বরের মতো তা নির্লজ্জ উচ্চারণ করতে পারে ভাবতে পারতুম না।

বললুম, 'ক্ষিতীশবাবুকে—আপনাকে তিনি একটা চিঠি দিয়েছেন।'

যেন নিজের মৃত্যুদণ্ড স্বাক্ষরিত করাচ্ছি এমনি ভাবে চিঠিটা বাড়িয়ে দিলুম।

ক্ষিতীশবাবু চোখ বুলোলেন কি বুলোলেন না। বললেন, 'ও! নোট বইটা? দাঁড়াও, দিচ্ছি।'

উপর থেকে মোটা একটা একসারসাইজ-খাতা এনে আমার হাতে দিলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'পুষ্পাকে বোলো, এবার ফোর্থ-পেপারটা আমিই হয়তো সেট্ করছি, পসিবল্ কোশ্চেন্স্ পরে যা-হয় দেয়া যাবে।' তারপরে তিনি যখন আজকালকার ছেলেদের অবিনয় নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা ফাঁদবার জন্যে গলা খাঁখ্রেছেন, সোজা কেটে পড়লুম অবিলম্বে।

সেই মোটা একসারসাইজ-খাতাটা গ্যাসের তলায় এনে মেলে ধরলুম। সন্দেহ নেই মালিকের নাম ক্ষিতীশচন্দ্র মহলানবিশ, পুতুল-দিদের

কলেজের প্রফেসার। কিন্তু আশ্চর্য, পৃষ্ঠার ফাঁকে সে-চিঠিটা তিনি অনায়াসে ফিরিয়ে দিয়েছেন! ভয় নেই, এবারো আমি তা পড়লুম না, নখে চিরে ছিঁড়ে ফেললুম টুকরো করে'।

পুতুল-দি আমাকে ভীষণ বঞ্চিত করেছেন, এমনি মনে হ'লো। যেন পাহাড়ে যাবো ভেবেছিলুম, এসে পড়লুম সমুদ্রের কিনারে। তাই একেবারে হতাশ হয়েছি এমন কথাই বা বলি কি করে'? মনে হ'লো পুতুল-দির চারদিকে শুভ্রতার মুক্তি, সমুদ্রের হাওয়ায় মতো। সেখানে কারু এতটুকু একটা নিশ্বাসের রেখা পড়ে নি, তুষারের মতো ঠাণ্ডা, শক্ত, পবিত্র তাঁর সেই নির্জনতা। কেউ কোথাও নেই, তবু আমি যেন কোথাও আছি, হ'লোই বা না তা জন্ম ও মৃত্যুর বহু যোজন দূরে, এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তের ব্যবধান, তবু আমি আছি, আকাশের তারার দিকে চেয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা যেমন আছে।

দাগিয়ে-দাগিয়ে সেই খাতাটা পুতুল-দি জর্জরিত করে' তুললেন। বললুম, 'এত পড়ে' তুমি কি করবে পুতুল-দি?'

লঘু চপলতায় পা দু'টি ঈষৎ দোলাতে-দোলাতে পুতুল-দি বললেন, 'বিলেত যাবো।'

আমি আমার ঘরে শুয়ে নীল ও নিরালা সেই তারার দিকে চেয়ে কতদিন দেখেছি সমুদ্রে জাহাজ ভেসে চলেছে। পুতুল-দি একা ডেক্-এ দাঁড়িয়ে আছেন, উত্তাল হাওয়ায় তাঁর আবাঁধা চুল উড়ছে আর তাঁর এলোমেলো আঁচল, তাঁর দুই চোখে অপস্রিয়মান দিগন্তের ধূসরিমা— কিন্তু আশ্চর্য, সে-জাহাজে আর কোনো আরোহী দেখতে পাচ্ছি না, পুতুল-দি একেবারে একা, পৃথিবীতে প্রথম মানুষের মতো। আকাশ থেকে আকাশে সমস্ত শূন্য হাহাকার করে' উঠতো, তাড়াতাড়ি আরেকটা তারাকে আরেকটা জাহাজ বানাতুম। সে জাহাজে আমি চলেছি।

তারা ও তারায় সময় ও স্থানের কত দূর ব্যবধান তার হিসাবে কিছু লাভ হ'বে না, আমার সম্বল বা সম্ভাবনা কি আছে বা নেই তা মনে করিয়ে দেয়াটা বর্বরতা বলবো, কিন্তু আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি, নীল জল ঠেলে উন্মুক্ত শুভ্রতার দিকে আমিই চলেছি জাহাজে—না-হয় বা নিতান্ত খালাসি হ'য়ে। ঠিকানা জানি না, কিন্তু যে-বন্দরে এসে নামলুম, জানতুম সেইখানেই পুতুল-দি তাঁবু ফেলেছেন। কোথাও আশ্রয় পান নি, বাইরে তাঁবু করে' আছেন রুক্ষ একটা মাঠের মধ্যে, গলিত শীত পড়েছে। সেই অপরিচিত জগতে আমিই তাঁর মনের ভাষায় কথা বলা! টেবিলে আলো জেলে পুতুল-দি পড়ছেন, আমি তাঁর পায়ের তলায় বসে' জ্বলন্ত কাঠে আগুনের কুণ্ড করে' রেখেছি, যাতে না তিনি শীতে নিস্তেজ হ'য়ে পড়েন। পাখি শিকার করে' এনেছি দুপুরে, টাটকা দুধ আর গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙুর এনেছি সওদা করে'। আর গভীর রাত্রে পালকের বিছানায় পুতুল-দি যখন শান্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাঁবুর বাইরে বসে' শিশিরের শব্দের সঙ্গে তাঁর নিশ্বাসের শব্দ শুনেছি।

এমনি করে'ই দিন কাটছিলো, সমুদ্রের পারে ঝিনুক কুড়িয়ে। এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলুম পুতুল-দি কি জানি কেন এবার পরীক্ষা দেবেন না।

আকস্মিক কোনো অসুখ হ'য়ে পড়লো বোধ হয়। তাড়াতাড়ি ছুটলুম ও-বাড়ি। বিশেষ সুস্থ আছেন বলে' ভাবতে পারলুম না। দেখলুম নিচে, দালানের এক পাশে, বাঁটা কতগুলি মুশুরির ডাল দিয়ে পুতুল-দি তাঁর অনাবৃত হাত আর মুখ সযত্নে মার্জনা করছেন। সামনেই মাসিমা এক ঘটি জল আর তোয়ালে নিয়ে বসে'।

ব্যাপার কি?

ছবির শরণাপন্ন হলুম। শুনলুম পুতুল-দির গায়ের রঙটা নাকি আশানুরূপ ফর্সা নয়।

এ-কথা তাঁর রাশীভূত বইয়ের পৃষ্ঠায়ো ঘৃণাক্ষরে লেখা ছিলো না। তাঁর যা রঙ, তা তো তাঁরই রঙ, রক্তের যেমন লাল। আমি তো কখনো রাত্রিকে দিনের মতো শুভ্র হ'তে বলতে পারতুম না।

কিন্তু দোতালায় যে ভদ্রমহিলা বসে' আছেন, তাঁর ঘোরতর আপত্তি ; তাঁর ছেলে যখন বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে কাশ্মীর না হায়দ্রাবাদ, মান্দালায় না মোলমেন-এ ছ'শো টাকার চাকরি করছে তখন তাঁর পুত্রবধূর জন্যে রঙটা অন্তত ফর্সা চাইতে পারেন বৈ কি।

'বিয়ের নামে মেয়ে একেবারে পেথম তুলে দিয়েছে স্থাখ।' ছবি আমার কনুইয়ে একটা ঠেলা দিয়ে তার দিদিকে বাঁকা চোখে নির্দেশ করলে। তার উত্তরে পুতুল-দির মুখে কুৎসিত একটা প্রসন্নতা দেখলুম।

বলা বাহুল্য আমি সেই মেয়ে-দেখার মজলিসে উপস্থিত ছিলুম না। আমি তখন অন্যমনস্কের মতো অথচ যথাসম্ভব গাড়ি-ঘোড়া বাঁচিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর প্রাণপণ চেষ্টা করছি ভাবতে, সত্যি, পুতুল-দির গায়ের রঙ কী কালো, তাঁর মুখ কেমন চ্যাপ্টা, নাকটা কেমন মোটা, কেমন তাঁকে রোগা, পাঁশুটে দেখতে !

খবর নিয়ে জানলুম, প্রতিমা একমেটে হ'য়ে গেছে। এবার ভদ্র-মহিলার ইঞ্জিনিয়ার ছেলে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই প্রতিমা প্রাণবতী হ'য়ে ওঠে।

এস্‌প্ল্যানেডে ট্র্যামের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, দুপুর বেলা। দেখলুম উত্তরাগত একটা ট্র্যাম থেকে ছবি নামছে, তার পিছনে মাসিমা, তারো পিছনে পুতুল-দি।

পুতুল-দি ! মাসিক-পত্রের প্রচ্ছদপটে শোভা পায় এমন একটা বিহ্বল, প্রগল্‌ভ তাঁর চেহারা। ছবিকে জিগগেস করলুম একান্তে : 'চলেছ কোথায় ?'

ছবি হেসে বললে, 'বেড়াতে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল।'

সেটা একটা বেড়াবার জায়গা শুনেছি, কিন্তু দেয়ালের গায়ে বড়ো-বড়ো হরফে উৎকট বিজ্ঞাপন আঁটবার জায়গা বলে' জানিনি। শুনলুম, পুতুল-দিরা যখন দালানের ডান থেকে বাঁয়ে ঘুরে যাবেন, তখন তাঁর ভাবী স্বামী বাঁ থেকে ডাইনে বাঁক নিয়েছেন, আর এ-ও নাকি ব্যবস্থা হয়েছে যখন মাঝপথে এঁরা পরস্পরকে অতিক্রম করে' এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে, তখন ছবি হঠাৎ হুইসল্ দিয়ে উঠেছে আর ওঁরা ঘাড় বেঁকিয়ে পরস্পরকে লুকিয়ে দেখে নিয়েছেন আরেকটু।

'তুমি চলো না।' পুতুল-দি বললেন।

পুতুল-দির ট্র্যাম যখন দক্ষিণে লিণ্ডসে ষ্ট্রীট পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে তখনো আমি ছুটে গিয়ে এখান থেকে ধরতে পারতুম। কিন্তু আজ আমার পা দু'টো পাথর হ'য়ে রইলো।

পুতুল-দি চলেছেন, এ আমি অনায়াসে ভাবতে পারতুম। কিন্তু দুপুরবেলায় মিড-ডে ভাড়ায় ট্র্যামে করে' ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে নয়; হয়তো মধ্যরাত্রে, অনেক অন্ধকার মাড়িয়ে, স্বপ্নের ঢেউ ভেঙে-ভেঙে। সেখানে কোনো ইঞ্জিনিয়ার ফিতে-কম্পাস নিয়ে মাপ-জোক করতে বসে' নেই কেননা তার কাছে পুতুল-দি ফরমায়েস বা ফরমুলা নন, সেখানে তিনি তার কাছে আশ্চর্য উদ্‌ঘাটন, সমুদ্র থেকে পূর্ণিমার আরোহণের মতো। কতদিন ভেবেছি পুতুল-দি চলেছেন সেই একাকী অভিসারে, মনের গহন বনানীর ছায়ায়, প্রতীক্ষার রুক্ষ ধূলিপথে, কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের কিনারে চোখের কোণায় তাঁকে একদিন কুৎসিত কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবো এ আমি সমুদ্রে ডুবে গেলেও বিশ্বাস করতে পারতুম না।

পাশাপাশি দু'টো দিন বাছা হয়েছে, এর মধ্যে থেকে পাকাপাকি ঠিক

করতে হ'বে। পরের দিনটাই নাকি জ্যোতিষশাস্ত্র মতে প্রশস্ততরো, কিন্তু পুতুল-দির মত নেই। কারণ, সে-রাত্রে লগ্ন নাকি রাত দু'টোর সময়। অত রাত পর্য্যন্ত উপোসী শরীর নিয়ে পুতুল-দি জেগে থাকতে পারবেন না।

রাত দু'টোর সময় কখনো আমার ঘুম না ভেঙে গেছে এমন নয়, আর তারপর যখন অনেকক্ষণ ঘুম আসে নি তখন পুতুল-দির কথাই ভেবে থাকবো। দেখতে পেতুম, তাঁর টেবিলে তখনো আলো জ্বলছে, পুতুল-দি ঘুমুতে যান নি, টেবিলের ধারে দুই হাত সমরেখায় প্রসারিত করে' দিয়ে তিনি তখনো ফিলজফি পড়ছেন। দুই চোখে তাঁর সেই উদ্ভাসিত মুখের একাগ্র তীক্ষ্ণতা দেখছি, সমস্ত ভঙ্গিতে সেই উদ্ধত কাঠিন্য। আমি মনে-মনে সেই ঘর অন্ধকারে শীতল, ঘুমে নিভৃত করে' দিতে চাইতুম, কিন্তু ইলেকট্রিক আলোটা আমার চোখের উপর তীব্র শাসন করে' উঠতো। তাই নিজেই কখন ঘুমিয়ে পড়তুম আলগোছে। আর পরদিন ভোরবেলায় যখন জাগতুম, পুতুল-দি ফের বই নিয়ে বসেছেন।

সেই পুতুল-দির দুই চোখ ঘুমে একেবারে ঢুলে পড়েছে।

'ঢং। বুঝলে না', ছবি টিপ্পনি কাটলো : 'দু'টো দিনও দিদির তর সইছে না।'

বলা বাহুল্য পুতুল-দির বিয়ের দিনে আমার প্রায় কলেরার মতো হ'লো আর সন্ধেবেলায় একটা পচা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে কাঁচা পাঁউরুটি ডুবিয়ে একপ্লেট মটন-কারি গলাধঃকরণ করলুম।

পুতুল-দি তারপর কাশ্মীর না হায়দ্রাবাদ, মান্দালয় না মোলমেন-এ স্বামীর ঘর করতে চলে' গেলেও মাঝে-মাঝে আমি তাঁদের পুরোনো বাড়িতে গিয়েছি, তাঁর ঘরের সেই সুশুভ্র শূন্যতায়! মাসিমাকে তিনি যে-সব চায় চিঠি লিখতেন, তার মধ্যে যে লাইনগুলো সব চেয়ে ঝকঝকে,

রঙিন কাঁচের গুড়োর মতো মাসিমা তা ছিটিয়ে দিতেন আমার চারপাশে। নতুন দেশে পুতুল-দির চার-চারটে চাকর, ফার্স্ট ক্লাশে চড়ে' তিনি একদিন বম্বে না 'রেঙ্গুন গিয়েছিলেন, দস্তুরমতো হুইল ঘুরিয়ে মোটর চালাতে শিখেছেন আজকাল। মাসিমার এত সুখ, 'আর কে-ই বা ভাগ নেয় আমি ছাড়া? বাজার খরচ থেকে বাড়ি-ভাড়া পর্যন্ত সংসারের সমস্ত তহবিল তাঁর মেয়ের হাতে, এর চেয়ে মেয়ের মা'র আর কী বড়ো সম্পদ থাকতে পারে? পুতুল-দির চিঠির একটা জায়গা: 'উনি কিছু বোঝেন না, আমার হাতে সমস্ত ছেড়ে দিয়েছেন, আমি হাঁ বললেই সেটা হ'য়ে গেলো,—এই সেদিন কেমন ক্যাটালগ দেখে নতুন প্যাটার্নের একটা জড়োয়া নেকলেস আনালুম, মা।' মেয়ে তাঁর অভ্রভেদী বিদুষী বলে' মাসিমার একটা উচ্চারিত গর্ব ছিল, সে-বিদ্যায় যে তাঁর জামাই পর্যন্ত নিশ্চিন্ত পরাস্ত হয়েছেন এর চেয়ে আর বড়ো সাফল্য মাসিমার কী থাকতে পারে—যখন এত খরচ-পত্র করে' মেয়েকে তিনি লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন? ক্রমে-ক্রমে সে-ঘর থেকে আমাকে সরে' আসতে হ'লো, আর কোনো কারণে নয়, যখন সে ঘরের চতুর্দিকের দেয়ালে পুতুল-দির নানা ঢঙের কায়দা-বেকায়দার সভঙ্গ-বঙ্কিম বিচিত্র সব ফটো উঠছে।

বিস্ময় বা বেদনার কিছু নয়, আমার সেদিনের পরিণত বুদ্ধিতেও তা বেশ বুঝতে পারছিলুম, তবু কেন জানি মনে হচ্ছিলো পুতুল-দি নিতান্ত ছোট, ফাঁকা, খেলো বা অপরিচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছেন। যেন কোথায় মিলছে না, প্রাকৃতিক-শৃঙ্খলায় কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম বিপর্যয় ঘটেছে। অথচ সমস্ত সংসারের চোখে এটাই নিটোল স্বাভাবিক!

অনেক দিন পর, প্রায় বছর খানেকেরো বেশি, পুতুল-দি কেতাদুরস্ত বাপের বাড়ি এলেন। উড়ো খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম। 'মনে আছে, একবার চন্দ্রগ্রহণের রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম আগে থাকতে, এক

ঘুম পরে ধড়মড় করে' উঠে মনে পড়ে' গেলো, আজ গ্রহণ, পাঁজির মতে আমাকে নাকি দেখতে নেই। সমস্ত বাড়ি ঘুমে, খিল খুলে বেরিয়ে এলুম বাইরে। ঘুমুবার আগে কেমন ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না ছিলো, এখন একেবারে ঘোরালো অন্ধকার। ঠাণ্ডা একটা ভয় করতে লাগলো। তাকালুম উপরে, চারপাশে, চাঁদ চোখে পড়লো না, শুধু বিবর্ণ, মৃত, পাণ্ডুর একটা পিণ্ড দেখতে পেলুম।

জলবায়ুর গুণে পুতুল-দির শরীরে কতোগুলি মাংস হয়েছে, চিবুকের ভারে গলাটা কেমন ছোট হ'য়ে এসেছে মনে হ'লো। চামড়ার একটা সুটকেস নিয়ে বাড়ির ছেলেপিলেদের তিনি ব্যস্ত হ'য়ে কি সব বোঝাচ্ছেন দেখলুম। এগিয়ে গেলুম কৌতূহলে, তাঁর স্বামী যে এককালে বিলেত গিয়েছিলেন তারই লেবল একটা সুটকেসের গায়ে এঁটে আছে, সেইটাই জয়-পতাকা হ'য়ে উঠেছে। আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে মূল্যবান লাগছিলো যে এতদিনেও সে-লেবেলটাতে একটা আঁচড় পড়েনি।

'সবাইকে নিয়ে দিদি তিনটের শো-তে সিনেমায় যাচ্ছেন', ছবি বললে, 'যাবে নাকি হে অরুণ-দা ?'

কষ্টে বললুম, 'ও আমি দেখেছি।'

'সে আবার কী কথা!' ছবি হেসে উঠলো : 'একদিন তো তুমি ভাতও খেয়েছিলে, তাই বলে' খাওয়া-দাওয়া তোমার ফুরিয়ে গেলে নাকি ?'

'যদি নেহাৎ খাওয়ার সঙ্গে না তুলনা দিতে তো বলতুম, ও যাক ও ফুরিয়ে গেলেই ভালো।'

'ওদের কথা ছেড়ে দে, ছবি, ওরা হচ্ছে পাক্কা একেকটি স্নব', পুতুল-দি ফোড়ন দিলেন : 'শ্ল্যাঙ য়্যামেরিকান এক বর্ণও বুঝবে না তবু যাবে ও ইংরিজি ফিল্ম শুনতে। এ বাবা, যাই করুক-না-করুক, নিশ্চিন্ত হ'

আদ্যোপান্ত বুঝতে পারবো। যাই বলো, মাতৃভাষা, পয়সাগুলো নেহাৎ জলে যাবে না।'

এর পর মাসিমা আরেক দিন নেমন্তন্ন করে' পাঠিয়েছিলেন, তাই গিয়েছিলুম, তারপর আর যাই নি। গিয়ে দেখি, বেলা তখন এগারোটায় গড়িয়ে গেছে, পুতুল-দি সদর-দরজার চৌকাঠের পারে উবু হ'য়ে বসে' কার হাতে নিজের বাঁ করতলটি সন্তর্পণে প্রসারিত করে' দিয়েছেন। লোকটার মাথায় জটা, গায়ে ভস্ম, এক পাশে কমণ্ডলু। নিঃসন্দেহ, লোকটা সন্নেসি, জ্যোতিষে চৌকশ, পুতুল-দির হাত গুনছে।

আমাকে দেখে পুতুল-দি ভীষণ লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন। হাত সরিয়ে দাঁড়ালেন এক ঝটকায়। সহাস্য গোলাকার মুখে সন্নেসির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক বলছ তো ঠাকুর ?'

'নিশ্চয়। একটা সুপারি কি হরিতকী বুকে ঠেকিয়ে বালিশের তলায় রেখে দেবে, ঠিক খোকা হবে দেখো।' সন্নেসি হাত তুলে আশীর্বাদ করলো।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালুম। পুতুল-দি সেখানে নেই। ভাবলুম, মাতৃত্ব নিয়ে পৃথিবীতে কতো কবিতাই না লেখা হয়েছে !

# ডিস্‌ক্‌

আমার স্ত্রী একটি রত্ন। সদ্য-কেনা চিনে-মাটির টি-পটের ঢাকনিটা সেদিন ভেঙে গেলো, স্ত্রী ফরমাজ করলেন, এক্ষুনি আরেকটা কিনে আনতে হবে। কিনে আনলুম একটা পোর্সিলেনের, ভাবলুম চায়ের রং ও স্বাদ স্ত্রীর ওষ্ঠাধরের চেয়েও আকর্ষণীয় হবে। কাকস্য পরিদেবনা, পোর্সিলেনেরটা নিরাপদে উঠলো গিয়ে বাক্সোয় আর সেই ভাঙা পটের উপর একটা বার্লির কৌটোর কাপ্‌ চাপা দিয়ে তিনি বেমালুম চা ভেজাতে লাগলেন। একদিন অভিযোগ করে' বললেন, 'বাইরে ভদ্রলোকরা আসে, এ-সব বাজে, মোটা, ভারি পেয়ালায় চা দিতে আমার লজ্জা করে।' তাই সেবার 'ক্যাজুয়েল লিভ' নিয়ে কোলকাতা গিয়ে মার্কেট থেকে আধ-ডজন ফুল-পাড় খাঁটি বিলিতি পেয়ালা কিনে আনলুম। স্ত্রী বললেন, 'সুন্দর প্যাক করে' দিয়েছে, ওগুলো আর খুলো না।' বাইরের ভদ্রলোকদের আশায় একসপ্তাহ অপেক্ষা করলুম, কারু দেখা নেই। পরে একদিন সকাতরে বললুম, 'দয়া করে' আমাকেও তো ভদ্রলোক ভাবতে পারো।' স্ত্রী ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন, 'আগে এ-পেয়ালাগুলো ভাঙুক!' আর মোটে দিন দশ-বারো বাকি আছে, ইনকামট্যাক্স-অফিসারের মেয়ের বিয়ে। সেখানে ওঁকে যেতেই হ'বে, কিন্তু যেটা ওঁর সব চেয়ে জাঁকালো সাড়ি সেটা নাকি ময়লা, ভাঁজভাঙা। তিয়াত্তরখানা সাড়ির উপর নতুন সাড়ি কেনাবার বায়না করতে বোধহয় তাঁর একটু

বাধলো, তাই তিনি বললেন, 'এটাকে ড্রাইক্লিনিং করে' আনতে হবে।' রেজেষ্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিলুম কোলকাতা, একমুঠো টাকা ফেলে ভি-পি ছাড়িয়ে নিলুম। ঠিক বিয়ের দিন দুপুরে এসে পৌঁছুলো সাড়িটা, ভাবলুম, সাড়ির অপূর্ব বর্ণচ্ছটা দেখে ভাবলুম, স্ত্রীকে বোধকরি আর নিজের স্ত্রী বলে' ভাবতে পারবো না। কিন্তু যখন গাড়িতে গিয়ে উঠবো, চেয়ে দেখি, স্ত্রী ও-স্যাড়িতে হাত না দিয়ে এমনি একখানা বুটিদার ঢাকাই সাড়ি পরে' নিয়েছেন। অবাক হ'য়ে বললুম, 'এ কি।' উনি স্নিগ্ধহাস্যে বললেন, 'কী চমৎকার ধোলাই হয়েছে সাড়িটার, নগদ কতগুলো টাকা, পরলেই তো ভাঁজ ভেঙে একাকার হ'য়ে যাবে। তায় বিয়ে-বাড়ির ভিড়!' বিয়ের আগে আমি লক্ষ্ণৌ থেকে খুব দামি, নরম আর চমৎকার একটা বিছানার চাদর কিনে এনেছিলুম, যুগল-শয্যার উপযোগী। মনে আছে শুভরাত্রির রাত্রে বৌদি সেটা আমাদের খাটের উপর পেতে দিয়েছিলো। তারপর সেটা আর চোখে পড়ে নি। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করতো বিছানায় ঐ চাদর পেতে শুই, কিন্তু স্ত্রীকে জিগগেস করলে সংক্ষেপে বলতেন, 'কোন বাক্সে আছে আমার মনে নেই।' আমি ক্রমান্বিত ট্রাঙ্ক-স্যুটকেসের পিরামিডের দিকে হতাশ চোখে চেয়ে থাকতুম; স্ত্রীর চাবির গোছার দিকে চেয়ে হাত-পা গুটিয়ে যেতো। তবু যদি পিড়াপিড়ি করতুম, বলতেন: 'শুভরাত্রির স্মৃতিটা থাক্ না!' বলতুম, 'পরের রাত্রিগুলি কি অশুভ?' তারি জন্যে, বলা বাহুল্য, আমি আমার জামা-কাপড় বা'র করে' দেবার জন্যে ওঁকে অনুরোধ করতুম না। কেননা আমি জানতুম, যে-ধুতির ঝুলটা খাটো ও জমিটা মোটা ও যে-পাঞ্জাবির পকেটের দিকটা ছেঁড়া ও ঘাড়ের দিকটা দাগ-ধরা খুঁজে-পেতে তাই তিনি সংগ্রহ করে' আনবেন।

তাই তিনি যখন সেদিন একটা পোর্টেবুল্ গ্রামোফোন কিনলেন ও

অব্যবহিত পরেই একটা দামি কাপড়ের ঢাকনি করতে বসলেন, ভেবেছিলুম ওটাও সযত্নে তোলা থাকবে, গৃহসজ্জার অন্যান্য আবশ্যিক উপকরণের মতো। কেননা আপনারা জানেন, হোল্‌ড-অল্‌-এর পরেই মধ্যবিত্ত মফস্বলে তিনটে জিনিস আমাদের দরকার : এক, পেট্রোম্যাক্স ; দুই, সেলাইয়ের কল ; তিন, গ্রামোফোন। এই তিনটে জিনিস আমরা বদ্‌লির সময় পার্শেলে দিই না, সঙ্গে নিই—এই তিনটে জিনিসই আমাদের পদমর্যাদার সাক্ষী। চাকরির প্রথম বছরেই পেট্রোম্যাক্স, এবং দ্বিতীয় বছরে, অর্থাৎ স্ত্রী যখন কুমারীত্ব থেকে মাতৃত্বে উপনীত হ'লেন, সেলাইয়ের কল হ'লো। কিন্তু ও-দু'টোর প্রতি স্ত্রীর মোহ দীর্ঘস্থায়ী হ'লো না। খোকা যখন বসতে শিখলো অমনি তার পেনি-ফ্রকের ভার পড়লো গিয়ে দর্জির হাতে, আর চাকর যখন উপরোপরি দু'দিন দুটো ম্যাণ্টল ফাটালো, পেট্রোম্যাক্সটা প্যাকিং-বাক্সের খড়ের গাদার মধ্যে আত্মগোপন করলে। তাই ভেবেছিলুম, গ্রামফোনটাও দু'দিন পরে মাত্র একটা মেহগনি কাঠের বাক্স-হিসাবেই আমার ড্রয়িংরুমের শোভাবর্ধন করবে।

কিন্তু জগদম্বা আমাকে রক্ষা করুন, আমি ভুল বুঝেছিলুম। দিন নেই, রাত নেই, মেজাজ নেই, মর্জি নেই, স্ত্রী নিরন্তর রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন। আমার ব্যয়ের স্রোতস্বতীতে গভীর করে' একটা খাল কাটা হ'লো। দেখলুম এ বিষয়ে স্ত্রীর যতোটা উৎসাহ তার এক ভগ্নাংশও সুরুচি নেই—যার-তার যা-তা গান দিনে-দিনে স্তূপীভূত হ'য়ে উঠতে লাগলো। বলতে পারেন, আমি সুরের কী বুঝি, কাকে বলে মালকোষ কাকে বা আশাবরী। কিন্তু কথার একটা মানে হোক, তাতে ঈষৎ কবিতা থাকুক, সবিনয়ে এটুকু তো অন্তত আমি আশা করতে পারি। বলবেন জানি, গানে সুর হচ্ছে প্রাণ, কথা শুধু একটা কঙ্কাল। কিন্তু কঙ্কালেরো একটা আকার চাই নিশ্চয়। প্রেয়সীকে কোনো এক সময় যেমন স্ত্রীতে চলে'

আসতেই হ'বে তেমনি সুরকেও সম্পূর্ণতা পেতে হ'বে কথায়। ছেলে-বেলায় ওয়ার্ড-মেকিং খেলেছি মনে আছে, তেমনি সিনেমা-যুগের এ-সব সঙ্গীত-লেখকরা বাছাই-করা কতগুলি কথা কুড়িয়ে-কুড়িয়ে গানের ছড়া তৈরি করছে এবং তাই প্রতিমূর্ত হ'য়ে উঠছে যতো সব ন্যাকা গলায় আর গদ্গাদ গলায়। ঝালাপালা হ'য়ে উঠলুম।

এরি মধ্যে, একদিন আপিস থেকে ফিরেছি, স্ত্রী হঠাৎ অপরিমিত উৎসাহসহকারে বললেন, 'জানো, পাশের বাড়িতে শেফালি রায় এসেছে।'

শেফালি রায়ের সঙ্গে যে আমার এক ফালিও পরিচয় নেই তা আপনারা সহজেই বুঝতে পেরেছেন, নতুবা আমার স্ত্রী উৎসাহে এতোটা উদার হ'তে পারতেন না। তাই নির্লিপ্ত গলায় বললুম, 'কে সে?'

'ও মা! শেফালি রায়ের নাম শোনো নি?' স্ত্রী আমার দিকে নিতান্তই একটা অবমানসূচক দৃষ্টিক্ষেপ করলেন: 'গেলো মার্চ মাসে যার প্রথম গান বেরুলো বাজারে—রেকর্ড-সেল! কী গলা, কী তার কাজ! শোনো নি তুমি?'

অপরাধীর মতো মুখ করে' বললুম, 'না তো। আছে নাকি আমাদের?'

এটাও কিনা জিগগেস করতে হয়, এমনি একখানা মুখভাব করে' স্ত্রী ডিস্ক্ ঘুরিয়ে দিলেন। মেসিনটা মুহূর্তে গীতবাদ্যমুখর হ'য়ে উঠলো।

বলতে কি, এই প্রথম আমি অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে গ্রামোফোন শুনতে বসেছি।

গ্রামোফোন-কোম্পানিরা দোকানদারি করতে গিয়ে সাধারণতো এক পিঠ ভালো করে' অন্য পিঠে গোঁজামিল দেয়, কিন্তু এর বেলায় তার ব্যতিক্রম হয়েছে দেখে মন ভারি খুসি হ'লো। এক পিঠে একটি বিরহ-ব্যথার গান, সকরুণ কাকুতিতে ভরা; অন্য পিঠে মিলনোল্লাসের গান,

প্রচ্ছন্ন রক্তিমোচ্ছ্বাসে রোমাঞ্চিত। কী বা সুর, কিছুই আমি অনুধাবন করতে পারছি না, আমি চোখের সামনে দেখছি, হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আরতির আলোকে প্রতিমার মুখের মতো সুরের অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় শেফালি রায়ের মুখ অনির্বচনীয় সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। দেখছি তার মুখে ধ্যানের তন্ময়তা, দুই চোখে বিগাঢ় ভাব, উৎক্ষিপ্ত গ্রীবায় সুকোমল শান্তি, শরীরের রেখা ও চূড়া সুরের শিহরণে প্রস্ফুরিত। গলায় এমন উন্মাদনা, এমন বিকীরণ, এমন আত্মদান আর কোথাও দেখিনি। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি লাবণ্য, যেমন স্ফূর্তি তেমনি গভীরতা।

স্ত্রী কানে-কানে বললেন, 'ঐ দেখ, শেফালি রায় জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের গানই শুনছে হাঁ করে'।' স্ত্রী ভারি কৌতুক বোধ করলেন।

লজ্জিত বিস্ময়ে তাকালুম জানলার দিকে। এত অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই সুদূর মফস্বলে স্বকর্ণে তার নিজের গান শুনে সে ভয়ানক অবাক হ'য়ে গিয়েছে দেখলুম। আত্মহারার মতো আমার দিকে চেয়ে সে হেসে উঠলো। জীবনে এই সে খ্যাতির স্বাদ পাচ্ছে, তাই মুখের উপর নিষ্ঠুর বিতৃষ্ণার সে একটা কাঠিন্য আনতে পারলো না, অপার সারল্যে অনির্বচনীয় হেসে উঠলো। কোনো নবাগতকে কোলকাতা দেখাবার সময় নিজেও যেমন তার চোখে নতুন করে' কোলকাতা দেখতুম, তেমনি আমাদের কানে ও ওর বহুদিনাভ্যস্ত গানের প্রত্যেকটি কণ্ঠরেখাকে সকৌতুকে অনুসরণ করছে।

আশ্চর্য, শেফালি রায়ই একমাত্র ব্যতিক্রম, যার কল্পনার সঙ্গে আকৃতির একটা সামঞ্জস্য পেলুম। নইলে, কোনো স্বনামধন্যের সঙ্গে আমাদের দেখা হোক এ আমরা পারতপক্ষে প্রার্থনা করি না, কেননা বারে-বারেই তাঁদের সামনে গিয়ে দেখেছি আশাভঙ্গ হয়েছে, কেউ সেই

কল্পনার ছায়ায় এসেও দাঁড়াতে পারেননি, বরং প্রতিমা বিসর্জন হ'য়ে এক আঁটি খড় উঠেছে ভেসে। তাই শেফালি রায়ের দিকে তাকাবার আগে ভেবেছিলুম মেয়েটি দেখতে নিশ্চয়ই কালো ও মোটা হবে, কেননা ও-দুটো গুণ বাঙালী গায়িকার 'করোলারি'। কিন্তু যদি বলি, শেফালির দেহই দীপ্ত একটি গীতরেখা তা হ'লে হয়তো বা অতিরিক্ত করে' বলবো, কিন্তু মিথ্যা বলবো না। খানিক আগে তাকে না দেখে শুধু তার গান শুনে তার যে ভাবস্নিগ্ধ মূর্তি কল্পনা করেছিলুম, দেখলুম তার এ-মূর্তি সমস্ত ভাবকে বহুদূর অতিক্রম করে' গেছে। দীর্ঘাঙ্গী, ছিপছিপে মেয়েটি, বছর সতেরো-আঠারো বয়েস, যৌবন একটু দেরি করে' এসেছে বলে' সমস্ত শরীরে প্রসন্ন একটি লীলার তরলিমা। তার গলা শুনেই বুঝেছিলুম তার লাবণ্যের সঙ্গে একটি সবলতা আছে, কান্তির সঙ্গে তেজ। সেই তেজ দেখলুম তার এই জানলায় উন্মুক্ত দাঁড়িয়ে-থাকায়, প্রায় সম্মোহিতের মতো। হঠাৎ খেয়াল হ'লো বাজনা আর নেই, সাউণ্ডবক্সটা স্ত্রী ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিয়েছেন।

আমার প্রতিবেশীটি এখানকার এক উকিল, শেফালি তাঁর ভাই-ঝি, এখানে ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। উকিলের গৃহিণীকে আমার স্ত্রী দিদি বলতেন বয়সে বড়ো বলে', আর আমার স্ত্রীকেও তিনি দিদি বলতেন পদে বড়ো বলে', কিন্তু দুই বোনে বিশেষ মাখামাখি ছিলো না। কেন, সেই কারণটা এখানে ব্যাখ্যা করে' না বললেও চলবে। কিন্তু শেফালির আসার পর থেকে স্ত্রী তাঁর ব্যবধানটা আর চলতে পারলেন না বাঁচিয়ে, বেড়া ডিঙিয়ে সটান ও-বাড়ি ঢুকে পড়লেন।

সেদিন সান্ধ্যভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে এসে দেখি আমাদের শোবার ঘরে গানের ছোটখাটো একটি জলসা বসেছে। পাশেরটাই আমার বসবার ঘর, আজকাল যাকে বৈঠকখানা না বলে' ড্রয়িং-রুম বলি। সেই

ঘরেই এসে আশ্রয় নিলুম, মাঝখানের দরজাটা স্ত্রী চক্ষের পলক ফেলতে-না-ফেলতে বন্ধ করে' দিলেন।

শেফালি আমার স্ত্রীকে বললে, 'আমার তো কতগুলি হ'লো, এবার আপনি একখানা ধরুন।'

বুঝলুম, আমার আসার আগেই শেফালি তার পালা সাঙ্গ করেছে। কত যে হতাশ হলুম, কী বলবো!

শেফালি আবার অনুরোধ করলে: 'নিন, ধরুন!'

ভেবেছিলুম স্ত্রী তুমুল প্রতিবাদ করবেন, কেননা বিয়ের পর তাঁর মুখে গান শুনেছি বলে' মনে পড়ে না। তবে, আপনারা জানেন, বিয়ের আগে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত মেয়েই দু'তিনটে গান কমা-সেমিকোলন-শুদ্ধ মুখস্ত করে' রাখে, যেন পাণিপ্রার্থীদের কারু গীতশ্রুতিস্পৃহা হ'লে অকারণে না ঠকতে হয়। মনে আছে স্ত্রীকে তাঁর শেষ কৌমার্যসীমায় দেখতে গিয়ে আমিও তাঁর একটা গান শুনে এসেছিলুম। কিন্তু আপনাদেরকে আগেই বলেছি, গানের চেয়ে কথাংশের দিকে আমার দৃষ্টি বেশি, তাই স্ত্রীকে আমার সেদিন পছন্দ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। দেখলুম তিন বছর আগেকার সেই মর্চে-ধরা গানটা তিনি কণ্ঠনালী দিয়ে উদ্গীরণ করছেন। কমা-সেমিকোলনের আজো হয়তো কোনো ভুল পেলুম না, কিন্তু যা-ই তিনি বলুন, পেলুম না আর তাঁর সেই সুকুমার কৌমার্যের শুচিতা, সেই না-দেখা দেশের মায়াময় তটের স্বপ্ন।

শেফালি প্রচলিত কতগুলি প্রশংসা করলে, কিন্তু স্ত্রী তাকে এত সহজেই নিষ্কৃতি দেবেন না। বললেন, 'এবার আপনি আরেকখানা গান্, আপনার রেকর্ডের গান।'

বুঝলুম, আমাকেই শোনাবার জন্যে। কিন্তু আমি গান শুনতে চাই না, দেখতে চাই। রঙকে শোনা ও শব্দকে দেখাই হচ্ছে অনুভূতির চরম।

শেফালির হয়তো আপত্তি হ'তো না, কিন্তু স্ত্রী একটু আলগা দিলেন না, ভেতরের দরজাটা তেমনি ভেজানো রইলো। শেফালি তার সেই বিরহব্যথার গান ধরলো, করুণ থেকে চলে' এলো প্রায় গভীরে। মনে হ'লো, যাকে নিয়ে আমাদের বিরহ, তার সঙ্গে আমাদের শুধু একটা দরজার ব্যবধান, আর সে-দরজা এমন রাক্ষুসে দরজা নয়, যে খোলা যায় না। খোলা যায়, উপসংহারের চিন্তা না করলেই খোলা যায়। আমিও তাই জোরে একটা ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলে দিলুম।

শালীনতা আশ্চর্য বজায় রেখে স্ত্রী স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'ভেতরে এসে বোসো।'

বসলুম এসে একটা চেয়ারে, লক্ষ্য করলুম শেফালির অঞ্চলটুকু পর্য্যন্ত বিচলিত হ'লো না, গানে সে নিজেকে এমনি ঢেলে দিয়েছে। তার গীতালোকিত সেই মুখ পৃথিবীর বলে' মনে হ'লো না। গানের ফাঁকে নিশ্বাস নেবার জন্যে যে সে দ্রুত চেষ্টা করছে, কখনো যে হঠাৎ একটুখানি জিভ বের করে' ঠোঁট নিচ্ছে চেটে, কিম্বা বাঁ-হাতে যে বেলো করছে হার্মোনিয়াম, এ-সব নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। নির্জন পার্বতী নির্ঝররেখার উপরে নিশ্চয়ই আপনারা জ্যোৎস্না দেখেছেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন শেফালিকে। নির্ঝররেখা বলছি কেননা শেফালি কৃশ, লীলাঙ্কিত; পার্বতী বলছি, কেননা তার শরীরে একটি ধূসর কাঠিন্য আছে; আর নির্জন বলছি, কেননা তার এখনো বিয়ে হয় নি। আর জ্যোৎস্না, গানের জ্যোৎস্না।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, শেফালির এ-গান আমার একটুও ভালো লাগলো না। আমি ভেবে দেখেছি সব-কিছুর ফুরিয়ে যাওয়াটাই সৌন্দর্য, যা যতো বেশি সুন্দর তার উচিত ততো শিগ্‌গির ফুরিয়ে যাওয়া। ডিস্ক্‌-এ শেফালির গান তিন মিনিটের বেশি থাকতো না বলে'ই ইচ্ছে করতো

তিন দিন বসে' শুনি, আর এখন সেই তিন মিনিটকে টেনে-হিঁচড়ে তেত্রিশ মিনিটে নিয়ে এলেই বাঁ মারে কে! এত কাজ, এত কসরৎ, এত কুস্তি দেখাবার সময় কোথায় ডিস্‌ক্‌-এ? তাই শেফালি আমাদের ভক্তির প্রশ্রয় পেয়ে নির্বাধ গলা ছেড়ে দিলো।

ভালো লাগলো না। ইচ্ছে হ'লো, অনেক যখন রাত, শেফালিও যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, চুপি-চুপি ডিস্‌কটা ঘুরিয়ে দিই। কিন্তু, লাভের মধ্যে স্ত্রীকেই শুধু জাগিয়ে দেয়া হ'বে।

তারপর শেফালি চলে' গেছে এ সহর ছেড়ে, তার বাপের কাছে, কোলকাতায়। তাকে নিয়ে হয়তো কত মজলিস, কত জলসা, কত চা-চক্র। আমরা বড়ো জোর মফস্বলে বসে' বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা হাটকাতে পারি, মাসান্তে গ্রামোফোন-ডিলারের কাছে গিয়ে জিগগেস করতে পারি : 'শেফালি রায়ের কিছু বেরুলো এ-মাসে?' যদি বলে, 'বেরিয়েছে', খুসি হ'য়ে কিনে আনতে পারি একখানা। এই পর্যন্ত।

কিন্তু, ঘোরতর আশ্চর্যের বিষয়, সেই মার্চ মাসের পর আজ জুলাই মাস পড়লো, শেফালি রায়ের আর গান নেই। অথচ তার একখানা রেকর্ড বাঙলা দেশে এমন এক তরঙ্গ এনে দিয়েছিলো যে আজ তা আপনি অনেক অলি-গলি ঘুরে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের মুখে শুনতে পাবেন।

একদিন স্ত্রী বললেন, প্রায় কারু একটা কলঙ্ক বলার মতো : 'জানো, শেফালি রায়ের বিয়ে হচ্ছে। আজ উকিল-দিদির মুখে শুনলুম।'

খবরটাতে অনুৎসাহিত হ'বার কারণ নেই, তাই প্রকৃতিস্থ গলায়ই বললুম, 'ওর ভাবনা কি, গানের জোরেই পাত্র জোগাড় করে' নিয়েছে।'

এমনি যেন অনেকেই নিয়েছে স্ত্রী একটা কটাক্ষ করলেন।

কিন্তু যদি বলি, এর পর শেফালির গান আর আমার ভালো লাগলো না, তা হ'লে, জানি, আপনাদের নিশ্চয়ই সহানুভূতি পাবো। মনে হ'লো,

গানের ছলে এ যেন শুধু ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে বলা : 'আমাকে কেউ তোমরা শিগ্‌গির বিয়ে করো।

বিরক্ত হ'য়ে বললুম, 'থামাও ও-গান। আরো অনেক ভদ্র গান আছে বাড়িতে।'

স্ত্রী ঈষৎ কৌতুকান্বিত হ'য়ে বললেন, 'সে কী, কথা! এ-গানে যে পাহাড় গলে' ধারা বেরুতো। ভাবে একেবারে ভোলানাথ হ'য়ে যেতে।'

'ছাই! গলার ও নির্লজ্জ ন্যাকামো সইতে পারিনে। যেন ঢলে'-পড়ার ইচ্ছে।' নিজেই বন্ধ করে' দিলুম গানটা। বললুম, 'এর চেয়ে শ্যামা-সঙ্গীতে পুণ্য আছে।'

আমি এটা বিলক্ষণ দেখেছি, অন্য কোনো মেয়েকে নিন্দে করলে মনে-মনে স্ত্রী বেশ প্রসন্ন হন, হয়তো ভাবেন অন্তত একটি মেয়ের সংস্পর্শ থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আমার কাছে মেয়েদের শুধু দু'টো গায়ের রঙ ছিলো, হয় ফর্সা, নয় কালো। আর একেবারে কৃষ্ণ-কালো না হ'লে আমি কাউকে প্রাণ ধরে' কালো বলতে পারতুম না। সেই ধারণাতে সেদিন শেফালিকেও ফর্সা বলে' ফেলেছিলুম। প্রকাণ্ড একটা ধমক খেয়েছিলুম স্ত্রীর কাছে। গৌরাঙ্গী বলে' আমার স্ত্রীর একটা শারীরিক গর্ব ছিলো, এবং তিনি আমার কাছে স্পষ্ট এটা আশা করতেন যে তাঁর তুলনায় সংসারের সমস্ত স্ত্রীলোককে আমি কালো দেখি।

তাই বললুম, 'যেমন রূপের ছিরি, তেমনি গলার কেরদানি।'

এমনি অনেক তারার কণা আকাশ থেকে ঝরে' গেছে, রাত থেকে অনেক স্বপ্নের টুকরো। কোনো কিছুরই খেয়াল হ'তো না, যদি না বছর দেড়েক পরে স্ত্রী একদিন এসে বলতেন, 'জানো, শেফালি রায় এসেছে।'

আমূল চম্‌কে উঠলুম : 'কোথায়?'

পাশের বাড়ি ছাড়া কোথায় সে আর আসতে পারে! স্ত্রী গলার

সুরে সুলভ একটি বিষাদ মাখিয়ে বললেন, 'কিন্তু ওর ভারি অসুখ। এখানে একটু হাওয়া বদলাতে এসেছে।'

সুলভ কৌতূহলের বশে বললুম, 'কী অসুখ?'

'একটি সন্তান নষ্ট হবার' পর থেকে একেবারে ঝরে' গেছে, চেনা যায় না। মাসখানেক ধরে' নাকি ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে সন্ধেবেলা।'

খবরের কাগজের একটা খবর শুনছি এমনি নির্লিপ্ততার সঙ্গে সংবাদটা গ্রহণ করলুম। বিয়ের পর কোনো মেয়ে মোটা হবে বা কোনো মেয়ে রোগা হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

আমিও আশ্চর্য হতুম না যদি না এর দিন তিনেক পর শেফালির সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হ'তো। আপিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেছি, দেখি কে একজন অপরিচিত মহিলা একটা ঢালু চেয়ারে বসে' স্ত্রীর সঙ্গে করুণ মিহি গলায় গল্প করছে। অপাঙ্গে স্ত্রীর শাণিত শাসন পাবার আগেই সরে' যাচ্ছিলুম, কিন্তু অপরিচিত মহিলা সোজা হ'য়ে বসবার উদ্যমের মাঝে দু' হাতে দুর্বল একটি নমস্কার করে' স্মিতহাস্যে বললে, 'নমস্কার! চিনতে পারেন?'

দেখে পারতুম না, শুনে চিনলুম। বললুম, 'আপনি কি, মিসেস—'

'শেফালি রায়।' শেফালি মলিন মুখে হাসলো।

'আপনার খুব অসুখ?'

'হ্যাঁ।' শেফালি তার বাঁ হাতের পরিস্ফুট একটা শিরের উপরে ডান হাতের একটা আঙুল বুলুতে লাগলো।

বললুম, 'এখন কেমন আছেন?'

'ভালো নয়। এখানে যেদিন আসি, সেদিন জ্বরটা হয়নি। ভাবলুম, সেরে উঠবো বুঝি। কিন্তু পর্শু থেকে আবার যে-কে-সে।'

তার শীর্ণতার দিকে চেয়ে থেকে বললুম 'এ-রকম কতদিন হয়েছে?'

রোগা মুখে তার চাহনিটি খুব বড় মনে হ'লো। শেফালি বল্‌লে, 'এই মাস তিনেক।'

'মাস তিনেক!' কোটের একটা বোতাম ঘোরাতে-ঘোরাতে বললুম, 'কিন্তু এতদিন আপনাকে দেখি নি কেন ?'

'দেখেন নি মানে ?' শেফালি যেন কথাটা ধরতে পারলো না: 'আমাকে দেখবেন কি করে' ?'

হাসিমুখে বললুম, 'আপনি জানেন না, গান আমি শুনি নে, গান আমি দেখি।'

'ও! এতদিন আমার গান বাজারে দেখেন নি কেন তাই জিগ্‌গেস করছেন ?' শেফালি হাসলো।

'হ্যাঁ, অসুখ তো আপনার তিন মাস, কিন্তু এর আগে হিসেব করে' দেখতে গেলে অন্তত পনেরো-কুড়িখানাও রেকর্ড বেরুতে পারতো বাজারে। কী করছিলেন এতদিন, গ্রামোফোন-কোম্পানিই বা কি লালবাতি জ্বেলেছে নাকি ? মাঝখান থেকে আমাদেরই ক্ষতি, যারা মেসিন কিনে বসে আছি, আর বসে' আছি মফস্বলে।'

'গান দেবো কি করে' ?' শেফালি মুখ নিচু করলো। বললে, 'ওরা যে দেয় না আমাকে গাইতে।'

'কা'রা ?' কথাটা জিগ্‌গেস না করলেও পারতুম।

শেফালি মুখ তুললো না। ধীরে বললে, 'এ-বিয়ে আমার হ'তেই পারতো না যদি না আমার বাবা শ্বশুরমশাইকে আণ্ডারটেকিং দিতেন যে বিয়ের পর ও-বাড়ি আমি গান গাইবো না কোনোদিন। ভেবেছিলুম একটু-আধটু বাজালে হয়তো দোষ হবে না, তাই এসরাজটা নিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু ও-বাড়িতে পদার্পণ করার পরদিনই সেটাকে শাশুড়ি জ্বলন্ত উনুনে গুঁজে দিলেন।'

বজ্রাহতের মতো চেয়ে রইলুম।

বললুম, 'কিন্তু আপনার স্বামীও কি গান পছন্দ করেন না?'

'স্ত্রীলোকের গান করেন না, কেননা তাঁর মতে গান আর এক প্রকারের স্ত্রীলোক সমশ্রেণীর।'

এতক্ষণে স্ত্রী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। বললেন, 'বলেন কি, এমন লোকও আছে নাকি সংসারে?'

'আছে।' শেফালি অন্যমনস্কের মতো বললে, 'নইলে সংসার বিচিত্র হবে কি করে'?'

'তবে জেনে-শুনে ও-জায়গায় বিয়ে বসতে গিয়েছিলেন কেন?' স্ত্রী তপ্ত, অসহিষ্ণু গলায় অসতর্কের মতো প্রশ্ন করে' বসলেন।

এর অবিশ্যি উত্তর নেই। কিন্তু প্রশ্নটাও অবান্তর। কেননা যে-বিয়ের জন্যে গানের এত হট্টগোল মেয়েদের, বোবা হ'য়ে থাকলেই যদি সেটা বিনা পরিশ্রমে সমাধা হ'য়ে যায় তো মন্দ কী!

স্ত্রী বুঝলেন প্রশ্নটা কিছু কঠিন হয়েছে। তাই অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বললেন, 'একা-একা আপন মনেও তো গাইতে পারেন, ছাতে, নিরালায়, মাঝরাতে?'

শেফালি শূন্য চোখে খোলা জানলা দিয়ে কতদূর যেন চাইলো। বললে, 'একা-একা নিজের মনে গাইতে ভালো লাগে না, সে তো সকলেই গায়, যে জানে না সে-ও। কিন্তু আমি চাই শোনাতে, কিম্বা আপনি যা বললেন, দেখাতে—স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যা চান। বলুন, আপনি যদি সত্যি কাউকে ভালোবাসেন', উত্তেজনায় শেফালি দ্রুত নিশ্বাস ফেলতে লাগলো: 'তবে কি তা আপনি মনের মধ্যে পুষে রাখতে পারেন, উদ্বেল বন্যার মতো সমস্ত পৃথিবী আপনার ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না? আমি তো শুধু নিজেকে নিয়ে আমি নই, সমস্তকে নিয়ে আমি। নিজের জন্যে তো চোখের জলই আছে, গান কেন?'

বিষাদের কুয়াসাটা উড়িয়ে দেবার জন্যে বললুম; 'আপনার সেই গানটা আজ একবার শুনবেন ?'

'না, দরকার নেই। আমি এখন উঠি। আপনি এই আপিস থেকে এসেছেন, জামা-কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করুন।'

ভঙ্গুর, বিশীর্ণ কতগুলি রেখায় খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে শেফালি উঠে দাঁড়ালো। গান ফুরিয়ে যাবার পর পিনের সঙ্ঘর্ষে ডিস্‌ক্‌-এ যে খানিক কর্কশ আওয়াজ বেরোয়, যদি বলি, শেফালির শরীরে সেই কর্কশতা, তবে তাকে আপনার কিছুটা বুঝতে পারবেন হয়তো।

এখানে তার অসুখটা আরো জটিল হ'য়ে উঠলো, তাই তাকে ফের ফিরে যেতে হ'লো কোলকাতায়, তার বাবার কাছে।

সেদিন রাত্রে, স্ত্রী যখন খোকাকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, চুপিচুপি জাগিয়ে দিলুম শেফালিকে, সেই ফুলন্ত শেফালিকে। কতদিন তাকে দেখি নি। আজ দেখলুম, এতটুকুও সে ম্লান বা শীর্ণ হয় নি, গানের জ্যোৎস্নায় শরীরে তার সেই তরল তরঙ্গিমা। সেই তার কপালে আভা, মুখে রক্তিমা, বুকে উদ্বেলতা। সমস্ত শরীর যেন প্রার্থনার মতো কোমল, উচ্ছ্বসিত। আবার তাকে দেখলুম, কতদিন তাকে দেখিনি।

স্ত্রী বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'এ কী কাণ্ড! পাড়ার লোকে যে পাগলা-গারদ ভাববে।'

পরদিন, তাঁর ঘোরতর সন্দেহ দাঁড়ালো, যখন দেখলেন আপিস থেকে ফিরে ফের গান দিয়েছি।

'কাল রাতে বুঝি এই গানটাই দিয়েছিলে ?'

লুকোলাম না।

'কেন, আর গান নেই ?'

'আছে।'

'তবে ?' স্ত্রী ধমক দিয়ে উঠলেন।

'জানি না।'

সত্যিই জানি না। কিন্তু আপনারা জানেন, না-জানারো একটা সীমা থাকা উচিত। ভবিষ্যৎ না জেনে আমি যখন-তখন ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শেফালিকে দেখতে লাগলুম। আপিসে উপরালার থেকে যখন ধমক খাই, যেদিন অনেক খরচ হ'য়ে যায়, যখন রাত করে' কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ওঠে, এবং যেদিন সত্যিই কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু ভাবতেও পারিনি শেফালির অপমৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী হবো।

স্ত্রী একদিন তেরিয়া হ'য়ে বললেন, 'তখন না বলতে একটা ন্যাকা, বিচ্ছিরি চলে'-পড়া গান—'

'কতো কথাই তো আমরা বলি', দার্শনিক হবার চেষ্টায় বললুম, 'আর যা বলি তা বলবো না বলে'ই বলি।'

'ঐ তো হাড়-বার-করা কেলে-কিসকিন্দি চেহারা', শেফালি যেখানটায় সেদিন বসেছিলো সেই দিকে হাতের একটা ভঙ্গি চালনা করে' স্ত্রী বললেন, 'ওর আর আছে কী ?'

স্ত্রীলোকমাত্রেই সঙ্কীর্ণজীবী, তা আমার আগে আরো বড়ো-বড়ো দার্শনিকরা বলে' গেছে। তারা ঘুরছে শুধু বর্তমানের ডিস্‌ক্‌-এ ; তাদের না আছে অতীত, না আছে ভবিষ্যৎ, না স্মৃতি, না বা স্বপ্ন। তাই বর্তমান নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকুন, আমি আমার সেই সঙ্গীতময় অতীতের একাকীত্বে ফিরে যাই।

চা-টা আশানুরূপ গরম না অনুচিতভাবে ঠাণ্ডা এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ক্ষুদ্রাকার একটু বচসা হ'লো, এর চেয়েও তুচ্ছ কারণে আপনাদের হ'য়ে থাকে। কিন্তু তখুনি আপনারা গ্রামোফোন বাজাতে বসেন না। ঐখানেই আমার ভুল হয়েছিলো, আমি তক্ষুনিই, সকালবেলাতেই,

গান দিলুম, আর আপনাদের বলে' দিতে হবে না, শেফালির গান।

সিগরেটটা ঠোঁটে করে' পাশের ঘরে দিয়াশলায়ের সন্ধানে গিয়েছিলুম, স্ত্রী কখন ঘরে ঢুকেছেন টের পাই নি। হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ শুনে ফিরে গিয়ে দেখি স্ত্রী ডিস্‌ক্‌খানা মেঝের উপর আছড়ে ফেলে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে' দিয়েছেন।

তখন আমার বদলি হবার সময়। উপরালার কাছে অনেকে অনেক রকম তদ্‌বির করে' থাকে, কেউ চায় কোলকাতার কাছে, কেউ চায় সস্তার জায়গা, কেউ একেবারে দেশের বাস্তুতে। আমি গিয়ে বল্‌লুম, আমার প্রার্থনা খুব বিনীত, আমাকে এমন জায়গা দাও, যেখানে ইলেকট্রিসিটি আছে, সে টাঙ্গাইলই হোক কি বরিশালই হোক। প্রার্থনা মঞ্জুর হ'লো। তাই রেকর্ডসমেত গ্রামোফোনটা এক পঞ্চমাংশ দামে এক প্রোবেশানারি ডিপ্‌টির কাছে বেচে দিয়ে এখানে তারো চেয়ে বর্বর, তারো চেয়ে পৈশাচিক, এক রেডিয়ো খুলে বসেছি।

# দুপুর দু'টো

ঈশ্বর কখন যে তাঁর মানবসন্ততির উপর প্রসন্ন হ'য়ে ওঠেন বলা মুস্কিল। হঠাৎ টেলিগ্রাম এলো কোম্পানির ঘুমন্ত কে-এক পার্টনার বার্লিনে না বার্মিংহামে মোটর উল্‌টে মারা গেছেন, দু'টোর সময় আপিস তাই ছুটি হ'য়ে যাবে।

বেস্পতিবার—এমন দিনে দুপুর থাকতে বাড়ি ফিরে গিয়ে সটান ঘুমুনো যাবে, এটা প্রায় একটা অলৌকিক ঘটনা, আকাশে ধূমকেতু ওঠার মতো। তার উপর, আজ অনেক মারামারি করে' নতুন লেপ পাড়া হয়েছে, কোমল সেই উত্তাপের তলায় কুণ্ডলায়িত হ'য়ে ঘুমোনো, শীতের স্নিগ্ধ রোদে প্রফুল্লর কাছে সমস্ত পৃথিবী আজ সদ্যোজাত মনে হ'লো।

প্রফুল্লর বাসাটা সহরের দক্ষিণে, বড়ো রাস্তার উপর। নিচেটায় দোকান, গলি-মতন খানিকটা সুড়ঙ্গ পেরিয়ে গিয়ে ডাইনে সিঁড়ি; উপরে তিনখানা ঘর নিয়ে তার সংসার। বছর পাঁচেক হ'লো তার বিয়ে হয়েছে কিন্তু স্ত্রীকে অহোরাত্রিক পাচ্ছে সে মোটে বছর দেড়েক হ'বে, গত জুলাইয়ে মাইনে তার ত্রিসংখ্যেয় হ'য়ে উঠলে দেশের বাড়ি থেকে মৃন্ময়ীকে যখন সে নিয়ে এলো। কিন্তু কোলকাতায় একশো টাকা মাইনেতে কী কুলোয় বলো! প্রফুল্লকে এখনো মাঝে-মাঝে লুকিয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ ট্র্যাম চাপতে হয়।

মৃন্ময়ী এখন হয়তো বালিশে ভিজে চুল ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে,

অনাবৃত বাহুর উপর কোন সৌভাগ্যবান ঔপন্যাসিকের একটা বই রয়েছে ছত্রখান হ'য়ে। কিম্বা জানলার ধারে বসে' সে কোলাহল-কল্লোলিত কোলকাতা দেখছে, তার কাছে সেই রহস্যময় কোলকাতা, খাঁচার পাখির কাছে যেমন শ্যামল বনাভাস। কিম্বা, হয়তো আজ আর ঘুম আসেনি, হাতে আর কোনো কাজ না পেয়ে জলখাবার তৈরি করতে বসেছে; বিছানা-পাতা, চুল-বাঁধা তার সাঙ্গ, হয়তো-বা বন্দী একা ঘরে ম্লান শীর্ণ মুখে নখ দিয়ে দেয়ালের সে চূণ আঁচড়াচ্ছে!

কী অপরিমিত খুসিই সে হ'বে যদি প্রফুল্লকে এখন দেখতে পায়! ঈশ্বর করুন, সে যেন এখন ঘুমিয়ে থাকে, ঘন পাতার আড়াল থেকে স্খলিত একটি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালেখার মতো তার ঘুমন্ত সেই শান্তি কী করে' যে সহসা উচ্ছ্বসিত ও অজস্র রৌদ্রে স্রস্ত-বিস্রস্ত হ'য়ে উঠবে তাই প্রফুল্ল একবার দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে।

সন্তর্পণে সে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলো উপরে। কড়া নাড়তে হ'লো না, দরজাটা কেমন নিজে থেকেই খুলে গেলো আচমকা। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকতেই প্রফুল্ল কেমন থম্‌কে থেমে গেলো। ঘরটা যেন অসম্ভব রকম সাজানো, এমন প্রখর পরিচ্ছন্নতা সে যেন অনেক দিন লক্ষ্য করেনি। মেঝেটা মৃন্ময়ীর নখের মতো ঝকঝক করছে। টেবিলটাতে অযত্নপুঞ্জিত বিশৃঙ্খলার এতটুকু একটা রেখাও কোথাও দেখা যাচ্ছে না, ঘরের আসবাবগুলো দস্তুরমতো জ্যামিতিক সামঞ্জস্য রেখে সাজানো। খাটের উপর বিছানাটাতে অকিঞ্চিৎকর একটা কুঞ্চনও কোথাও নেই, পায়ের নিচে নতুন লেপ স্তূপাকার হ'য়ে আছে স্ফীত সফেনতায়। গোপন নিঃশব্দতা দিয়ে সমস্ত ঘর যেন পরিপূর্ণ। দেয়ালগুলো এত বেশি সাদা, সময় এত বেশি স্তম্ভিত ও পরিপার্শ্ব এত বেশি শূন্য যে ক্ষণকাল প্রফুল্লর রীতিমত ভয় করে' উঠলো।

নিজেকে সে আর লুকিয়ে রাখতে পারলো না। অনাবশ্যক উঁচু গলায় ডাক দিলে, 'মিনু।'

এক সেকেণ্ড, দুই, তিন—কোনো সাড়া নেই।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি—যেন আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—পাশের ঘরে দাঁড়ালো। এটার এককোণে একটা টেবিল, তাতে তাদের চায়ের বাসন সাজানো, আচারের বোয়েম, মশলার শিশি, মাখনের কৌটো। এমন পরিচ্ছন্ন, ছোঁয় তাদের সাধ্য কী! ও-পাশের আলনাতে গায়ে-গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি করে' থরে-থরে কাপড় সাজানো, অত্যুগ্র নিভাজ, যেন কোনোদিন ওদেরকে পরতে হ'বে না। পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁসে টানা একটা বেঞ্চির উপর ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেসের সারি, তালা-লাগানো, বিচিত্র ঢাকনা-দেয়া, যেন কতো রাজার রাজত্ব রয়েছে লুকিয়ে। কোণে জলচৌকির উপর লক্ষ্মীর বাঁধানো ছবিটি পর্যন্ত অটুট হ'য়ে আছে। কিন্তু মৃন্ময়ী কোথায়?

প্রফুল্ল এবার চিহ্নহীন, ধূসর গলায় ডাক দিলে: 'মিনু।' আর নিজেরই গলার স্বরে তার ধাবমান রক্ত যেন সমস্ত শরীরে থেমে জমে' ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।

আরো তাড়াতাড়ি, যেন ভূমিকম্প থেকে প্রাণপণ পালিয়ে যাচ্ছে, প্রফুল্ল ছুটে এলো রান্নাঘরে। কোথায়! মাটির উনুনটা শুকিয়ে খটখট করছে, কখন পাট তোলা হয়েছে, মেঝেতে জলের রেখাটি নেই। তাকের উপর বাসনগুলো এমন পরিপাটি করে' সাজানো, যেন রাত্রে আর রান্না করে' খেতে হ'বে না। ঘরের বাইরে খোলা কলের পাশে হাতল-হীন ভাঙা একটা কড়ার মধ্যে সকালবেলাকার ছাই রয়েছে জড়ো হ'য়ে, যেন এই উনুনের শেষ পরিচয়!

কাছেই বাথরুম, এগিয়ে যেতেই ভেজানো দরজাটা আলগোছে খুলে

গেলো; উঁকি দেবারো কিছু নেই, শুকনো শূন্যতা রয়েছে ছড়িয়ে। প্রফুল্ল চোখে উত্তাল অন্ধকার দেখলো, কোথায় মৃন্ময়ী? যেন ছিঁড়ে পড়ছে সে আকাশ থেকে, অপার শূন্যে আত্মহারার মতো সে ডেকে উঠলো: 'মিনু, মৃন্ময়ী!' ত্রস্ত পায়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘর ছুটোছুটি করতে লাগলো, কোথায় সে লুকিয়ে রয়েছে! নিচু হ'য়ে খাটের তলাটা সে দেখলে, শুধু পা-পোষটা রয়েছে ঢোকানো। দরজার পাশ, দেয়ালের কোণ, আলনার আড়াল—এমন-কি দেরাজটা পর্যন্ত সে টেনে দেখলো। কোথাও তার একগাছি চুল পর্যন্ত পড়ে' নেই! প্রফুল্ল তরতর করে' সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো নিচেতে, রাস্তায়, কোথায় সে যে যাচ্ছে তা জানে না, আবার তখুনি রাস্তা থেকে উঠে এলো উপরে। পরিপাটি বিছানাটা রূঢ় হাতে তছনছ করে' দিলো, লেখবার টেবিলটা স্তূপাকার করে' তুললো, হাতের কাছে যে জিনিস সে কুড়িয়ে পেলো, নিরুত্তর অসাড় জড় পদার্থ, সব ছুঁড়ে দিতে লাগলো এখানে-সেখানে, বলো, কোথায় মৃন্ময়ী? দেয়ালে ঘুষি মেরে মাথা ঠুকে রুদ্ধমান অসহায় কণ্ঠে সমস্ত শূন্যকে সম্বোধন করে' সে আবার ডাকলো: 'মিনু, মৃন্ময়ী!'

কিন্তু মুস্কিল এই, গলা উঁচিয়ে বেশি দূর ডাকা যায় না, লোকে শুনলে বলবে কী! এ তো আর ঘটা করে' বলা চলবে না যে স্ত্রীকে মশাই খুঁজে পাচ্ছি না—অন্তত বলায় তো কোনো মহত্ত্ব নেই। এমনি হয়তো কাছেই কোথাও গেছে, কতক্ষণ পরেই ফিরে আসবে। তার জন্যে এরি মধ্যে এমন একটা অকারণ কেলেঙ্কারি বাধিয়ে তুলেছে ভাবতে প্রফুল্লর হাসি পেলো। বিছানাটা সামান্য টান করে' সে একপাশে বসলো, জুতোর ফিতে খুলতে নিচু হ'লো আধখানা।

কিন্তু কোথায়ই বা সে যেতে পারে, কাছে, কতক্ষণের জন্যে! চমকে সোজা হ'য়ে দুই পায়ে সে অটল উঠে দাঁড়ালো। এত বড় কোলকাতায়

'কেউ তার পরিচিত নয়, না আত্মীয় না প্রতিবেশী। এ-ঘর থেকে ও-ঘর, এ-জানলা থেকে ও-জানলা, এই রাস্তায়ই তার পৃথিবী আহ্নিক ঘু'রে যাচ্ছে, আজ সমানে দেড় বছর। তার মধ্যে গু'নে তিন দিন হয়তো সে তাকে বায়স্কোপে নিয়ে গিয়েছিলো, আর একদিন সস্তা কি-একটা স্বদেশী মেলায়। এই তো তার কোলকাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সেই ভীরু মেয়ে আজ নিঃসঙ্কোচে দুপুরের রাজপথে নিরুদ্দেশ বেরিয়ে পড়েছে এই বা বিশ্বাস করবার হেতু কোথায়?

অন্ধ, উন্মত্তের মতো প্রফুল্ল আবার নিচে নেমে এলো। উপরের জানলা থেকে আদি-অন্ত দেখা যায় না, তাই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আর্ত, উদ্‌ভ্রান্ত চোখে সে বহুলীকৃত জনতার মধ্যে কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। কত ট্রাম আর বাস, ট্যাক্সি আর রিক্‌শ, ঘূর্ণ্যমান্ চাকায় উদাসীন দ্রুততা, কিন্তু কোথাও সেই কালো, কৌতুকোজ্জ্বল চোখের কণিকতম পলকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। পাগল! একা-একা রাস্তায়ই বা সে নেমে আসবে কি করে'? সামান্য একটা ফিরিয়ালাকে যে উপরে উঠতে দেয় না! প্রফুল্ল দুই দৃঢ় হাতে মাথার চুলগুলি সহসা সবলে টেনে ধরলো—এটা হ'লো কী?

কে একজন সমবেদনার সুরে জিগ্‌গেস করলে: 'কি হয়েছে মশাই? কিছু হারিয়েছেন?'

ভাসমান অবোধ চোখ মেলে প্রফুল্ল তার দিকে তাকিয়ে রইলো ক্ষণকাল।

'পকেট-কাটা গিয়েছে বুঝি? কত ছিলো মানিব্যাগে?'

প্রফুল্লর বুকটা ঠেলে উঠছিলো, কিন্তু কী বলবে তাকে? বলবে, আমার স্ত্রী হঠাৎ কোথায় চলে' গেছে মশাই, আকাশ-পাতাল কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ছি, ছি, ছি—প্রফুল্ল এক লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে উঠে এলো।

নতুন আর কোনো অভাবনীয়তা নেই, শূন্য ঘর এক হাঁটু হ'য়ে পড়ে' আছে।

এখন সে করে কী? পুলিশে খবর দেবে? সে একটা কী বিশ্রী জানাজানি হ'য়ে যাবে সহরময়; তার কোনো খবর নেই, হয়তো বড়ো-বড়ো হরফে বেরিয়ে যাবে কাগজে, প্রফুল্লর স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে নিরুদ্দেশ। সে তখন তার শোকের চেয়ে লজ্জা হ'য়ে উঠবে ভয়াবহ। তবে, হাঁসপাতাল ঘুরে বেড়াবে? সেখানে কী? হঠাৎ যদি তার কোনো দুর্ঘটনাই হ'য়ে থাকে, যাতে তার হাঁসপাতালের পথ হ্রস্ব হ'য়ে এসেছে, তবে বিছানায় এতটুকু একটা ভাঁজ নেই, সমস্ত ঘর তুলি দিয়ে আঁকা, কোথাও একটা জিনিস এক ইঞ্চি সরে' বসেনি!

প্রফুল্ল নিজেকে ভারি একা মনে করলো।

অসংলগ্ন আঙুলে এটা-ওটা নাড়তে-নাড়তে টেবিলের স্তূপের তলা থেকে সে একটুকরো কাগজ বা'র করলে। সদ্য ভাঁজ করা, টাটকা কালিতে লেখা—আশ্চর্য, মৃন্ময়ীরই অক্ষর। পুলকিত চোখে, চমকিত চোখে, নিষ্পলক চোখে প্রফুল্ল তিনবার সেই চিঠি পড়লে। তাতে লেখা:

আমি চললুম। বাঁ দিকের দেরাজে তোমার চাবি রইলো। আর টোপের তলায় ঢাকা রইলো তোমার খাবার। ইতি।

মৃন্ময়ী

জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রফুল্ল যখন তার চারপাশের জিনিসগুলোকে তাদের স্বকীয় আয়তনে অনুভব করলে, টান দিলো বাঁ দিকের দেরাজ: সত্যি, সেখানে চাবি।

আর সন্দেহ নেই, প্রফুল্ল বিছানায় ভেঙে পড়লো।

কিন্তু, স্বর্গে-মর্তে কোথায় সে যেতে পারে কোলকাতায়? এই প্রখর দ্বিপ্রহরে, নিঃসঙ্গ, নিষ্পরিচয়?

প্রফুল্ল হঠাৎ শাদা একটা আগুনের শিখার মতো সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। দেখলো, ও-পাশের ঘরের পশ্চিম দিকের জানলাটা খোলা।

সমস্ত চিন্তা তার ঘুলিয়ে কাদা হ'য়ে উঠলো। জানলার মধ্য দিয়ে সে যে একটা আতঙ্কময়, অন্ধকার গহ্বর দেখলে।

এ-জানলারই ঠিক মুখোমুখি আরেকটা জানলা, পাশের বাড়ির। কয়েকমাস আগে মৃন্ময়ী তাকে নালিশ করেছিলো যে এ-জানলায় আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে দাঁড়ানো যায় না, পাশের বাড়ির কে একটা বেকার লোক ও-পারে বসে' অহোরাত্র সমানে সিগরেট টানছে; আর তার চাউনিটা মোটেই বিনত নয়। সেই থেকেই কাঠের জানলাটা প্রফুল্ল চিরজন্মের জন্যে বন্ধ করে' রেখেছিলো। ঘরে তাতে একটু কম আলো হ'তে পারে, কিন্তু ঘনতা ও শান্তি থাকবে অব্যাহত। মৃন্ময়ীকে খেপাবার জন্যে কথাবার্তার শিথিল কোন ফাঁকে প্রফুল্ল সেই অজ্ঞাতকুলশীল প্রতিবেশীকে মাঝে-মাঝে ইঙ্গিত করতো বটে, কিন্তু সাহস করে' তবু জানলাটা খুলে দিতে পারতো না। মিস্ত্রি ডাকিয়ে জানলাটার সর্বাঙ্গে পেরেক ঠুকবার কথাও সে একবার ভেবেছিলো, কিন্তু সে যেন নেহাৎ মৃন্ময়ীর গালেই চড় মারা হয়। কিন্তু আজ এ কী সর্বনাশ! আলোয় ঘর যে অন্ধকার হ'য়ে গেছে।

প্রভূত, প্রবল রাগে প্রফুল্ল যেন নিমেষে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। কিন্তু সে তার পরাহত স্বামিত্বের প্রতিশোধ নিতে এক মুহূর্তও দেরি করলো না।

লোকটার সে নাম জানতো, অবনীনাথ দত্ত, যদিও তার সঙ্গে মুখোমুখি কোনো দিন আলাপ হয়নি। সটান সে তার বাড়ির দরজায় গিয়ে সবলে ধাক্কা দিলে।

কাঁচা ঘুম ভেঙে কে-একটা লোক বিরক্ত মুখে খুলে দিলো দরজা। বললে, 'কোন শালা ডাকাত পড়লো রে বাড়িতে?'

কথাটা গায়ে না মেখে প্রফুল্ল ব্যস্ত, উত্তপ্ত গলায় বললে, 'অবনীবাবু বাড়ি আছে ?'

লোকটা প্রফুল্লকে চিনলো। নম্র, কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'না। তিনি এইমাত্র বর্ধমান চলে' গেছেন।'

প্রফুল্ল যেন টলতে লাগলো ভিতরে-ভিতরে। বললে, 'না, বাড়ি আছে, তুমি তাকে ডেকে দাও।'

'সে কি কথা বাবু ? আমিই তাঁকে রাস্তা থেকে ট্যাক্সি এনে দিলুম।'

ঠিকই তো, বাড়িতে বসে' থাকবার সময় তো এ নয়। প্রফুল্ল পাংশু, পীড়িত মুখে জিগ্‌গেস করলে, 'কোন জায়গা বললে ?'

'বর্ধমান।'

'ঠিক জানো ?'

'অন্তত তাই তো শুনলুম।'

'ক'টার সময় ট্রেন ?'

'ট্যাক্সি করে' যখন গেছেন তখন শিগ্‌গিরই ট্রেন ছেড়ে যাবে।'

'একা গেছেন বলতে পারো ?' প্রফুল্ল কানে-কানে বলার মতো করে' বললে।

'অত আমি দেখিনি বাবু।' লোকটা যেন হাসলো একটু লুকিয়ে : 'তবে একা যাবার ছেলে সে নয়।'

'তার মানে ?' প্রফুল্ল একেবারে তার হাত চেপে ধরলো।

'মানে—' লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো আকস্মিক : 'এ কি, আমাকে আপনি মারতে এসেছেন নাকি বাড়ি বয়ে' ?'

মুহূর্তে হাত ছেড়ে দিয়ে প্রফুল্ল রাস্তায় ছুটে এলো ও বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে' চলমান প্রথম বাস্‌ থামিয়ে উঠে পড়লো আচম্‌কা।

কণ্ডাকটার হাত পাতলো।

প্রফুল্ল পকেটে হাত ডুবিয়ে বললে, 'হাওড়া।'

এ-বাস হাওড়া যাবে না। আর গেলেই বা কি, বর্ধমানের ট্রেন কখন না-জানি ছেড়ে গেছে। আর তারা বর্ধমানই গেছে কিনা কে বলবে? আর সেখানে গিয়ে তাদের দেখা পেলেও বা কী এগোবে? নির্লজ্জের মতো সে মারামারি করবে, না, মোকদ্দমা আনবে কাপুরুষের মতো? চলে'ই যদি সে যেতে পারলো তো যাক, ধূলোর পিছনে আর ধাওয়া করা কেন? বিসর্জিত প্রতিমার রাংতা আর খড়ের আঁটি নিয়ে সে করবে কী?

ভালো করে' না থামতেই প্রফুল্ল লাফিয়ে নেমে পড়লো বাস্ থেকে। রাগটা তার অবনীর উপর না হ'য়ে মৃন্ময়ীর উপরই তো হওয়া উচিত। এ-ক্ষেত্রে আইন মৃন্ময়ীকে ক্ষমা করলেও সে কক্‌খনো ভুল করবে না। অতএব, ধরণী দ্বিধা হও, আমিই নেমে পড়ি।

প্রফুল্ল তার ঘরে ফিরে এলো, যেন এক নিশ্বাসে অনেক বয়েস পেরিয়ে। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে শরীরে সে তার রাগের কোনোই লক্ষণ দেখতে পেলো না, বিপর্যস্ত বিছানায় একেবারে লুটিয়ে পড়ে' অবোধ শিশুর মতো ফুলে-ফুলে অসহায় কেঁদে উঠতে লাগলো।

কেন চলে' গেলো মৃন্ময়ী, চোখের থেকে ঘুম যেমন চলে' যায়? কিন্তু কেন, কেনই বা সে যাবে না? সোনালি রোদে ঝিল্‌কিয়ে-ওঠা রূপোলি ঝর্ণা—এই মৃন্ময়ী, তার শরীর যেন লাবণ্যের লঘু একটি ধারা নেমে এসেছে। কতো তার সাজবার সখ, আর সাজলে তাকে কী ইন্দ্রাণীর মতোই না-জানি মানাতো, অথচ তার জন্যে কী সংগ্রহ করতে পেরেছিলো প্রফুল্ল? আর সে ছাড়া মৃন্ময়ী কার কাছেই বা চাইবে? আজ তিন দিন ধরে' তার কাছে সে কুঙ্কুমের একটা শিশি চাইছে, বাজে অপব্যয় হ'বে বলে' সে গা করে নি। কতো তার পরবার সখ—সামান্য আটপৌরে

সাড়িতেই তার কান্তি শ্রীমতী হ'য়ে ওঠে বলে' চোখ ঠেরে চিরকাল সে তাকে ঠকিয়ে এসেছে। কিন্তু সে তা শুনবে কেন? কোন দেবতা শুনেছে নৈবেদ্যহীন নিবেদনে, কেবলমাত্র আত্মার আহুতিতে? যাবেই তো সে চলে' এই স্বাদহীন বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন অস্তিত্বের অন্ধকূপ থেকে। কী কুক্ষণে সে পাড়ার ব্যাঙ্কে একটা খাতা খুলেছিলো। অঙ্কের মোহে পড়ে' সে আর যোগফলের দিকে তাকিয়ে দেখেনি। দিনে-দিনে বালুকণা কুড়িয়ে সে আজ বিস্তীর্ণ মরুভূমি সৃষ্টি করেছে দেখ। তাই সে কৃপণ, কঠোর, সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেছিলো ক্রমে-ক্রমে, সামান্য একটা কুঙ্কুমের শিশি সে তাকে কিনে দেয়নি। সে ছিলো রৌদ্রে পাখা-মেলে-দেয়া পাখি, তাকে সে দেয়াল দিয়ে দলিত করে' রেখেছিলো। বায়স্কোপ দেখবার নামে সে মেতে উঠতো, এখনো দ্রুত কোনো গাড়িতে উঠতে পেলে খুসিতে সে ঝলমল করে' ওঠে, ছুটিতে নতুন কোনো একটা জায়গায় যাবে শুনলে দেড় বছর ছেড়ে অনন্তকাল পর্যন্ত সে আনন্দে প্রতীক্ষা করতে পারে। অথচ তাকে কোলকাতার বাইরে আর-কোথাও নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, কোলকাতাকেই তার কাছে প্রফুল্ল বোজানো একটা বইয়ের মতোই নিরর্থক করে' রেখেছিলো। বরং তাকে সে নির্লজ্জ শাসন করতো, রাস্তার ধারের জানলার কাছে অন্যমনস্কের মতো এসে দাঁড়ালে, ধমকাতো যদি সে বেড়াবার বায়না ধরতো, গম্ভীর মুখে শাস্ত্র আওড়ে দিতো যদি সে তরল বিলাসিতায় শরীরে আনতে চাইতো লহর আর লঘুতা। অথচ তার উপায় ছিলো, বেকার বসে'-বসে' সে নিরর্থক সিগারেট খেয়ে পয়সা উড়োয়নি। কিন্তু অপসঞ্চয় যে অপব্যয়ের চেয়েও শোকাবহ। তাই সে ঠিকই করেছে, চলে' গিয়েছে। কী দিয়েছে সে মৃন্ময়ীকে, এই নিস্তরঙ্গ নির্জ্জনতা ছাড়া? তার কোলে একটা ক্রীড়নক শিশু পর্যন্ত নেই, যাকে নিয়ে সে অবসর বিনোদন করে। কী করবে সে এখানে থেকে, এই মৃত

দেয়ালের রুক্ষতায়? হায়, চারদিকে সে শুধু দেয়ালই গেঁথে রেখেছিলো, কিন্তু চেয়ে দেখেনি কোথায় একটি জানলা রয়েছে খোলা।

কিন্তু শেষকালে অপদার্থ, অকর্মণ্য, অনাবশ্যক ঐ লোকটার সঙ্গে সে চলে' যাবে এই কথা ভাবতেই যেন একটা তীক্ষ্ণ ছুরি প্রফুল্লর বুকের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত রক্তাক্ত দাগ রেখে গেলো। ক্ষিপ্তের মতো উঠে পড়লো এক ঝটকায়। কিন্তু চলে'ই যদি সে যেতে পারলো, তবে লোকটা পদার্থ কি অপদার্থ তা নিয়ে বিচার করে' কোনো ফল নেই। সমুদ্রে যে ডোবে, হাতের কাছে খড়কুটো পেলে সে কখনো তার ওজন মেপে দেখে না। চলে' আসতে পেরেছে তো অবাধ হাওয়ার মধ্যে, অজস্র আকাশের নিচে, নীল উন্মুক্ততায়। পাখা তো মেলে দিতে পেরেছে দুরন্ত, ঝটিকার প্রলোভনে। এই তো পরম, জীবনের সন্ধানে এই দুর্নিবার অভিসার। পরে কী হ'বে তা নিয়ে প্রাক্‌শোচনা করার মতো মূর্খতা আর কিছু নেই—প্রফুল্লরই বা পরে কী হ'বে?

প্রফুল্ল আস্তে-আস্তে তার বাঁকানো বেতের ইজিচেয়ারটাতে এসে বসলো, শোকাকুল শান্তিতে গা এলিয়ে দিলো আস্তে-আস্তে। দিন অবসন্ন হ'য়ে আসছে, রাগের পর প্রফুল্লরো মনে এখন ব্যথার স্নিগ্ধতা। বাইরে দড়িতে মৃন্ময়ীর শূন্য একটা সাড়ি শুকোতে দেয়া হয়েছে, এখনো ঘরে নেয়া হয়নি, সেই সাড়িতে মৃন্ময়ীর কৃশ শরীরের ঘুমন্ত কোমলতা যেন সে দেখতে পেলো আর তার বুকটা মথিত হ'য়ে উঠলো দীর্ঘশ্বাসে। এখান থেকে দেয়ালের টানা আয়নাটা চোখে পড়ে, চুল বাঁধবার সময় কালো ফিতে দিয়ে কেশমূল ঘিরে সেই ফিতে ফের দাঁত দিয়ে তার চেপে ধরা যেন আয়নাতে সদ্য আঁকা আছে—সেই তার খোঁপা ফোলাবার সময়কার ঊর্ধ্ব-উৎক্ষিপ্ত বাহু! ফুলদানিটাতে ফুল রয়েছে শুকিয়ে, তার চলে' যাওয়ার বেদনায় ম্রিয়মাণ। ঘরের কোণে তার শেষ পরিত্যক্ত মলিন

সাড়িটি যেন তার শেষ মুহূর্তের নিরুত্তর সাথীর মতো পড়ে' আছে। সে চলে' গেছে এ কথা যেন এখনো বিশ্বাস করা যায় না, অথচ এখানে থাকবেই বা সে কিসের আকর্ষণে?

বিকেলের ঝি এলো নিয়মিত, কাজে হাত দিলে। সংসারে কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম হয়নি। নিচে, রাস্তায় জনপ্রবাহ তেমনি উত্তাল ব্যস্ততায় আলোড়িত হ'য়ে উঠেছে। এখুনি দোকানে-দোকানে আলো জ্বলে' উঠবে; বায়স্কোপ স্থুরু হ'বে, কত হাসি আর হল্লোড় পথে-বিপথে। কে খোঁজ নিতে আসবে তার এই ক্ষতাক্ত ক্ষতির পরিমাণ! অন্য দিন হ'লে কখন সে বেরিয়ে যেতো বাড়ি ছেড়ে, ঐ জনতরঙ্গেরই একটা ফেনা, কী মুক্তি, কী পূর্ণতা—আর আজ কিনা সে শূন্য, নিরানন্দ ঘরে মলিন সন্ধ্যায় একাকী বসে' রয়েছে অসহায়!

ঘরের হাল দেখে ঝি পিছিয়ে গেলো। বললে, 'মা কোথায়?'

প্রফুল্লর বুক ঠেলে বিপুল কান্না উথলে উঠতে চাইলো। কিন্তু ঝির কাছে আত্মসম্বরণ না করাটা ভালো মনে হ'লো না। যাই হোক, সামান্য একটা ঝির সঙ্গে নিজের স্ত্রীর চরিত্র আলোচনা করতে বসবে প্রফুল্ল এমন নিষ্ঠুর নয়। তাই কী বলবে কিছু ভেবে না পেয়ে মুখে যা এলো তাই সে বলে ফেললে: 'থিয়েটারে গেছেন।'

ঝি সামান্য অবাক হ'য়ে বললে, 'থিয়েটারে! দুপুরবেলায় থিয়েটার কি গো!'

'হ্যাঁ, লম্বা পালা—দুপুর দু'টোর থেকে স্থুরু।' প্রফুল্ল একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললে।

এই উত্তরে ঝি ঠিক সন্তুষ্ট হলো কিনা বোঝা গেলো না। একে-একে সে ঘর গুছিয়ে দিতে লাগলো। বললে, 'আপনার চা করে' দেবো?'

তারই তো বাড়ি, তারই তো ঘর, তারই তো উপার্জন—মৃন্ময়ী চলে'

গিয়েছে সত্ত্বেও তো বাঁচতে হ'বে পৃথিবীতে—তাই তার বরাদ্দ এক পেয়ালা চা সে খাবে না কেন? উদাসীন, বিস্বাদ গলায় বললে, 'নিয়ে এসো।'

ঝি চা করে' আনলো। পেয়ালায় চুমুক দিতেই প্রফুল্লর মনে পড়ে' গেলো টোপের তলায় মৃন্ময়ী খাবার ঢেকে রেখে গেছে, তার বিদায়ের শেষ পরিহাস। আশ্চর্য, মৃন্ময়ী চলে' গেলেও তার খিদে পাবে, ঘুম আসবে, আবার ঘুম ভেঙে কাল ভোরে আপিস করতে হ'বে। মুখে হাসি টেনে কথা বলতে হ'বে, শূন্য সন্ধ্যায় বায়স্কোপে গিয়েও বসতে হ'বে মাঝে-মাঝে, জীবন কিছুতেই ক্ষমা করবে না। তবে মাঝখান থেকে খাবারটা খেয়ে নিতেই বা কী দোষ?

বললে, 'ও ঘর থেকে আমার খাবারটা দিয়ে যাও, ঝি।'

কাঁচের ফুল-কাটা প্লেটে ঝি খাবার নিয়ে এলো, ছোট-ছোট ক'টি গোকুল-পিঠে, ক্ষীরের দু'খানি ছাঁচ, অশথ-পাতায় দেয়া পাৎলা একখানি আমস্বত্ব।

কিছুমাত্র সন্দেহ না করে' প্রফুল্ল তা একে-একে নিঃশেষ গলাধঃকরণ করলে।

ভাগ্যের এ কী রসিকতা! বিষক্রিয়ায় প্রফুল্লর শরীর অবসন্ন হ'য়ে এলো না, বরং নতুন উত্তরের হাওয়ায় তার ক্লান্তি যেন মুছে যেতে লাগলো। যেন সূর্য নিবে যাবার আগে পশ্চিমে তার ব্যথার একটি রক্তাক্ত আভা রেখে গেছে।

প্রফুল্ল ঝিকে আলো নিবিয়ে দিতে বললে। বললে, রাত্রে সে কিছু খাবে না, ভীষণ মাথা ধরেছে, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে' বিছানায় প্রসারিত হ'য়ে পড়লো।

কখন যে তার ঘুম ভেঙে গেছে প্রফুল্ল খেয়াল করতে পারলো না।

দেখলো ঘরে অনেক আলো আর উত্তাপ, শব্দ আর চঞ্চলতা। চোখ কচ্‌লে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বিছানায়। দেখলো, ঘরের মধ্যে, আর কেউ নয়, স্বয়ং মৃন্ময়ী।

এই সময় মৃন্ময়ী এমন করে' বাড়ি ফিরে এলে কী করতে হ'বে তার জন্যে প্রফুল্ল মোটেই প্রস্তুত ছিলো না, তাই সে ক্ষণকাল রুদ্ধশ্বাস, স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো। দেখলো মৃন্ময়ীর গায়ে অনেক গয়না, পরনে বিচিত্রবিন্যস্ত সাড়ি, কী অপূর্ব্ব ছাঁদে খোঁপাটা সে আজ বেঁধেছে, পাত্রের মুখে মদের ফেনার মতো সমস্ত সৌন্দর্য যেন তার ফেঁপে উঠেছে, পান খেয়ে ঠোঁট দু'টিতে তার অপরূপ চটুলতা, চমকিত চোখের কুঞ্চিমায় বঙ্কিম কটাক্ষ—যেন সে সহসা জাগ্রত তরুণ সূর্যের মতো দশদিকে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়লো। আশ্চর্য, প্রফুল্ল তাকে না পারলো তিরস্কার করতে, না বা পারলো ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে। শুধু সামান্য কৌতূহলী হ'য়ে জিগ্‌গেস করলে: 'কখন এলে ?'

'এইমাত্র।' মৃন্ময়ী অধীর আগ্রহে আচলটা মাটিতে লুটিয়ে দিলো। কুণ্ডলায়িত খোঁপাটাকে সহসা সর্পিল বেণীতে রূপান্তরিত করলে।

প্রফুল্ল জিগ্‌গেস করলে, 'কেমন দেখলে থিয়েটার ?'

'যাচ্ছেতাই।' মৃন্ময়ী চিবুকটা একটু ভারি করলো: 'পাশ পেয়েছিলুম বলে' রক্ষে।'

'তোমার নিপুকাকা যিনি পাশ দিয়েছিলেন, তাঁর তো থিয়েটারে এখনো অনেক কাজ—' প্রফুল্ল ঈষৎ কুটিল চোখে বললে, 'তবে কার সঙ্গে এলে শুনি ?'

'কার সঙ্গে আবার আসবো! নিপুকাকাই পৌঁছে দিয়ে গেলেন গাড়ি করে'!'

'সত্যি ? তবে তাঁকে নিয়ে এলে না কেন ওপরে ?'

'থিয়েটারে এখনো তাঁর অনেক কাজ—তোমার মত হাই তুলতে-তুলতে তো আর অত বড়ো থিয়েটারের ম্যানেজারি করা চলে না—তাই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই ফের গাড়ি ফেরালেন।'

'তবু একবার হর্নটা তাঁকে বাজাতে বললে পারতে—জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখতুম।'

'নাও, আর ন্যাকামি কোরো না। এবার আমার এই আঁচলের ব্রোচটা খুলে দাও দিকি।'

বিছানা ছেড়ে প্রফুল্ল মৃন্ময়ীর কাছে এসে দাঁড়ালো। এক মুহূর্ত শুধু ভাবলো তাকে ছোঁবে কি ছোঁবে না—কিন্তু সেই মুহূর্তে ঝি যখন কি কাজের অছিলায় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো, প্রফুল্লর ইচ্ছে হ'লো এক্ষুনি তার মাইনে চুকিয়ে দিয়ে ঘর থেকে তাকে বিদায় করে' দেয়।

# ডবল ডেকার

অনেক চেঁচামেচি করে', অনেক উইল-ফোর্স খরচ করে'ও মোহন-বাগানকে জেতাতে পারলুম না। প্রায় আধ-মাইল লম্বা 'কিউ' করে' ঘণ্টাটাক দাঁড়িয়ে মাঠে ঢুকেছি সেই আড়াইটেয়,—খট্‌খট্ করছিলো রোদ, গ্যালারিতে উঠে দেখি এক হাঁটু জমাট কাদা। খানিক আগে মাঠে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে নাকি? আকাশের চেহারায় তো তা মনে হয় না, তবে এই কাদা এলো কোত্থেকে? মানুষের গায়ের ঘাম পড়ে'-পড়ে' মাটি ভিজে কাদা হ'য়ে গেছে। তাই সই। তবু, আকাশের দেবতারা প্রসন্ন থাকুন, এই রোদে পুড়তে কোনো আপত্তি নেই, তাঁদের রুদ্র দৃষ্টি এখন শীতল না হ'লেই হয়। জামা-কাপড়ের ছিরি নেই, সময় কাটাবার নিদারুণ উৎসাহে তুমুল চীৎকার, জায়গা নিয়ে মারামারি চলেছে। নুন মেখে কেউ শশা কামড়ে খাচ্ছে, বরফের টুকরো ভেঙে ঘাড়ে-গলায় বুকে-পিঠে কেউ সজোরে মালিশ করছে। হাঁটু গুটিয়ে কোলের ওপর রেইন্‌-কোট বিছিয়ে কারা নিয়ে বসেছে তাস, রোদ্দুরে ছাতা-মাথায় কেউ পড়ছে বই—হাতে এখনো এতো সময়, তাড়াতাড়ি একটি পৃষ্ঠাও খরচ করে' ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কাতারে-কাতারে পিঁপড়ের সারের মতো দঙ্গলে-দঙ্গলে লোক আসছে,—দেখতে-দেখতে গেইট্ বন্ধ হ'য়ে গেলো। লোক এসে জমতে লাগলো দক্ষিণের ঢালু র‍্যাম্‌পার্টে,—মানুষের মাথা মানুষে খাচ্ছে—

এমনি ভিড়। একটা বিরাটকায় কালো সমুদ্র থেকে-থেকে তরঙ্গান্দোলিত হচ্ছে।

আমি চুপ করে' বসে'-বসে' সেই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছি। যখন এই বিপুল জনসমুদ্র সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করে' উল্লাসের অমিতপ্রাবল্যে দিক্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করে' তুলবে। কোথায় তখন পায়ের জুতো, কোথায় বা মাথার ছাতি! বাগবাজারের চাপা গলির অন্ধকার রান্নাঘরে উনুন ফোঁয়াতে-ফোঁয়াতে কেরানির বউ ভাববে: মোহনবাগান গোল দিলো, যাক্ স্বামীর সঙ্গে রাতটা আজ তার ভালোই কাটবে; সেই চীৎকারের শব্দে জগুবাজারে মাংসের দর এক মুহূর্তে বেড়ে-বেড়ে যাবে,—রোয়াকে-রোয়াকে আড্ডা, হোটেলে-রেষ্টোর‍্যাণ্টে চায়ের পেয়ালার টান্ ধরে' গেলো, বাস্‌এর মাথায়-মাথায় আকাশ-ছোঁয়া চীৎকার—কোথায় এবার একটা কলিশান্ হোক্; ট্রামের কণ্ডাক্‌টারকে কেউ আজ আর পয়সা দেবে না। বসে'-বসে' সেই উন্মুখর উগ্রোচ্ছ্বসিত তীক্ষ্ণ মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছি। চীৎকারের তাপে সমস্ত বায়ুমণ্ডল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, লক্ষ-লক্ষ উত্তোলিত হাতের আড়ালে আকাশকে আর দেখা যায় না। কোনো জাতিভেদ নেই, বয়সের তারতম্য নেই, পদমর্যাদার কৃত্রিম মানদণ্ড কখন ভেঙে পড়েছে—আমি, তুমি, রাম-শ্যাম—রবীন্দ্রনাথ থাকলে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি থাকলে গান্ধি—সবাই সমস্বরে, ক্রমবর্ধমান স্বরে, পরস্পর-প্রতিযোগী স্বরে চীৎকার করে' উঠেছি—কোথায় কী দুঃখ, কোথায় কা'র জামা ছিঁড়লো, পিঠ ছড়ে' গেলো, পকেট কাটা গেলো, বাড়িতে কা'র চাল বাড়ন্ত, আফিস-পালানোর জন্যে কাল বড়ো-বাবুকে কি জবাবদিহি দিতে হ'বে, পুরোনো বইর দোকানে পড়ার বই বেচে এসে আসছে-পরীক্ষায় কি অসুবিধেয় পড়তে হ'বে, দুপুরেই দোকান বন্ধ করে' রেখে বিক্রি-পাটার কি ক্ষতি হ'লো—কেউ আর তা ভাবছে না। আমি,

তুমি, রাম-শ্যাম, গান্ধি থাকলে গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ থাকলে রবীন্দ্রনাথ, সবাই দু'হাত তুলে, নেচে, লাফিয়ে, পরস্পরের পিঠ চাপড়ে, উৎসাহে স্ফীততরো হ'য়ে ঠোকাঠুকি খেয়ে গ্যালারির ফাঁকে গড়িয়ে পড়ে' চীৎকার করছি, গঙ্গার জলে অকালে জোয়ার এসে গেছে, চীৎকারের প্রাবল্যে বাগবাজারের সেই কেরানি-বউটির উনুন ধরে' গেলো। পৃথিবীকে নতুন করে' ভালো লাগছে, এতো ভালো লাগছে যে এতোকালের জোচ্চোর রেফারির গলা জড়িয়ে ধরতে পর্যন্ত আর দ্বিধা নেই।

তারই প্রতীক্ষায় সমস্ত শরীর আবিষ্ট করে' তন্ময় হ'য়ে বসেছিলাম, হঠাৎ বহুকণ্ঠে রব উঠলো : হাওয়া, হাওয়া!

তারপর দীর্ঘ একটানা সুরে একটি গদ্‌গদ 'আঃ' নদীস্রোতের মতো সমস্ত জনতার উপর দিয়ে ভেসে গেলো।

ঝুপ্ ঝুপ্ করে' ছাতা বন্ধ হ'য়ে গেলো—দেবতার স্নেহাশীর্বাদের মতো দক্ষিণ থেকে ঝিরঝিরে একটু হাওয়া দিয়েছে। ছাতাগুলি বুজতেই দাঁড়িয়ে পড়ে' মাঠের চেহারাটা তলিয়ে দেখতে চাইলাম—ওপারের গ্যালারিতে শাড়ি ও ব্লাউজের কয়েকটা ছিঁটে-ফোঁটা চোখে পড়লো, ফিক্‌শ্চারের কাগজটা নেড়ে-নেড়ে গালের ওপর মৃদু-মৃদু হাওয়া করছে। আরতি আজ মোহনবাগানের খেলা দেখবার জন্যে সকাল থেকেই বায়না ধরেছিলো, নারীজাগরণের এই দৃষ্টান্তটুকু তাকে দেখতে দিলুম না বলে' এখন একটু কষ্ট হচ্ছিলো যা-হোক্। বউ নিয়ে খেলার মাঠে আসায় অনেক বিপদ আছে, প্রথমত তারা কতোগুলি অন্যায় সুবিধা চায়, পুরুষের মতো স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করবে, অথচ তার দায়িত্ব নেবে না। ভিড়ে আসবে, অথচ ভিড়ে তাদের গা কেউ স্পর্শ করলেই তাদের জাত গেলো। নিজে ধাক্কাধাক্কি করতে পারবে না, দুর্বলতার ওজুহাতে আশা করবে অন্যে সবাই তাকে পথ ছেড়ে দেবে।

ার জন্যে ভালো জায়গা চাই, দু'পাশে দু'জন বলশালী দেহরক্ষীরো দরকার, অতএব আরতিকে আনতে হ'লে ছোটভাইয়েরো টিকিটের পয়সা আমাকেই গুনতে হ'তো। তারপর স্ত্রীর সামনে অমন হাত পা তুলে মুক্ত উন্মত্ত আনন্দ-বন্যায় নিজেকে ছেড়ে দিতেও কেমন লজ্জা করবে, মাত্র একটু হাততালি দিয়েই থেমে পড়তে হ'বে—সে-কথা মনে করতেও দেহ-মন ক্লান্ত, অবসন্ন হ'য়ে আসে। খেলার মাঠে এসেও যদি সম্ভ্রান্ত হ'য়ে বসে' থাকতে হয়, তা হ'লে বিয়ে না করাই উচিত ছিলো। সেই আনন্দাগ্নিদীপ্ত মুহূর্তে বিয়ের কথাটা ভুলে থাকার জন্যেই তো খেলার মাঠে আসা। তা, হাঙ্গাম তো ঐখেনেই শেষ হ'লো না। কে গোষ্ঠপাল, কে কুম্মার, কিসে কখন কর্নার হয়, অফ্‌সাইডের নিয়ম কি, রেফারি কোথায় কী জোচ্চুরি করছে—সব তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বুঝিয়ে দাও। এ যেন খেলার মাঠে বসে' পরের দিনের খবরের কাগজে রিপোর্ট পড়ছি। নিয়ে এলুম না বলে' আরতি রাগ করেছে করুক, তবু তার সান্নিধ্যে ভদ্র, নিরীহ, নির্জীব হ'য়ে বসে' থাকার চেয়ে এই অবারিত বন্যতায় অনেক সুখ!

হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মোহনবাগানের ললাট অন্ধকার করে' দেখতে-দেখতে মেঘ করে' এলো। মুহূর্তে সকলের মুখ ম্লান, চোখে কাতর প্রার্থনা, নিশ্বাসে অসহায় হাহাকার! রাশি-রাশি চক্ষু তখন আকাশে উত্তোলিত হ'য়ে নীরবে কাকুতি জানাচ্ছে। একসঙ্গে এত চক্ষুর সম্মিলিত দৃষ্টিতে লজ্জিত শিহরিত হ'য়ে আকাশ স্ফুটযৌবনা নারীর মতো সমস্ত গায়ে পুরু করে' মেঘাবরণ টেনে দিচ্ছে। নিশ্বাস রুদ্ধ করে' এক মনে রৌদ্র কামনা করছি—যে-চোখে শিব মদনের দিকে তাকিয়ে তাঁকে ভস্ম করে' দিয়েছিলেন সেই দৃষ্টি সমস্ত আকাশময় প্রসারিত হোক। আমরা দগ্ধ হ'তে চাই, শীতল হ'তে চাই না—আমাদের এই দুর্দিনে এই অকারণ দাক্ষিণ্য না দেখালেও চলবে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে এর আগে আকাশ

১৬

কোনো দিন দেখিনি, তার উপস্থিতি জীবন থেকে কবে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, এখন অসহায় চোখে তাকিয়ে তারই ধ্যান করতে হচ্ছে। চারদিকে কত যে গবেষণা চলছে তার লেখা-জোখা নেই, কখন কোন মেঘে বৃষ্টি হয়, পূব থেকে হাওয়া উঠলেই যে সব ফর্সা হ'য়ে যাবে, পশ্চিমের মেঘ অমোঘ হ'লেও ওটা বিশেষ মারমুখো বলে' মনে হচ্ছে না, ঐ তো আবার একটু নীলের আভাস দিয়েছে—এমনি সব ব্যাকুল বহু-বিস্তৃত আলোচনায় নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইলুম—সবাইর জীবনে এই মুহূর্তে আকাশই এখন একান্ত প্রয়োজনীয়, একান্ত সন্নিহিত, একান্ত অন্তরঙ্গ—ওদের আকাশে আকাশ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু মোহনবাগানের পায়ের তলার মাটি পিছল করে' দিগন্ত ছেয়ে আকাশ শতধারে নেমে এলো, হাজার-হাজার ছাতি চিলের ডানার মতো বিস্ফারিত হ'য়ে আকাশের এই নির্লজ্জতাকে ঢাকতে চাইলো,—কিন্তু খোলা মাঠের ওপর আর ছাদ উঠলো না, ঘাস ডুবিয়ে জলের তরলতা উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে।

জল এক সময় থামলো বটে, কিন্তু আকাশের মেঘ আমাদের মুখে এসে বাসা বেঁধেছে। তবু ধুক্-পুকুনি, তবু আশা, তবু উইল-ফোর্স। আবার বৃষ্টি, আবার 'ছাতা বন্ধ, ছাতা বন্ধ !' মোহনবাগান যখন প্রথম গোল খেলো, রেফারি আপন আনন্দে বাঁশি বাজালে। রেফারির সেই দীর্ঘ স্বচ্ছন্দ হুইস্‌ল্‌টা সকলের বুক চিরে দিলে।

ম্লানমুখে ক্লান্ত পায়ে ফিরে চলেছি। ভিজে কাকের মতো চেহারা, জামা-কাপড়ে দুর্দশার আর অবধি নেই, জীবনে কোথায় কী অবলম্বন আছে খুঁজে পেলুম না। পকেটে কতোগুলি চিনে-বাদাম ছিলো তাই একটা ভেঙে মুখে দিলুম, কোনো স্বাদ নেই। না পারছি বসতে, না চলতে—যেন শ্মশানে এই মাত্র কোন প্রিয়জনকে পুড়িয়ে এলুম। যেন দশ বছর আয়ু কমে' গেছে। পয়সাতে পয়সা, শরীরের ওপর দিয়ে রোদ-

বৃষ্টি যথেষ্ট অত্যাচার করে' গেলো—তাতেও বিশেষ কিছু এসে যেতো না, কিন্তু নিজের কাছে নিজের এই পরাভবের লজ্জা লুকোবার আর ঠাঁই নেই। কেউ কারুর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না, দল থেকে সবাই একে-একে ছিট্‌কে পড়ে' আলাদা হ'য়ে যাচ্ছে—বাহিনী রচনা করে' রাস্তায় মোটরগুলির পথ রুখে দাঁড়াবার কারু উৎসাহ নেই। তারপর আবার এখন বাড়ি ফিরতে হ'বে। কতো ঠাট্টা, কতো টিটকিরি, কতো বাক্যযন্ত্রণা! দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস্‌এর দেয়ালে টাঙানো পাসের লিষ্টিতে নাম না উঠলেও এতো লজ্জা ছিলো না। কালীর কাছে কতো মানসিক, আমি না-হয় অসুখে ভুগে এক মাস বিছানায় পড়ে' থাকবো, তবু মোহনবাগান জিতুক,—এমনি সব কতো মিনতি—কতো গোপন নাম-জপ। এখন বাড়ি ফিরতে হ'বে ভেবে পা ভারি হ'য়ে উঠলো, শরীর আর বইতে পারছি না।

মোহনবাগান জিতলে এখন বাড়ি ফিরে আরতির সঙ্গে ভাব করা কতো সহজ হ'য়ে উঠতো। তার সমস্ত অভিমান উদ্দাম উৎসাহে উড়িয়ে নিয়ে যেতুম, চুপ করে' বসে' থাকবার তারই বা উপায় থাকতো নাকি? মোহনবাগান জিতেছে! আরতি নিজের খুসিতেই উচ্ছলিত হ'তো, দুই চোখ বড়ো করে' আমার মুখে সেই উদ্দীপনাময় ইতিহাস শুনতো। যেন আমিই কোন যুদ্ধে বিজয়ী হ'য়ে ঘরে ফিরলুম! ছেলেদের কলকোলাহলের আর অন্ত থাকতো না। নিদারুণ খিদে পেতো, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে সেই দ্রুত, তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছন্ন পাস্‌গুলি অনুধাবন করতুম, পরদিন সকালে উঠে খবরের কাগজে পৃষ্ঠা উলটে দেখতুম কালকের স্বপ্নটা স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে ধরা আছে; মনে-মনে আবার তার পুনরভিনয় চলতো। আরতিকে পড়ে' শোনাতুম—তাকে মাঠে নিয়ে যাইনি বলে' আর তার দুঃখ নেই—মোহনবাগান তো জিতেছে!

তবু তাকে নিয়ে আসিনি, ভালই করেছি। এই অপমান গা পেতে সে সইতে পারতো না, আমারো আর এমনি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পরমদুঃখীর মতো উচ্ছৃঙ্খল বিচরণ করবার পথ থাকতো না। দু'জনে পাশাপাশি চুপ করে' পথ ভাঙা, বাস্ চাপা, বাড়ি ফেরা—সে একটা ভীষণ, অমানুষিক শাস্তি মনে হ'তো। না-এসে সে ভালোই করেছে, প্রত্যক্ষদর্শীর এই লাঞ্ছনা থেকে সে রেহাই পেলো। তারপর এই শারীরিক অবসাদ—আপাদমস্তক ভিজে হেমেন মজুমদারের ছবিটি,—তারপরে নাও ট্যাক্সি; শালকরের দোকানে শাড়ি ধুতে দিয়ে এসো। কিছু বলবার নেই, তার নিঃশব্দ ধিক্কারে আরো জীর্ণ হ'তে থাকতুম।

এখন কিনা দিব্যি রোদ উঠে' গেছে, আকাশ একেবারে ফট্‌ফট্ করছে সাদা। আমাদের পরাজয়কে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই তার এই রহস্য। তবু এখনো মেঘ করে' থাকলে দুঃখটা একটু সহানুভূতির প্রত্যাশা করতে পারতো—এ একেবারে উলঙ্গ উপহাস। বাড়ি ফেরা এখন অসম্ভব, দুঃখটা মনের মধ্যে একটু থিতিয়ে না নিলে কিছুতেই আরতির মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবো না। এই অসম্মান ও অসার্থকতার পর তার নীরব উপেক্ষা দুঃসহ হ'য়ে উঠবে।

শ্যামবাজারের একটা দোতলা বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে। হাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলে জামা-কাপড় একটু শুকোতে পারে—এই ভেবে হাঁটুর কাপড় পায়ে নামিয়ে, ছাতাটা বগলের তলায় গুটিয়ে পা-দানির ভিড় ঠেলে বাস্‌এ উঠে প'ড়লুম। নিচে-উপরে সিঁড়ির ধাপে-ধাপে রাজ্যের ভিড়, তবু উপরে উঠতে পারলে হাওয়া পাবো ভেবে ঠেলে-ঠুলে জায়গা করে' উপরে চলে' এলুম। সামান্য একটা আলপিন রাখবার জায়গা নেই, দু'পাশের সিটের মাঝখানকার প্যাসেজটা পর্য্যন্ত লোকের ভিড়ে জাম্ হ'য়ে আছে। সবাইর মুখে অবান্তর সব কথা : ছাদটা না ভেঙে পড়ে,

বাঁক নেবার সময় সাবধান, এটায় মান্থলি সিষ্টেম আছে তো? আসল কথা সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে। কে কখন এসেছে, বৃষ্টিতে যতো না ভেজায় তার চেয়ে বেশি ভেজায় ছাতার জলে,—কথাগুলি এই পর্যন্ত এসে ঘেঁসে —তারপর বড় জোর 'আর আসছি না বাবা' এমনি একটা অসহায় প্রতিজ্ঞায় এসে অবসান হয়। বেশির ভাগ লোকই নির্বাক, মরা মুখে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

হাঁটু দুটোর ওপর ভর রেখে এতোটা পথ দাঁড়িয়ে যাই এমন সামর্থ্য ছিলো না; হঠাৎ নজরে পড়লো একটি বাঙালি মহিলার পাশে একটা সিট এখনো খালি আছে। সাহসের অভাবেই হোক বা সৌজন্যের আধিক্যেই হোক ঐ জায়গাটা কেউ অধিকার করে নি। মাঠে সমস্ত সুখ খুইয়ে এসেছি, এখন সামান্য একটু বিশ্রামের আরাম না নিয়ে পারছি না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে খুব সৌজন্যসহকারে প্রায় আধ হাত জায়গা বাদ দিয়ে নীরবে বসে' পড়লুম। মহিলাটি সামান্য সন্ত্রস্ত হ'য়ে ডানদিকে, মানে রেলিঙের দিকে, আরো একটু সঙ্কীর্ণ হ'লেন।

বসে' পা দুটোকে সামনের দিকে একটু বিস্তারিত করবার আগেই টের পেলুম পেছন থেকে বহু কণ্ঠে প্রতিবাদ সুরু হয়েছে: এ কী অভদ্রতা! তুলে দিন, তুলে দিন, মশাই।

ব্যাপারটা গোড়াতেই একেবারে ধারণা করতে পারলুম না। কিন্তু একজন উৎসাহী ছোকরা ও-পাশের সিট্ থেকে আমার কাঁধের উপরে ঠোকর মারতে লাগলো। নিতান্ত বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে জিগগেস করলুম: কী বলছেন?

কালেজি ছোকরা বলে'ই মনে হ'লো, বোধ হয় সবে এই এলিজা-বেথান যুগের ইতিহাসের নাগাল পেয়েছে। রুক্ষ কণ্ঠে বললে,—দেখছেন না একজন লেডি বসে' আছেন?

বিনীত হ'য়ে বললাম,—দেখেই তো বসেছি। তাতে হয়েছে কি ?'

—হয়েছে কী ? একসঙ্গে অনেকগুলি লোক ঝাম্‌টা মেরে উঠলো : আপনি আমাদের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না ?

একেবারে যেন বোকা বনে' গেলুম কথাটি এমনি মারাত্মক রকমের সুনীতি-সঙ্গত মনে হ'লো। চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম, একজনের দৃষ্টিও আমার প্রতি মমতায় কোমল নয়। তবু ভিতরে-ভিতরে কঠিন হ'য়ে বললুম,—না। আমি যখন পয়সা দিয়েছি তখন আমার বসবার অধিকার আছে। সেই অধিকার আমি ক্ষুণ্ণ করবো না।

একজন আমার দিকে প্রায় মারমুখো হ'য়ে তেড়ে এলো, বললে,—আলবৎ করতে হবে। ভদ্রতা শেখেননি কোনোকালে ?

উত্তেজিত না হ'য়ে বললুম, কেননা উত্তেজনাটাই হচ্ছে সকল তর্কের অবসান—ভদ্রতা শিখেছি বলে'ই বসতে পারলুম, নইলে আপনাদের মতোই হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতে হ'তো।

একজন মাঝে পড়ে' মুরুব্বিয়ানা করে' বললে,—যাক্, ঝগড়া করতে হবে না। আসুন মশাই, আমার জায়গা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। মেয়ে-ছেলের পাশে বসে' কি ভালো দেখায় ? আসুন।

আধাবয়সী এক ভদ্রলোক, বনেদি গৃহস্থ, গর্দানের আয়তন ও পোষাকের পারিপাট্য দেখে মনে হচ্ছিলো। গলায় পাকানো চাদর ঝুলিয়ে কোঁচাতে চুনুট দিয়ে পাম্প-শু জাঁকিয়ে কোথায় চলেছেন কে জানে !

বললুম,—ধন্যবাদ। যে-জায়গায় বসেছি ঠিক বসেছি। জায়গা বদলাতে পারবো না।

মুরুব্বি ভদ্রলোক খেপে উঠলেন : আপনাকে জায়গা ছেড়ে দেয়া স্বত্বেও আপনি উঠবেন না ? ভদ্রমহিলাকে আপনি এমনি করে' অসম্মান করবেন ?

বললুম,—আমি তো বরং এঁর পাশে ব'সে এতোক্ষণে এঁকে সম্মান করলুম। আপনারা এতোগুলি লোক জায়গা থাকতেও দাঁড়িয়ে থেকে এঁকে যারপর-নাই অপমান করছিলেন। যেন এঁর পাশে বসলেই এঁর গায়ে কারো হাওয়া লাগলেই এঁর জাত যাবে! মেয়েদের আপনারা এত ছোট মনে করতে সাহস পান! কাকে কী বলবো?

মারমুখী ভদ্রলোকটি আরো দু'পা এগিয়ে এসে পাঞ্জাবির আস্তিন গুটোতে-গুটোতে বললে,—আপনাকে উঠতেই হবে।

বললুম,—আপনি কি এঁর অভিভাবক?

—নাই বা হলাম কেউ, কিন্তু ভদ্রমহিলার প্রতি এই অসম্মান আমরা বরদাস্ত করবো না। স্ত্রী-জাতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। উঠুন।

ভালো করে' সিটের পিঠে হেলান দিয়ে বসে' নির্লিপ্তকণ্ঠে বললুম,—আপনার সঙ্গে তর্ক বা মারামারি কী করবো, আপনি এ-ক্ষেত্রে মোটেই প্রতিপক্ষ নন। কিন্তু যাই বলুন, ভদ্রমহিলার সহানুভূতি আমারই ওপর হওয়া উচিত। আমি এ-কথা বিশ্বাস করি না আপনাদের মতো ছোট মন নিয়ে তিনি একলা প্যাবলিক বাস্-এ চেপেছেন। তা হ'লে বন্ধ গাড়ির জানলা তুলেই তাঁকে যেতে হতো। আর এই পনেরো মিনিটের রাস্তায় আমার সান্নিধ্যে তাঁর কী অনিষ্ট হ'তে পারে?

—বক্তৃতা শুনতে চাই না, মশাই, আপনি উঠবেন কি না বলুন। ভদ্রলোক দস্তুরমতো ঘুষি পাকিয়েছেন দেখছি।

আর-আর সবাই, যেমন পৃথিবীর রীতি, ধুয়ো ধরলো: উঠতেই হবে, উঠতেই হবে আপনাকে।

এতক্ষণ তাকাইনি, বিপন্ন বোধ করে' এইবার মহিলাটির দিকে তাকালুম, পুরুষ-সংস্পর্শ বাঁচিয়ে এতোটুকু হ'য়ে বসে' বাইরের দিকে মুখ করে' আছেন, তাঁকে নিয়ে এমন একটা রণরঙ্গ দেখে মুচকে

হাসছেন কি না কে জানে। পরনে নরম, গরদের শাড়ি, হেয়ার-পিন দিয়ে ঘোমটা আঁটা, অনাবৃত বাঁ-হাতটিতে লজ্জার কোমল অরুণিমা ফুটেছে। বসার ভঙ্গিতে বিশ্রাম নেই, যেন কেমন একটা ব্যস্ততা। ভাবতে পারতুম আমার এই সান্নিধ্যটা তাঁকে আশরীর পীড়া দিচ্ছে, কিন্তু তাঁর ঐ তেজস্বী হাতখানি আঁচলের তলায় কুণ্ঠিত করে' রাখেন নি বলে'ই মনে সাহস হ'লো, ওর প্রকাশের প্রখরতায় আমার প্রতি সহানুভূতির একটু সঙ্কেত পেলুম।

তাই গলায় নিশ্চিন্ততা এনে বললুম,—ওঁরো এ-বিষয়ে একটা বক্তব্য আছে। যিনি একা পথে বেরোন তিনি তাঁর মতামতের জন্যে পরের ওপর নির্ভর করেন না আশা করি। তাঁর যখন আপত্তি নেই—

—আপত্তি নেই? একশো বার আছে। ছোটলোক কোথাকার, সে-কথা উনি মুখ ফুটে তোমাকে বলতে যাবেন নাকি? উঠে এস শিগগির—

কে বলে বাঙলার নারী অবলা, অরক্ষিতা, পথে বিবর্জনীয়া! সমস্ত ভূমণ্ডল তার অভিভাবক, তার বডি-গার্ড। খবরের কাগজ সব ভুল লেখে, আইন-আদালত সব স্বপ্নের কুয়াসা! দেশের পক্ষে ঘোর সুদিন এসেছে বলতে হ'বে।

ভদ্রলোক এবার আমার হাত ধরে' আকর্ষণ করলেন: উঠে এসো, বলছি।

দেশের পক্ষে হ'লেও আমার পক্ষে সেটা সুদিন নয়, তাই অগত্যা মহামায়ার নাম নিয়ে ভদ্রমহিলারই শরণাগত হলুম।

সেই শরীরী কুণ্ঠাকে তাই উদ্দেশ করে' বললুম,—আপনার সত্যিই কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

ভদ্রমহিলা ঈষৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। অপরূপ স্নিগ্ধস্বরে বললেন,—

না, আপনি বসুন। আর আমার অসুবিধে হ'লেই বা আপনি উঠবেন কেন ?

নারীপূজারীর দল এক নিমেষে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। আমার মনে যে তখন কী ভাব উপস্থিত হ'লো বলতে পারবো না। মনে হ'লো, দ্বারভাঙা বিল্ডিংসে দেয়ালে-টাঙানো পাশের লিষ্টিতে নিজের নামের পাশে টিকে দেখে এসে গেজেট বেরুলে খুলে দেখি সসম্মানে পাশ করেছি। কিছুতেই ভাবতে পারি নি এতটা। শুধু একটা মিনমিনে সম্মতি নয়, যেন, যাকে বলে, সনির্বন্ধ অনুরোধ : শুকনো ঔদাসীন্য নয়, কোমল একটু কাতরতা। মেয়েটি যেন শুধু প্রতিবেশী নয়, প্রায় অন্তরঙ্গ। আশ্বস্ত তো হলুমই, উৎসাহিত হলুম। বললুম,—নিশ্চয়, আপনাদের এমন দুর্বল, পরমুখাপেক্ষী ভাবলেই আপনাদের ওপর সত্যিকারের অশ্রদ্ধা জানানো হয়।

ভদ্রমহিলা আমার দিকে পরিপূর্ণ মুখ ফেরালেন। যুবতী, মুখে মাধুরীর সঙ্গে বুদ্ধির দীপ্তি মিশেছে, দুটি চোখে তরল একটি কৌতূহল। এমন একটি পরিচ্ছন্ন মুখ কোথাও দেখিনি। ভয় বা কুণ্ঠার এতটুকু লেশ নেই। মুক্তির আনন্দে সমস্তটি শরীর ছুরির ফলার মতো ঝিলকিয়ে উঠেছে। যে যতো কাছে তাকে দেখা ততোই অসম্পূর্ণ। তাই তাঁর ঘাড়ের উপর খোঁপাটা কতদূর ভেঙে এসেছে, আঁচলের পাড়টা বুক বেয়ে কাঁধ ছাড়িয়ে কত দূর ছড়িয়ে পড়েছে, কিছুই দেখতে পেলুম না। দেখলুম ভিজে আকাশের কোণে রোদের একটু সোনালি ঝিকিমিকি। বসতে পেলেই শুতে চায়—পাছে এই প্রবাদের প্রমাণ হ'য়ে উঠি সেই ভয়ে বিস্মিত হ'য়ে তাঁকে দেখতেও পাচ্ছিলুম না সাহস করে', কিন্তু ভদ্রমহিলা নিজেই নড়ে'-চড়ে' উঠলেন। বললেন,—বেশ, কম্ফরটেব্লি বসুন। এই সিটে আপনার বসবার যে অধিকার আছে সেইটেই জানানো দরকার। প্রতি মুহূর্তেই আমরা, পুরুষ আর মেয়ে, এই অধিকার জাহির

করতে না পেরে মরে' রয়েছি। বাঁচবার অধিকারই যদি না থাকে বুঝি, তবে বেঁচে লাভ কী বলুন? আর, আমাদের মেয়েদের সমস্ত সম্মান চামড়ার ওপরে নয় যে একটু ছোঁয়া লাগলেই তা মুছে যাবে।

বেশ প্রশস্ততরো হয়ে বসে' প্রহারোদ্যত ঈর্ষান্বিত জনমণ্ডলীকে বুঝিয়ে দিলুম ভদ্রমহিলা কার পক্ষে, সভ্যতা কোথায়, স্বাধীনতা কাকে বলে! লোকগুলি বিমূঢ় চোখে পরস্পরের দিকে চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। এমন একখানা ভাব, যেন, কী ঠকাটাই ঠকেছি, কী গোখখুরিই হয়েছে, যা থাকে কপালে বলে' কেন তখন সেখানে বসে' পড়িনি!

বললুম,—আপনি আমাকে বাঁচালেন।

ভদ্রমহিলা বোধকরি একটু হাসলেন, কেননা তাঁর গালে স্বচ্ছ একটু গোলাপী আভা দেখলুম। বললেন,—আমাকেও আপনি। সমস্ত রাস্তা যদি আমাকে অমনি খালি-সিট পাশে নিয়ে যেতে হ'তো, তা হ'লে লজ্জার আর আমার অবধি থাকতো না, প্রতি মুহূর্তে আমার শুধু মনে হ'তো আমি কী ঠুনকো, আমি কী ওয়ার্থলেস!

—আর যদি মুখ ফুটে একবার বলতেন যে আমার বসাতে আপনার অসুবিধে হচ্ছে, তা হ'লে এঁরা, যুধ্যমান ভদ্রলোকদেরকে লক্ষ্য করে' বললুম, তা হ'লে এঁরা আমাকে আজ কাম্‌ড়ে, আঁচড়ে টুকরো-টুকরো করে' ফেলতেন। পেনালকোডে গিয়ে পড়তুম কিনা তারো বা ঠিক কী! সামান্য একটা ইসারা করলে পর্যন্ত আউটরেজিং হয়!

এবার ভদ্রমহিলার দাঁত দেখলুম। বললেন,—কিন্তু একবার বসে' ওঁদের প্ররোচনায় আপনি যদি জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন, হাকিম দেখে উকিল যেমন উঠে দাঁড়ায়, তবে সব চেয়ে আমারই বেশি লজ্জা করতো। ভাবতুম আজকালকার ছেলেগুলো গাধা না বনমানুষ। কে জানে, হয়তো বা হাত ধরে'ই আবার আপনাকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিতে হ'তো।

এতক্ষণে সামনের দিকে পা দুটো প্রসারিত করে' দিয়ে সিটের পিঠে হেলান দিয়ে বসলুম। বললুম,—আপনাকে ধন্যবাদ।

ভদ্রমহিলা হাসলেন। বললেন,—খেলার আজ কী খবর?

—আমার মুখ দেখে বুঝতে পারছেন না? মোহনবাগান যদি জিতবেই, তবে এঁরা সবাই একজোট হ'য়ে এমনি অমানুষিক ভদ্রলোক হ'য়ে উঠবেন কেন?

মহিলাটি খিলখিল করে' হেসে উঠলেন। বললেন,—একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি।

এতক্ষণে খেয়াল হ'লো বেশবাসের আর ছিরি-ছাঁদ নেই, চেহারায় নেই এতটুকু চেকনাই। মুহূর্তে যেন ছোট, দুর্বল, অসহায় বলে' অনুভব করলুম নিজেকে। এতক্ষণে মনে হ'লো না-বসলেই পারতুম এত কাছে। আর এ ভেবে আশ্চর্যও কম হলুম না এ কদাকার পোষাকে কাছে বসাতে ভদ্রমহিলার মুখে এতটুকু একটা কুঞ্চন ফোটেনি। আশ্চর্য, গভীর তত্ত্বসন্ধিৎসুর মতো দার্শনিক বিবেচনা করে' দেখলুম, জীবজগতে পোষাকটা সত্যি কী অকিঞ্চিৎকর!

তবু সাফাই গাইবার মতো করে' বললুম,—এখন প্রায় শুকিয়ে এসেছে।

অপরিচিতা অনুযোগ করে' উঠলেন: কতক্ষণ ভিজলেন বলুন তো?

—ঘড়ি ধরে' দেখেছি আড়াই ঘণ্টা।

—এখন অসুখ না করলে হয়। ভদ্রমহিলা খোঁপায় হাত দিয়ে হেয়ার-পিন্‌টা ফের ঠিক করতে-করতে বললেন,—মোহনবাগানের খেলা দেখা তা হ'লেই ষোলকলা পূর্ণ হ'বে।

দেশের অধোগতির আর কী বাকি থাকতে পারে এই নিয়ে আরোহীদের মধ্যে ফের আলোচনা সুরু হয়েছে।

সেই মুরুব্বি ভদ্রলোক চাপা গলায় অথচ আমাদের শুনিয়ে বলছেন: তাই বলে' এতোটা কি ওঁর প্রশ্রয় দেয়া উচিত হলো? আমাদের জব্দ করতে গিয়ে নিজেকে এমনি খেলো করাটা কি ভালো দেখায়?

মারমুখো ভদ্রলোক বললেন: রেখে দিন মশাই, আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়ে—কাণ্ডজ্ঞান বলে' কিছু ওদের আছে নাকি? বেটা-ছেলেদের সঙ্গে একত্র বসে' আগডুম-বাগডুম খেলে।

কথাটা চশমা-পরা ঘাড়ের ওপর দিয়ে টেনিস-সার্টের কলার তুলে-দেয়া কালেজি ছোকরাটির মনঃপূত হলো না। সে সামান্য একটু ঝাঁজালো গলায় বললে,—কলেজে পড়ে না ছাতি! কলেজে পড়লে কি এমনি আর মুখ বুজে অত্যাচার সইতো মশাই? সে তেজ কই?

তার কানে-কানে কে বললে,—যা বলেছেন, নইলে কি আর একা-একা বাস্-এ ওঠে?

ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকালুম, অপমানে দুঃখে সে-মুখ গম্ভীর, রাঙা হ'য়ে উঠেছে। সে-মুখ যেন আমাকে প্রহার করলো। আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি কৌতুকময়ী মেয়ের মুখের চেয়ে কুপিতা মেয়ের মুখ অনেক বেশি সুন্দর। সে-মুখ যেন আমাকে একটা বিদ্যুন্ময় দ্যোতনা দিল। তাই তীব্র স্বরে বললুম,—এই ভাবেই বুঝি আপনারা ভদ্রমহিলার সম্মান রাখছেন?

—আর রেখে দিন মশাই সম্মান। সেই মারমুখো ভদ্রলোক তেড়ে এলেন: সম্মানের যোগ্য হ'লে তো তবে কথা!

উত্তেজিত হ'য়ে প্রায় উঠে দাঁড়াতুম, দেখি ভদ্রমহিলার একখানি হাত আমার হাতের উপর উঠে এসেছে। তিনি মিনতি করে' মৃদুকণ্ঠে বললেন,—কী আপনি ওঁদের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছেন? চুপ করে' বসে' থাকুন।

আশ্চর্য স্তব্ধ হ'য়ে গেলুম।

ভদ্রমহিলা চাপা, একটু-বা আহত গলায় বললেন,—লোকে কী বলে না-বলে তাতে কী এসে যায়! খানিক আগে যারা ছিলো আমার সহায় এখন তারাই আমার শত্রু। পৃথিবীটাই এই রকম। আপনি শুনুন।

কে একজন টিপ্পনি কাটলো: আর কী মশাই, ক'দিন বাদে এই মেয়েরাই মোহনবাগান নাম বদ্‌লে মাঠে নেমে ফুটবল খেলবে আর আমরা জলে ভিজে হাততালি দেবো।

অস্থির হ'য়ে উঠলুম। বললুম,—মারামারি করা আজ আমার অদৃষ্টে লেখা আছে। আপনি একবার অনুমতি দিন, 'আমি দেখি চেষ্টা করে'। তখন মার খাওয়ার চেয়ে এখন মার যদি খাই-ও, তাতে অনেক বেশি গৌরব।

ভদ্রমহিলা অপরূপ হাসলেন। বললেন, এমন সুন্দর, সবুজ সন্ধ্যাটা শেষকালে আপনার মেডিকেল-কলেজ হাসপাতালে রক্তাক্ত অবস্থায় কাটুক। তা ছাড়া আমারো এমন সময় নেই যে একটা দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ি, হাসপাতাল থেকে থানা, থানা থেকে আদালতে ঘুরে বেড়াই। তা ছাড়া দিদির ওখানে আমার চায়ের নেমন্তন্ন, একটা বুল-ফাইট দেখার চাইতে বাদ্‌লার পর এক কাপ গরম চায়ে আমি ঢের বেশি উত্তেজনা পাবো।

জনতাকে উপেক্ষা করে' জিগগেস করলুম: কোথায় আপনার দিদির বাড়ি?

—সেই ন্যায়রত্ন লেন।

—আমিও তো তারই কাছাকাছি যাচ্ছি।

—কোথায়?

—কী জানি নাম সেই গলিটার! ফড়িয়াপুকুর কি অমনি ধারা একটা নাম হ'বে।

—তা হ'লে এক কাজ করলে কেমন হয়? ভদ্রমহিলা কি-একটা গোপন ষড়যন্ত্র করছেন এমনি ভাবে গলা নামিয়ে বললেন,—আসুন আমরা নেমে পড়ি।

প্রস্তাবটাতে উত্তেজনা আছে, কিন্তু মূর্খ এই জনতার কাছে সেটা পরাজয় স্বীকার করা হ'তে পারে ভেবে উৎসাহ লাগলো না। বললুম,—তারপ'র, যাবেন কি করে'?

কাঁধের উপর আঁচলের ধারটা গুটিয়ে নিতে-নিতে উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ করতে-করতে ভদ্রমহিলা বললেন,—ট্যাক্সিতে। যখন বন্ধুতা হ'য়েই গেল আমাদের, তখন আর দ্বিধা কিসের? পারবেন না আমাকে ন্যায়রত্ন লেন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে? যেমন ভিজে গেছেন, চায়ের সঙ্গে গরম দু'খানা চপ যদি খাওয়াই, খুব অপছন্দ হ'বে?'

সত্যি, দ্বিধা করলুম না। বললুম,—চলুন।

একতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে ভদ্রমহিলা বললেন,—যাই বলুন এ-সব যান প্লিবিয়ানদের জন্যে। এখানে আমাদের মানায় না। চলে' আসুন।

পিছনে আবার গুঞ্জন উঠেছে শুনতে পাচ্ছি। একজন বলছে: তখন কি বোকামিটাই করলি হীরু, পাশ ঘেঁসে বসে' পড়লেই পারতিস।

আর একজন ফোড়ন দিলে: বিনিপয়সায় এখন খোলা-হুডে ট্যাক্সির হাওয়া।

—কে জানে, ঢাকা ফিটনও হ'তে পারে।

—ওঃ! কী ঠকানোটাই ঠকিয়ে গেল!

আমরা ততোক্ষণে ফুটপাতে নেমে এসেছি। বাস-এর দোতলা থেকে